আবহমান

বীণা চক্রবর্তী

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৭
এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট :
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক :
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

সাড়ে চার টাকা

ভূমিকা লিপি

বাঙলাদেশে পাঠান আমলের প্রথম যুগ হিন্দু সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগ। মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার সময়কার কথা বলতে গিয়ে প্রসিদ্ধ উর্দু কবি হালি বলেছিলেন, 'ইধর হিন্দ্ মে হরতরফ আন্ধেরা।' অর্থাৎ হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার। বাঙলাদেশে বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা দৈব ঘটনা নয়—তার জন্যে সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থাও অঙ্গাঙ্গীভাবে দায়ী। সমাজ-দেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন ভিতর বা বাহির যে-দিক থেকেই আঘাত আসুক সমাজ তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রাখে—কিম্বা নতুন শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিজেকেই আবার শক্তিমান করে তোলে। জৈব-জীবন এবং সমাজ-জীবন উভয় ক্ষেত্রের পক্ষেই এই বিবর্তন-ধারা সত্য। কিন্তু যে-সমাজ ভেতর থেকে নানা কারণে—রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দুর্বলতার দরুন—দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে, তার পক্ষে নতুন শক্তির সঙ্গে লড়াই করে নতুন ভাবধারা আত্মসাৎ করে নিজেকে সঞ্জীবিত করা আর সম্ভব হয় না।

সমাজের এই অবস্থাই বিপ্লবের সূচক। কিন্তু শুধু মাত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলেই বিপ্লব আসে না। সমাজের অবস্থা বোঝবার ও জানবার মতো প্রতিভা ও কর্মশক্তি চাই। এই প্রতিভা ও কর্মশক্তি ব্যতিরেকে বিপ্লব সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে সমাজ আবার মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছোয়—তখন আবার নতুন করে ভ্রূণাবস্থা থেকে সমাজকে গড়ে উঠতে হয়। যতদিন সেই সমাজ সুস্থ এবং সম্পূর্ণ না হয়ে ওঠে ততদিন সমাজের মানুষকে কঠিন মূল্য দিতে হয় আবহমান কাল ধরে।

সমাজের ইতিহাসের এই হলো শিক্ষা! বর্তমান উপন্যাসে বাঙলার অতীত শতাব্দীর এক অখ্যাত অবজ্ঞাত অধ্যায়কে কেন্দ্র করে এই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। আবহমান কাল ধরে যে মূল্য দিতে হয়েছে বাঙলা সমাজকে—তা যত কঠিনই হোক, নিশ্চয়ই তা পর্যাপ্ত নয়। কারণ বর্তমান কালে যে মূল্য আমরা দিচ্ছি তা আরো ভীষণ, আরো কঠোর, আরো মর্মান্তিক। বাঙলা সমাজের উত্তরোত্তর অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এই মূল্য বোধহয় [illegible]নিবার্য। 'আবহমান' উপন্যাসটি সেই মূল্যায়নের দ্যোতক হবে আশা [illegible] যায়।

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া পিতামহী
বসন্তকুমারী দেবী চৌধুরাণীর
স্মরণে

আ ব হ মা ন

মোহব্বৎ মে নেহি হ্যায় ফর্‌ক্‌ জীনে ঔর মরণেকা
উসী কো দেখকর জীতে হে জিস্‌ কাফের প' দম নিকলে।

—গালিব

জীবন এবং মরণে ভেদ
নেইকো ভালবাসায়
যে নিঠুরের জন্যে মরি
বাঁচিও তার আশায়।

বাঙলা দেশে একে হয়তো মন্দির বলবে না। কিন্তু আসামের পার্বত্য অঞ্চলে এমনি ধরনের তান্ত্রিক মন্দির দেখা যায় মাঝে মাঝে। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম ভালো করে। এ যেন ঘরও নয়, মন্দিরও নয়। ছোট্ট একটু ঝির ঝিরে ঝরনার পাশে পাহাড়ের গুহামুখে পাথর সাজিয়ে একদিন হয়তো একে মন্দিরের রূপ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, ধ্বংসমুখী সেই বহু পুরনো মন্দির আজ এই নির্জন বনে প্রাচীন যুগের মানুষের সাহস ও বীর্যের করুণ সাক্ষী দিচ্ছে মাত্র। মন্দিরের মুখ পার হয়ে প্রায়ান্ধকার স্বল্প-পরিসর গুহামুখ, ভেতরে কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। চোখের মণি দুটোয় সমস্ত দেহের শক্তি কেন্দ্রীভূত করে দেখতে চেষ্টা করলাম। স্বল্প-পরিসর গুহা-গর্ভের আধখানা জুড়ে এক পাশে রয়েছে একটি মানুষ-প্রমাণ জীর্ণ ভাঙা মূর্তি। অপর কোণে শয়ান রয়েছেন এক ব্যক্তি। প্রথম দেখায় তিনি অতি শীর্ণ— এইটুকুই চোখে পড়ে। আমাদের দেখে সামান্য মাথা উঁচু করে বললেন— “আসুন।” স্পষ্ট বাঙলা! এদেশে এমন জায়গায়ও এসেছেন মায়ের দুলাল বাঙালী! আরো একটু এগিয়ে গেলাম। অভ্যস্ত হয়ে এসেছে অন্ধকার। দেখি শীর্ণ ব্যক্তি ব্যগ্র অভ্যর্থনায় দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আরো কাছে এগিয়ে তাঁর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতে ইশারা করে পাশে বসবার স্থান দেখিয়ে বললেন—“বসুন।” কাছে বসে এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম— এক অতি বৃদ্ধ শীর্ণ সন্ন্যাসী প্রচুর জটা উপাধান করে কুশ-শয্যায় শুয়ে রয়েছেন। গম্ভীরকণ্ঠে পরিষ্কার বাঙলায় জিজ্ঞাসা করলেন—“কোথা থেকে আগমন?”

—“কলকাতা।”

—“কলকাতা! শুনেছি, মস্ত শহর কলকাতা।”

—“হ্যাঁ, আপনি যাননি কখনো?”

—“না। বাঙলা দেশ স্বপ্নে দেখেছি, আর এই মন্দিরে বাঙলার পুজা করেছি।”

—“আপনি কোন দেশের লোক?”

—“আমি এই দেশেরই অধিবাসী। আপনারা এখানে?”

বললাম—“ভবঘুরে লোক। শিবাজীর আঠারো গড় বেষ্টিত এই অরণ্য শোভা ও দুর্গম পথ হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়েছে কিশোর বয়স থেকে, আজ প্রথম এখানে আসবার সুযোগ পেলাম।”

এতক্ষণ দুর্গম পাহাড়ে উঠতে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল অবন্তী। তার দিকে সস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে অবন্তী বললে—"ইনি আমার স্বামী।"

শীর্ণ হাত দু'খানি কপালে ছুঁইয়ে সন্ন্যাসী বললেন—"ভগবান কখন কার জন্য কোন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যে তুলে ধরেন, মানুষ এত জানবার পরও তা জানতে পারে না। যে মুহূর্তে অসহায়ের নিঃসঙ্গতা অনুভব করছিলাম, সেই মুহূর্তে কানে এল আপনাদের কণ্ঠস্বর!"

সন্ন্যাসীর গম্ভীরকণ্ঠে কি জানি কোথায় ছিল বুঝি একটু ব্যথার আভাস। সাগ্রহে তাঁর শীর্ণ হাত দু'খানি তুলে নিলাম। শীর্ণ মুখের দাড়ি গোঁপের অরণ্যে মধুর হাসি ফুটে উঠলো। বললেন—"বার বার আশ্বাস পেয়েছি রাধারাণীর কাছে, অধিকারী আসছে, আসছে, তবু মন উতলা হয়েছিল।"

সন্ন্যাসীর কথার সঠিক অর্থ ধরতে পারলাম না। বললাম—"আপনি অবাঙালী হয়েও এত চমৎকার বাঙলা বলেন, আশ্চর্য!"

আবার হাসলেন সন্ন্যাসী।—"আমার গুরু ছিলেন বাঙালী, আর আমার দেবীও বাঙালী।"

দেবদেবীর মধ্যেও যে প্রাদেশিকতা বর্তমান তা জানা ছিল না। তবু চুপ করেই থাকি। সন্ন্যাসী হাতের কাছে রাখা ঘটি থেকে এক ঢোক জল খেয়ে বলেন—"হ্যাঁ, আপনারা আসবেন জানতাম, না এলে কে ভার নেবে আমার দেবীর? রাধারাণী নিজে ডেকে এনেছেন আপনাদের। নইলে এ অরণ্যে আমার এই দীর্ঘ জীবনে নিজে পথ চিনে আর কাউকে আসতে দেখিনি। হয়তো রাধারাণী যুগলে সেবা চান। এ পর্যন্ত এ মন্দিরের সেবক নিযুক্ত না করে কোন সেবকের মুক্তি মেলেনি। তাই সময় উত্তীর্ণ দেখে বড় বিচলিত হয়েছিল মন।"

সর্বনাশ! শেষ পর্যন্ত আমাদের এই অরণ্যে রাধারাণীর সেবক নিযুক্ত করবেন ভেবেছেন নাকি সন্ন্যাসী! অবন্তী! সেও নিস্পন্দ হয়ে কি যেন চেয়ে দেখছে সন্ন্যাসীর শীর্ণ মুখে! সভয়ে বলি—"আপনার স্বাস্থ্য তো যথেষ্ট নিরুদ্বেগ বলেই মনে হচ্ছে?"

আবার হাসেন সন্ন্যাসী।—"সন্ন্যাসীর স্বাস্থ্যে উদ্বেগের কারণ না ঘটাই তো উচিত, কিন্তু ভোগ তো দেহ থাকলেই ঘটে থাকে! মৃত্যু এসে দাঁড়াবার একটা তো নিমিত্ত চাই। তাই হয়তো শেষের দিনে নিমিত্ত ঘটালেন রাধারাণী।"

শীর্ণ মুখ সামান্য বিকৃত করে ডান পা'খানি তুলতে চেষ্টা করেন সন্ন্যাসী। দেখি পায়ে একটি নিদারুণ ক্ষত! রক্ত জমে পায়ের সমস্ত পাতাটা ঢেকে দিয়েছে! আমি ও অবন্তী একসঙ্গেই প্রায় সভয়ে উচ্চারণ করি—"উঃ! এ যে ভয়ানক কাণ্ড!"

মৃদু হেসে বলেন সন্ন্যাসী—"গুরুদক্ষিণা—আজ প্রাতঃকালেই ঘটে গিয়েছে।"

—"আজই সকালে! কি করে এমন হলো?" অবন্তী আমার 'হ্যাভার-

স্যাক' পিঠ থেকে খুলে নিয়ে আইডিন বের করে এনে সন্ন্যাসীর পা'খানি সযত্নে কোলে তুলে নিতে যায়।

বাধা দিয়ে বলেন সন্ন্যাসী—"সন্ন্যাসীর ঔষধের প্রয়োজন নেই মা। শিষ্য ভিন্ন সেবা গ্রহণ করিনি কখনো।"

আমি বলি—"আহা এমন ক্ষত! আপনার শিষ্য এখন কোথায়?"

দু'হাত তুলে ওপরের দিকে দেখান সন্ন্যাসী। "তাঁর ধর্মের কাছে হয়তো।"

—"কিন্তু এমন আঘাত আপনি পেলেন কি করে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন সন্ন্যাসী—"ঐ দেখছেন বিগ্রহ?" অন্ধকার এখন আরো ভালো অভ্যাস হয়ে এসেছে, এবার স্পষ্ট চোখে পড়ে চারিপাশ। বিগ্রহ? অনেকটা মমির মতো নয় কি? নিচের অংশ দেখে মনে হয় সূক্ষ্ম কারিগরের হাতে গড়া কোন সুগঠিত নারীমূর্তি। উপরের অংশ ভেঙে পড়েছে, ঠিক ভেঙে পড়েনি—কেউ যেন পিটিয়ে ভেঙেছে। পেছন থেকে সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে আবার তাঁর দিকে ফিরে তাকাই।—"ঐ বিগ্রহ পিটিয়ে ভেঙেছে শিশু বয়স থেকে পালিত আমার শিষ্য। জানি না—এই হয়তো রাধারাণীর ইচ্ছে ছিল। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন সেবার আরো যোগ্যতর লোক, তাই নিয়ে এসেছেন আপনাদের এই দুর্গম পথ উত্তীর্ণ করে।"

রাধারাণীর দিকে চেয়ে বুক প্রায় শুকিয়ে এসেছে। ভয়ে ভয়ে বলি—"কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অরণ্যের শোভা দেখে অরণ্যের ছবি বুকে তুলে নিয়ে ফিরে যাওয়া। দেবদেবীর মূল্য জীবনের পটে তো ছকে কখনো দেখিনি।"

শীর্ণ মুখে অদ্ভুত হাসেন সন্ন্যাসী—"সবের মূল্যই কি আর ছকে কষে বুঝতে হয়? দেবদেবীর কাজ তারা নিজেই করিয়ে নেন, উপযুক্ত সময় এলে মূল্যও জানান। সে কথা আজ আর আমার বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু যে-ইতিহাস শুনে পুত্র-প্রতিম শিষ্য আমার আজীবন আরাধনার দেবীকে আহত করে আমার মৃত্যুকাল নিকট করেছে, সেই ইতিহাস আপনাদের কাছে পুনরুক্তি করে নিষ্কৃতি পেতে চাই। তারপর আপনাদের কর্তব্য আপনাদের বিবেক স্থির করবেন।"

আবার ফিরে দেখি বিগ্রহ। হ্যাঁ, এই অস্পষ্ট আলোকে দূর থেকে মনে হয় যেন সুগঠিত নারীমূর্তির উদরে রক্ষিত একটি মমি! ওপরের অংশ দেখে মনে হচ্ছে সদ্য ভাঙা। ভগ্ন অংশগুলো এখনও ছড়িয়ে পড়ে আছে। অনাবৃত শুষ্ক মুখ এমন এক রূপে পরিণত হয়েছে, যা নারী কি পুরুষের অনুমান করা কঠিন, যদি না নাকে মুসলমানী যুগের বেশর ও নথ থাকতো। অবন্তীর দিকে ফিরে দেখি, করুণ মমতা-ভরা চোখে চেয়ে আছে সে। না, আমি যতটা বিচলিত হয়েছি, অবন্তী ঠিক ততটা হয়নি। কে জানে হয়তো বিষয়টা সঠিক বুঝতে পারেনি। সন্ন্যাসীর হাতের চাপে আবার আত্মস্থ হলাম।

—"উনি বাঙলার মনসবদার মুঘীষ-উদ্-দীন্ তব্রোল খান-এর প্রণয়িনী।"

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! বিগ্রহ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে সন্ন্যাসীর আরো কাছ ঘেঁষে বসলাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন সন্ন্যাসী—"আপনারা পথের শোভা দেখতে বেরিয়েছেন, সময় আপনাদের আছে কিনা জানি না কিন্তু আমার আর নেই। তাই এ মন্ত্র স্থানান্তরিত না করে গেলে তো মুক্তি নেই। সেজন্যই সংক্ষেপে বলি। হয়তো এমন আরো কত ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সারা ভারতের ধূলিকণায়, ঐতিহাসিকের সংক্ষিপ্ত লেখনী যার বিবরণ রেখে যেতে অবকাশ পায় না।"

হঠাৎ লক্ষ্য করি অবন্তী ইতিমধ্যে সরে এসে আমার গা ঘেঁষে বসেছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা ওর হাতখানা আমার হাতের ওপর তুলে দেয়! ইচ্ছা হয় ছুটে পালাই অবন্তীকে নিয়ে। কিন্তু বাইরে তখন আবার সগর্জনে সাবধান-বাণী উচ্চারিত হচ্ছে! মহা আড়ম্বরে বনের রঙে মন হারিয়ে বর্ষা শুরু করেছে উল্লাসের তাণ্ডব-নৃত্য! আর বাহুমূলে চোখ ঢেকে গম্ভীরকণ্ঠে বলতে শুরু করেছেন সন্ন্যাসী :

বাঙলার চরণ থেকে নির্মাল্য ও কর্দম ধুয়ে সাগর অভিমুখে ছুটে চলেছে ছোট্ট এক স্রোতস্বিনী। নাম তার কুশনদী। গাঁয়ের লোক বলে কোশাই। এই কোশাইয়ের তীরেই ব্রাহ্মণ শূদ্রের বসতি সমৃদ্ধগ্রাম, কুশী। বঙাল ও উপবঙ্গের সীমায় অবস্থিত কুশীর বুক বিজেতা ও বিজিতের যথেচ্ছ পদভারে বার বার আর্তনাদ করে উঠলেও নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যায়নি। মুমূর্ষু নিঃশ্বাস থেকেই সে বার বার জীবনীশক্তি ফিরে পেয়েছে। এক সময়ে ধান, গুড়, তিষি, তিল, কার্পাসের বোঝা নিয়ে কুশীর স্রোতে নৌকার বহর দুলে দুলে পৌছতো তাম্রলিপ্তের বন্দরে। গুপ্তরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে তাম্রলিপ্ত ও কুশীর নৌকা-বহরেরও অবসান ঘটেছে। তবুও কুশীর উভয় তটের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নানারূপ শস্যের আর কার্পাসের অভাব নেই। কিন্তু বাণিজ্যের অভাবে তার মূল্য খুবই অল্প। দেশে স্বর্ণ নেই, রৌপ্য তো প্রায় দুষ্প্রাপ্য। লেন-দেন চলে, হয় বিনিময়ে, নয় সামান্য কড়ির পণে। তুর্কী অভিযানের পর থেকে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়েছে বটে কিন্তু তা শুধু ধনী নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ, গ্রাম পর্যন্ত পৌছায়নি।

প্রাচীন কুশীগ্রামের দক্ষিণ সীমায় বৃদ্ধ পিপুলগাছটি একদিন বুড়োধর্মঠাকুরের 'থান'রূপে আদিবাসীদের ধর্মকর্মের সাক্ষীস্বরূপ ছিল। পালযুগে অবিশ্বাসী বৌদ্ধরাজের ইচ্ছায় বৃদ্ধপিপুলের 'থান' আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল অবলোকিতেশ্বরের বৌদ্ধযানী মূর্তি। গ্রামবাসীরা বৌদ্ধ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে

হতচকিত হয়ে সসম্ভ্রমে সরে এসেছে গ্রামের প্রান্তসীমায়। অবনত শিরে এনে দিয়েছে ফুল উপচার বৌদ্ধ মহাযানী বুদ্ধমূর্তি মহাদেবের পায়ে। তারপর এলেন সেন-বংশ। কর্ণাটিক ব্রাহ্মণ বংশের প্রাবল্যে বৃদ্ধপিপুল-আশ্রয়ী অবলোকিতেশ্বর রূপ নিলেন বিষ্ণুর। উগ্র ব্রহ্মণ্যধর্মের বৈদিক আভিজাত্যে বৌদ্ধধর্ম তখন স্তিমিত। কিন্তু আদিবাসীরা আজও অবনত মনে গ্রামের প্রান্তে অন্ত্যজরূপে রয়েছে। আজও আনে তারা গুড়, শষ্য ইত্যাদি পূজার উপচার। বিষ্ণু মন্দিরে নিবেদন করে তাদের হোলাকের ফাগ, সন্তানের মঙ্গল-কামনায় ছাঁট পূজার নৈবেদ্য। সেন অধিকৃত কুশী আজ আবার তুর্কী নিগ্রহে সন্ত্রস্ত। নবাগত শাসকদের নিত্য নূতন কর-ভারে নিপীড়িত গ্রামবাসী। তার উপর শাসকদের সৈন্যের প্রয়োজন ঘটলে, বাকী করের দায়ে পুত্র বেচতে বাধ্য হয়। আবার রাজপুরুষদের কৃপাদৃষ্টি পডলে, মূল্যের বিনিময়ে অথবা দস্যুতার অত্যাচারে স্ত্রী-কন্যাকেও হারাতে হয়।

সেন রাজার দান স্বরূপ কুশীর সংলগ্ন কিছু ক্ষেত্রভূমি ব্রহ্মোত্তর পেয়ে কৌলীন্যের তিলক নিয়ে কুশীর বুক পবিত্র করতে সর্বপ্রথম এসেছিলেন জগদীশের পিতা ত্রৈলোক্য শর্মা। তারপর ক্রমে ক্রমে কৌলীন্যের তিলক নিয়ে এসেছিলেন আরও অনেকে। যজন যাজন ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে যাঁরা অপর বৃত্তি গ্রহণ করে কৌলীন্য থেকে পতিত হলেন তাঁরা কুলীন পটি পরিত্যাগ করে গ্রামের অপর প্রান্তে গড়ে তুললেন পতিত পটি। এমনি করেই নানা বৃত্তি অনুযায়ী গডে উঠল করণ কায়স্থ এবং আরও অনেক পটি। কিন্তু তখনও কুলীনের কৌলীন্য বজায় রেখে বিদ্যাবুদ্ধি ধন ও প্রতিষ্ঠায় পিতৃপুরুষের প্রাধান্য নিয়ে জগদীশ শর্মাই কুশীগ্রামের প্রধান। বিপত্নীক জগদীশের ছয় পুত্র তরুণ বয়সে একে একে রাজসৈন্যে যোগ দিয়ে নিহত হন। জগদীশের সঙ্গে বাঙলার মনসবদার তঘ্রোল-এর মনোমালিন্যের সেইটিই প্রথম সূত্র। তাছাড়া তঘ্রোল-এর নিত্য নতুন করভারে এবং নানা অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়ে গ্রামবাসীরাও জগদীশের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। জগদীশের কূট বুদ্ধিতে আস্থাই হয়তো জগদীশের প্রতি তাঁদের ঐ অনুরাগের বিশেষ কারণ। জগদীশের ব্রাহ্মণ্য ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও স্বীয় মতে তিনি একান্ত আস্থাবান। সেজন্য জগদীশের প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা যেন অনেকটা একান্ত আনুগত্যের মতোই প্রকাশ পেত। আর মনসবদারের সঙ্গে মনোমালিন্যের এইটি দ্বিতীয় সূত্র।

অবন্তীমালা জগদীশের কনিষ্ঠ পুত্রের একমাত্র কন্যা এবং জগদীশের একমাত্র বংশধরা। একই সঙ্গে পিতা ও পিতামহের স্নেহ নিয়ে জগদীশ অবন্তীমালাকে লালন করছিলেন। কিশোরী বয়সেই অবন্তীমালা গ্রামের শ্রেষ্ঠ রূপবতী বলে সকলের আদরিণী। যদিও পিতামহের অবাধ প্রশ্রয়ে কিছু অধিক চঞ্চলা খরতরা, তবু বিবাহযোগ্য পুত্রের পিতামাতা অনেকেই

অবন্তীমালাকে সাগ্রহে পুত্রবধূ-রূপে কামনা করেন। মিষ্টভাষী সুচতুর জগদীশ প্রত্যাখ্যান করেন না কারো আবেদন, কিন্তু যোগ্যও মনে করেন না কাউকে। নিঃশ্বাস ফেলে বলেন জগদীশ—"ঐ তো একচক্ষু মাত্র সম্বল, এত শীগ্‌গীর বিদায় দিয়ে অন্ধ হতে বুক কাঁপে। যাক না আরও ক'টা দিন, গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই তো আছে, আমার থাকলেও যা, তোমার হলেও তাই।" আশান্বিত হয়ে চলে যান আবেদনকারীরা। মাস থেকে বছর ঘুরে যায়। অবন্তীমালার সমবয়সী কিশোরীরা সকলেই যখন পতিগৃহে, তখন মাঠে-ঘাটে উদ্দাম হয়ে ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছ উড়িয়ে নবীন যুবা ও কিশোর দলে বিদ্যুৎ-এর মতো খেলে বেড়ায় একা অবন্তীমালা। ঘরে যাঁদের বিবাহযোগ্য ছেলে নেই এমন বর্ষীয়সীরা মুখ মুচ্‌কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—"জগদীশ শর্মার নাতনীকে এবার ডাকাতে নেবে।" শুনে, অবন্তীমালার মা সুদেষ্ণার মন শঙ্কায় হা হা করে ওঠে। চোখে আঁচল দিয়ে শ্বশুরের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘরে টেনে আনতে চান কলহাস্যা তরঙ্গিনীকে। কিন্তু পিতামহের প্রশ্রয়ে অবন্তীমালা দুর্বার! মায়ের শাসন উচ্ছল হাসিতে ধুয়ে আবার কোনো ছলে বেরিয়ে পড়ে। হেসে বলেন জগদীশ—"তোমার মেয়ে জলে হারাবার নয় মা, খেলুক না স্রোতের মুখে দু'দিন। খেলা আর ক'দিনের?"

গাজন গেয়ে নাচতে নাচতে হয়তো চলেছে ডোম ডোমনীরা—বুড়ো ঠাকুরের গাছ ভাসাতে। পিছু পিছু চলেছে কিশোর দলের সঙ্গে অবন্তীমালা। কৃষ্ণ কেশের গুচ্ছ ধরে টানতে টানতে মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসেন সুদেষ্ণা দেবী। নম্র অনুযোগ জানান শ্বশুরের কাছে—"মালার বয়সের সঙ্গী সাথী সকল মেয়েই যে স্বামী শ্বশুর নিয়ে ঘর-সংসারে মন দিয়েছে! মালাকে শ্বশুর-ঘরে যদি নাই পাঠান, তবে জামাই ছেলের মতো হয়ে ঘরে আসুক। আর কি শূন্য ঘর ভালো লাগে?"

গোপনে চোখের জল মুছে হাসিমুখে আশ্বাস দেন জগদীশ—"ব্যস্ত কি মা, শুভ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়।" আর তারপর বার বার আঙুলে গোনেন। "হ্যাঁ, চৌদ্দই তো?" চৌদ্দ প্রায় উত্তীর্ণ হলো অবন্তীমালার। আর অপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। কিন্তু জগদীশের গোপন দৃষ্টি ঘোরে রুদ্রতাপকে ঘিরে। রুদ্রতাপ অনুগত প্রতিবেশী ব্রহ্মতাপ ভট্টের একমাত্র পুত্র। সুদর্শন যুবা, যথেষ্ট প্রতাপশালী হয়েও হৃদয়বান ও বিনয়ী। স্মৃতিশাস্ত্রে ও যুদ্ধবিদ্যায় সমান পারদর্শী। রুদ্রতাপের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পান জগদীশ। ব্রহ্মতাপও পাকে-প্রকারে অবন্তীমালাকে প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু তন্ত্রোল-এর সঙ্গে জগদীশের বিবাদ রয়েছে বলেই অন্যান্য প্রতিবেশী বন্ধুদের মনঃক্ষুণ্ন করাও এখন তার পক্ষে উচিত নয়! অবন্তীমালাকে পুত্রবধূ করবার অভিলাষ যে অনেকের! সুদীর্ঘ লোলবাহু তুলে সন্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলেন জগদীশ। আজ গ্রামবাসীর করুণাই যে এই অশক্ত বাহুর অন্তিম বল!

সঙ্গীদের মধ্যে রুদ্রতাপই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। কিন্তু শুধু সেজন্যই যে সঙ্গীরা রুদ্রতাপকে সমীহ করে, অনুগতের ভাব মনে রাখে তা নয়। রুদ্রতাপের বলিষ্ঠ দেহ এবং নির্ভীক নিরপেক্ষ মতবাদ এবং তার মনোহরণের বিভিন্ন রকমের দক্ষতার জন্যও তারা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু সঙ্গীদের মনে ঈর্ষা জাগায় দুরন্ত অবন্তীমালা! প্রখরা অবন্তীমালার উপরও যেন রুদ্রতাপের একচ্ছত্র প্রতাপ! সময়ে সে প্রতাপ প্রায় অত্যাচারে গিয়ে দাঁড়ায়। যে অবন্তীমালা অপরের সমাদর ভ্রূক্ষেপ করে না, সেই অবন্তীমালাকেই রুদ্রতাপের অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে দেখে তাদের মন বিরূপ হয়। কেন? কি কারণে রুদ্রতাপের প্রতি অবন্তীমালার এই পক্ষপাতিত্ব! অভিমানে সরে আসতে চায় অবহেলিত কিশোর দল। কিন্তু অবন্তীমালাকে যে দূরে রাখা যায় না, আবার পাশে গিয়ে কাছেও পাওয়া যায় না। সর্বাঙ্গে ওর অহঙ্কারের দৃপ্ত আবরণ। চঞ্চল আয়ত-চোখে ওর চুম্বকের আকর্ষণ! নিয়ত পাশে থেকেও প্রতীক্ষা করতে হয়, যদি মেলে তুচ্ছ সাহায্য গ্রহণের প্রত্যাশা, সামান্য করুণার প্রসাদ!

গ্রামের অধিষ্ঠিত দেবতা লোকনাথের জলপান, ননী-বাতাসা প্রসাদ প্রত্যহ ভাগ করে অবন্তীমালা। মুড়কী, ক্ষীরের ছাঁচ, মোহননাড়ু সমান ভাগে হেসে হাতে দেয় বটে প্রতীক্ষারত সঙ্গীদের, কিন্তু সাহায্যের জন্য কখনো ডাকে না। অবন্তীমালার সজাগ দৃষ্টি ঘোরে রুদ্রতাপের পাশে পাশে। রুদ্রতাপের মাছ ধরবার চার খুঁজে এনে বড়শির কাঁটায় গাঁথে। মাছ সে চার না ধরলে চারের নিকৃষ্টতার অপরাধে রুদ্রতাপের ছিপের আঘাতে গুম্‌রে কাঁদে অবন্তীমালা, কিন্তু অভিযোগ জানায় না। দুপুরে ছিপ নিয়ে মত্ত হলে রুদ্রতাপ, খাদ্য এনে সাদরে মুখে ধরে অবন্তীমালা। আমের দিনে আম, কুলের দিনে কুল, ঝালে নুনে সরস করে আনতেই হয় অবন্তীমালাকে। ঝালে নুনে সে কুল, আম বা কামরাঙা রুচিমতো না হলে, যত্নে প্রস্তুত ঝাল চাটনি না খেয়ে অবন্তীমালার চোখে রগড়ে দেয় রুদ্রতাপ।

পাখী মারায় রুদ্রতাপের অব্যর্থ সন্ধান। বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে পাখী ভূলুণ্ঠিত হলে উহা সংগ্রহের ভার অবন্তীমালার। সে নিষ্ঠুর দৃশ্যে উত্তেজিত অভিমানী কিশোর দল তখন দাঁতে দাঁত রেখে বলে—"নৃশংস!"

ডুরে-শাড়ি কোমরে জড়িয়ে কুল কুড়োয় অবন্তী। উত্তুরে হাওয়া কুঞ্চিত চূর্ণ কুন্তল উড়িয়ে গালে কপালে খেলা করে। দ্বিধায় ও আকর্ষণে আগু-পাছু করে এগিয়ে যায় কিশোররা। অবন্তীমালার আঁচল উপচে ভরে দিতে চায়, উজাড় করে দিতে চায়, যার যার সংগৃহীত ফল। তাদের এত যত্ন-সংগৃহীত কুল আঁচল উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলে, পায়ে দলে সিংহিনীর পদক্ষেপে চলে যায় অবন্তীমালা। উপেক্ষিত কুল আরো নির্মম পায়ে একটি একটি করে টিপে ধুলোয় মিশিয়ে রুদ্রতাপের মরণ কামনা করে সঙ্গীরা। এই অপমান অবন্তীর অপর সঙ্গী হরিশ্চন্দ্রকে বেশি আঘাত করে।

চতুষ্পাঠী বসে জগদীশের আটচালায়। মহামহোপাধ্যায় বিশ্বম্ভর তর্কচূড়ামণির দক্ষিণ হস্ত, প্রিয় ছাত্র রুদ্রতাপ সর্বদা বসে তর্কচূড়ামণির ডান হাতের কাছে। এক একদিন নিঃশব্দে তর্কচূড়ামণির পেছনে এসে দাঁড়ায় অবন্তীমালা। মুখ টিপে হাসে পাঠরত ছাত্ররা, সে হাসিতে জ্বলে ওঠে অবন্তীমালা। মহামহোপাধ্যায় কিন্তু এই বুদ্ধিমতী কিশোরীকে সস্নেহে স্থান দেন বাম হাতের কাছে। ছাত্রদের তর্ক শোনে অবন্তীমালা, কিন্তু তর্ক তোলে না। আবার কখনো হয়তো জগদীশ যখন ভবদেব ভট্টের তৌতাত্তিতমত তিলক বা হলায়ুধ মিশ্রের মীমাংসা-সর্বস্বর সঙ্গে মনোযোগ সহকারে নিজ মত বিচারে ব্যস্ত, তখন জগদীশের পিঠের কাছে এসে গড়িয়ে পড়ে অবন্তীমালা। বলে—"পুঁথি রাখ দাদা, মনের মতো তর্কের লোক পাই না। এস তোমার সঙ্গে তর্ক করি।" সস্নেহে পৌত্রীকে কাছে টেনে হাসেন জগদীশ—"অত তার্কিক হোসনে দিদি, তর্কবাগীশ গৃহিণীকে সহ্য করে না মন্দ পুরুষ।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলেন—না, আর আপন স্বার্থে ধরে রাখা যায় না স্রোতস্বিনীকে!

সরস্বতী পূজায় ঘরে ঘরে হয় পুঁথি পূজা। প্রতিমা ওঠে জগদীশের আটচালায়। মহামহোপাধ্যায় পট্টবস্ত্র পরে ব্রাহ্মণ্য ঊর্ধ্বটিকা এঁকে অগুরু চন্দনে দেহ সুবাসিত করে পূজায় বসেন। এই অপঠনের শুভদিনেই হয় বিদ্যারম্ভ। গন্ধ-যূথীকার মালায় মাথায় কাকচূড়া বাঁধা, চোখে কাজল, কপালে চন্দনের তিলক, পরনে শেফালি-বৃন্ত-রঞ্জিত কৌপীন, এক হাতে দুধপূর্ণ মস্যাধান ও হংস পুচ্ছের লেখনী, অপর হাতে অঞ্জলির পুষ্পপত্রে পূর্ণ সাজি, কুক্ষিতে কয়েকখানি তালপত্র নিয়ে দেবীর চরণে অঞ্জলি দিতে, চঞ্চল উৎসাহে দৌড়ে চলে গ্রামের বালকরা চতুষ্পাঠী অভিমুখে। পূর্ণ মস্যাধানের দুধ ছল্‌কে ছল্‌কে নাচে। বধূরা ঘরের দ্বারে আর ঘরে ঘরে আঁকে মঙ্গল আল্পনা। যুবকরা সাজায় মঙ্গল পল্লব। বৃদ্ধারা পথের ধূলি সিক্ত করে ছড়িয়ে আসেন শান্তিজল।

সেদিন কুল পাড়তে আঁকশির সঙ্গে ভেঙে পড়লো এক খণ্ড ডাল। কণ্টকিত ডালখানা পড়ে কেটে গেল কপালের কোণটা। কপাল থেকে কাঁধে পড়ে কাঁধটাও ছড়ে গেল অনেকখানি। কাতরোক্তি করে উঠলো অবন্তীমালা। অদূরে মাছ ধরছিল রুদ্রতাপ। শব্দ শুনে ছিপ ফেলে কাছে এসে ধমকে ওঠে—"ডাল সুদ্ধু ভাঙলি! যাঃ, এ সব কি মেয়েদের কাজ? বলেছি না—আঁকশিতে কুল পাড়বি না? তলায় যা পড়বে তাই কুড়োবি?"

কান্না-চাপা-গলায় অবন্তীমালা উত্তর দেয়—"মাটিতে পড়েনি যে!"

গণ্ড বেয়ে রক্ত ঝরছে অবন্তীমালার। আঁচলে মুছে কুণ্ঠিত নতমুখে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু রাগ যায়নি তখনো রুদ্রতাপের। বলে—"ফের যদি কখনো আঁকশি টেনে গাছের ফল ছিঁড়িস, তাহলে দেখবি মজা!" খরতরা মুখরা

অবন্তীমালা চোখের জল মুছে নিঃশব্দে অপরাধকুণ্ঠিত মুখে ধীর পায়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

—"দাঁড়া, বড় যে চলে যাচ্ছিস? কপালটা বেঁধে দিতে হবে না!" বলে অবন্তীমালার হাত ধরে জলের ধারে এনে রুদ্রতাপ সযত্নে কপাল ধুয়ে কোঁচার কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দেয় কপাল। অবন্তীমালা চোখ বুজে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে ছেড়ে দেয় নিজেকে অপটু বৈদ্যের হাতে। বৈদ্যের দায়িত্ব শেষ করে, অবন্তীমালার পিঠে হাত রেখে কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসা করে রুদ্রতাপ—"বড্ড ব্যথা করছে, না রে অন্তি?"

সজল চোখে হাসিমুখে উঠে পড়ে অবন্তীমালা বলে—"না, লাগেনি তো বেশি।"

ঘরে ফিরে এলে অবন্তীকে দেখে জগদীশ হেসে বলেন, "নিখুঁত আননে খুঁত করে এলি দিদি?"

লজ্জারক্ত মুখে ঠোঁট উল্টে ছুটে চলে যেতে যেতে উত্তর দেয় অবন্তীমালা—"চাঁদে খুঁত না হলে কি চাঁদ হতো দাদা?"

উপলব্ধি করেন জগদীশ, আর অপেক্ষা করা হয়তো অপরাধই হবে।

সন্ধ্যা আসন্ন তার উপর চতুর্দিক ঘন মেঘাচ্ছন্ন। বাথানের পথ বেয়ে অবন্তীমালা যূঁইয়ের মালা হাতে দ্রুত ফিরছিল। হঠাৎ পাশের বৈঁচীর ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায় রুদ্রতাপ। জিজ্ঞাসা করে—"মালা কার?"

চমকে থমকে দাঁড়ায় অবন্তীমালা। তারপরই উচ্ছল হেসে ওঠে বলে—"ওঃ মা, তুমি! আমি ভাবলাম বুঝি চিতে!"

—"হুঁ, কিন্তু ও-মালা কার?"

রুদ্রতাপের কুঞ্চিত ভ্রূ'র দিকে চকিতে চেয়ে, ভীত কুণ্ঠিতমুখে মালাটি আঁচলে আড়াল করে বলে অবন্তী—"কন্‌কায়েত পাড়ার হৈমবতীর। বরকে দেবে।"

—"হৈমবতীর বরের মালা তোর হাতে কেন?"

—"বা···রে! আমি বাথানে বসে গাঁথলাম যে এতক্ষণ?"

—"হৈমবতীর বরের মালা তুই গাঁথলি বসে?"

—"কি করবো, হৈমবতীর মা ডাকাতের ভয়ে বাথানে আসতে দেয় না যে হৈমবতীকে! বিয়ে হয়েছে, বাথানের পথে হাঁটতে ওর বরের আর শ্বশুরের মানা।"

—"আর তোর বুঝি মানা নেই মাঠে-ঘাটে চুল উড়িয়ে বেড়াতে?"

—"বাঃ, আমার কি শ্বশুর আছে, না বর আছে যে ঘরে মুখ গুঁজে বসে সকলের মানা শুনবো?"

—"হুঁ। আমি বলছি, এমন করে ভর সন্ধ্যায় তুই পথে বেরুবি না। আর, যার যার বরের গলায় মালা পরবার সখ, তারা নিজের বৌকে দিয়ে মালা গাঁথিয়ে গলায় পরুক। দে, ও মালা আমার।"

রুদ্রতাপ হাত বাড়ায় মালার দিকে। দু'পা পেছনে হটে বলে অবন্তীমালা —"বাঃ, মালা চেয়েছে হৈমবতী, কি বলবো তাকে?"

—"বলবি, যার যার বরের মালা সেই সেই গাঁথুক গে।"

—"আহা কি বুদ্ধি! নতুন বরের জন্যে হৈমকে বসে মালা গাঁথতে দেখলে লোক হাসবে না বুঝি?"

—"লোক হাসাতে যাদের অত লজ্জা, তাদের আবার বরকে মালা দেবার সখ কেন?"

এগিয়ে যায় রুদ্রতাপ। বলে—"দে, ও মালা আমার।"

দু'হাতে আঁচল আড়াল করে মালা সংরক্ষণের চেষ্টায় নুয়ে পড়ে অবন্তীমালা বলে,—"বাঃ, তুমিই বা আমার কোন বর যে, তোমায় মালা দেব আমি?"

—"নয়তো কি? দে, আমার মালা দে।"

—"যাও, দেবো না মালা—পথ ছাড়ো, যা মেঘ করেছে, বৃষ্টি এল বলে। হৈম এসে হয়তো বসে আছে আমাদের ওখানে, আমার পথ চেয়ে। সন্ধ্যার আঁধারে এসে চুপি চুপি মালা নিয়ে যাবে বলেছে।"

—"থাক বসে হৈমবতী। হৈমবতীর বরকে তোর গাঁথা মালা দিতে দেবো না আমি। দে, ও মালা আমার।"

মাথা অবনত করে দেয় রুদ্রতাপ। বনহরিণী অবন্তীমালার মুখেও লজ্জার আভা দেখা দেয়। দুরু দুরু করে ওঠে বুক। কম্পিত হাতে তুলে দিতে যায় মালা। আচম্বিতে সংঘাত লাগে মেঘে মেঘে, কড়্ কড়্ শব্দে শাণিত ছুরীর ফলকের মতো এঁকে বেঁকে মেঘ কেটে ঝল্‌কে ওঠে বিদ্যুৎ! ভয়ে চমকে রুদ্রতাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবন্তীমালা। বিবশ হাত থেকে খসে পড়ে যুঁইয়ের মালা।

এক বাহুতে অবন্তীমালাকে আবদ্ধ রেখে ভূলুণ্ঠিত মালা তুলে গলায় পরে রুদ্রতাপ। তারপর বলে—"বুঝলি? বজ্র সাক্ষী রেখে আজ বিয়ে হলো আমাদের। অন্য বরের গলায় মালা দেওয়া চলবে না আর তোর। পরের বরের জন্য মালা গাঁথতেও আর দেবো না আমি।" বৃষ্টি নামে বড় বড় ফোঁটায়। বৃষ্টি-ধোয়া বিহ্বল মুখখানা তুলে ধরে একবার নির্নিমেষে চেয়ে রুদ্রতাপ বলে ওঠে—"চল, এবার বাড়ি চল।"

মালেক মুঘীষ-উদ্-দীন্ তঘ্রোল খান তখন বাঙলার মনসবদার।

দিল্লীর সুলতান গিয়াস্-উদ্-দীন্ বলবন তুরস্ক ক্রীতদাস তব্রোল-এর বল-বীর্যে প্রসন্ন হয়ে বাঙলার মসনদী বা মালেকানী রক্ষায় তাঁকে নিযুক্ত করেছেন। তুরস্ক তব্রোল যুদ্ধ-বিলাসী ও লুণ্ঠনে তৎপর। বাঙলার মসনদ তখন লক্ষ্মণাবতী। চলতি কথায় বলতো লখ্নৌতি। সেখানে বসে তিনি নিয়ত বাঙলার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র যুদ্ধে, লুণ্ঠন ও আত্ম-যুদ্ধে রত হীন-বল ছোট-ছোট হিন্দু ও বৌদ্ধরাজ্যগুলি অধিকতর বিপর্যস্ত করে তুলছিলেন। ভাগীরথী তীরস্থ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আট ক্রোশ ব্যাপী লখ্নৌতি রাজধানীর রাজ্য ক্রমে বিস্তৃততর হয়ে তুরস্ক কবলিত হয়ে পড়ছিল। রাজ্যের বিস্তৃতি ও লুণ্ঠিত ধনে গর্বিত হয়ে কুমন্ত্রীদের মন্ত্রণায় তব্রোল মনে করলেন, দিল্লীর সুলতান বৃদ্ধ ও অসুস্থ, তাঁর দুই উপযুক্ত পুত্র মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে ব্যস্ত, সুতরাং বাঙলার প্রতি মনোযোগের অবকাশ বা সামর্থ্য এসময়ে সুলতানের নেই। অতএব বাঙলার পরিপূর্ণ আধিপত্য গ্রহণের এই সুবর্ণ সুযোগ। তব্রোল সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উড়িষ্যার জাজনগর আক্রমণ করলেন। জাজনগর লুণ্ঠনে প্রাপ্ত বহু ধন রত্ন হাতী ও বাঁদীর অংশ সুলতানকে আর ভেট পাঠালেন না। সেই ধনরত্নে নগরবাসী ও সৈন্যদের আনুগত্যলাভে সক্ষম হয়ে তব্রোল সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ নাম গ্রহণ করলেন ও নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন এবং খুৎবার ব্যবস্থা করে বাঙলার প্রকৃত সুলতান হয়ে বসলেন।

অতি প্রিয় ক্রীতদাসের এই কৃতঘ্নতায় সুলতান বলবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়ে তব্রোল-এর ঔদ্ধত্য দমনার্থে, অব্হোদ অধিপতি আমীর খানকে সেনানায়ক রূপে পাঠালেন।

বলবনের বিশাল ফৌজ বাঙলার দ্বারে,—এ সংবাদ বাঙলার সুদূর গ্রামেও পৌছলো। নিয়ত যুদ্ধে নিপীড়িত গ্রামবাসী আবার যুদ্ধের সংবাদে হায় হায় করে উঠলো।

বর্ষার ভরা নদীতে নৌকার বহর নিয়ে সৈন্য সংগ্রহে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরছেন তব্রোল-এর অনুচর কুলিশ খান। করভার প্রপীড়িত বিষণ্ণ কুশী গ্রামেও হানা দিলেন কুলিশ। মনে সমাদর না থাকলেও মানের সমাদরের অভাব হয় না রাজ-পুরুষদের। কুশীগ্রামেও সমাদরের অভাব ঘটলো না কুলিশের। স্ত্রী-কন্যা ঘরে রেখে রাজপুরুষের অভ্যর্থনায় হাসিমুখে নত হয়ে এগিয়ে এল গ্রামবাসী। এলেন না কেবল জগদীশ। নিজেকে যে অজাতশত্রু মনে করে তারও শত্রু থাকে। সুতরাং জগদীশেরও ছিল। প্রশংসাও অনেক সময়ে শত্রুতায় পরিণত হয়। জগদীশের পৌত্রীর অসামান্য রূপের খ্যাতি কিন্তু ইতিমধ্যে কুলিশের কানে পৌছে গিয়েছিল। সেই রাত্রে বজ্রপাতের শব্দে হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন সুদেষ্ণা। অপর কক্ষের দরজা খুলে ছুটে এলেন জগদীশ। চৌরী ঘরের বাঁশের চৌরশ বুননীর দেয়াল কাটা—হাঁ হয়ে ঝুলছে! শয্যায় অবন্তীমালা নেই!

দুরন্ত দুর্যোগ তুচ্ছ করে উন্মত্তের মতো ছুটে বেরোলেন বৃদ্ধ জগদীশ। সদরের শিশুকাঠের লৌহ সদৃশ দরজা উন্মুক্ত হয়ে অট্টহাসি হাসছে! সশস্ত্র দুই বিশ্বস্ত অনুচরের মুণ্ডহীন ভূলুণ্ঠিত দেহ থেকে রক্ত-ধারা জলের ধারায় মিশে রক্ত-নদী বয়ে চলেছে! আর একবার উপলব্ধি করলেন জগদীশ সাবধানতার অস্ত্রে ভাগ্য রোধ হয় না। জ্যোতিষার্ণবের ভবিষ্যদ্বাণী স্বার্থক করে প্রতিশোধ নিয়েছে তন্ত্রোল-এর অনুচর কুলিশ খান।

গ্রামে কোনো যুবক নেই। শিশু বৃদ্ধ বালক নিয়ে সন্ত্রস্ত দিন যাপন করছে স্ত্রী-কন্যা-বধূরা। কে করবে অবন্তীমালার সন্ধান? লোল দীর্ঘবাহু একবার টিপে পরীক্ষা করেন জগদীশ। না, জগদীশের যৌবনের মত্ত হস্তীর বল আজ নিঃশেষে গ্রাস করেছে শোক ও জরা। তবু একবার ঘুরে আসেন বল্লম হাতে আর বহু শত্রুর রক্তস্নাত পুরনো তলোয়ারখানি কোমরে গুঁজে। নাঃ, গ্রামে নৌকা নেই, ঘোড়া নেই, সমস্ত লুণ্ঠিত হয়ে তন্ত্রোল-এর যুদ্ধ সাজে নিয়োজিত হয়েছে। মনে হতাশা ও ভগ্ন শরীর নিয়ে নানা কৌশলে অবন্তীর খোঁজে ব্যাপৃত হলেন জগদীশ।

অসম্বৃত অঞ্চলে চোখ মুছে শোকাহতা সুদেষ্ণা গোপনে উপস্থিত হলেন জ্যোতিষার্ণবের দরজায়। এক ধামা বরণ ধান, একটি লাউ, এক কাঁদি কলা ও স্বহস্তে কাটা দুই বট সুতা রেখে অবগুণ্ঠিতা সুদেষ্ণা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের দ্বারে। গ্রামের ভাগ্যদ্রষ্টা জ্যোতিষার্ণব জয়ানন্দ উপাধ্যায় জরাগ্রস্ত ক্ষীণ দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করেন—"কে? ও, জগদীশের পুত্রবধূ? কন্যার সন্ধান জানতে এসেছো মা?"

এগিয়ে এসে ব্যাকুল ক্রন্দনে সুদেষ্ণা লুটিয়ে পড়েন জয়ানন্দের পায়ে। —"হ্যাঁ বাবা, অভাগী এখন কোথায়? কি ভাবে উদ্ধার হবে বলে দিন।"

শীর্ণমুখে বিকৃত হাসেন জয়ানন্দ।—"বহু দিনই তো বলে দিয়েছি মা, হবে না, তোমার কন্যার উদ্ধার হবে না। তোমার কন্যা রাজরাণী হয়েও ম্লেচ্ছান্নভোগিনী। জগদীশ গ্রহ নিন্দা করে। অবিশ্বাসীদের 'পরে গ্রহের কোপ অধিক।"

—"কিন্তু বাবা, আমি? এ অভাগীর কি হবে?"

—"যাও মা, ঘরে যাও। জগদীশ নির্বংশ হবে, এই গ্রহের বিধান।"

—"কিন্তু কোন পাপে?"

—"পাপ? পাপ এককের নয় মা, সমষ্টির। আজ ব্যভিচারে, উৎকোচ গ্রহণে, রক্তপিপাসায় ও স্বার্থ সুখে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়েছে। ধর্মভূমি ভারত আজ ম্লেচ্ছ ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। ম্লেচ্ছ ভারতের কোণে কোণে আজ যবনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, ম্লেচ্ছ পূজায় ভারত পুণ্য মন্ত্র বিস্মৃত হবে। কেউ রোধ করতে পারবে না। অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি, বিবিধ বিদ্যাবিচার বাচস্পতি সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর, সোমবংশ প্রদীপ, প্রতিপন্নকর্ণ,

সত্যব্রত গাঙ্গেয়, শরণাগত বজ্রপঞ্জর, পরমেশ্বর ও পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন নিজে ছিলেন জ্যোতিষার্ণব। তিনি এইসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েছিলেন বলেই, বিনা উদ্যমে মগধরাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন যবনের হাতে। গ্রহ সন্তাপের ফল কখনও রোধ করা যায় না। গ্রহ সন্তাপিত হলে রাজার রাজ্য চলে যায়। সামান্যদের আর কি যাবে?"

—"অভাগী এখন কোথায়, কি ভাবে আছে একবারটি বলে দিন বাবা।"

খড়ি পেতে বহুক্ষণ আঁক কাটেন জ্যোতিষার্ণব। শীর্ণমুখে আলোছায়া খেলে যায়, সে দিকে চেয়ে অঝোরে চোখের জল ঝরে সুদেষ্ণার। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন জয়ানন্দ, বলেন—"তোমার কন্যা এখনও যবন কুলিশের অন্তঃপুরে বাস করছে।" তারপর একটু থেমে বলেন,—"আর প্রশ্ন করো না, ঘরে যাও মা। অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট থাকলেই অপেক্ষাকৃত শান্তি।"

জয়ানন্দের শীর্ণ বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের প্রতি চেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ফেরেন সুদেষ্ণা।

সকল কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা করে পুরাতন প্রভু লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র মাধব সেনের কাছে রাজধানী বিক্রমপুরে একখানি পত্র পাঠালেন জগদীশ। পত্রবাহক ব্রাহ্মণ বহু বিলম্বে বিষণ্ণ মুখে ফিরে এলেন। গতবৎসর বিক্রমপুর লুণ্ঠন করেছেন তঘ্রোল। লুণ্ঠিত রাজ্যের অধিবাসীরা এখনও দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠেনি। লক্ষ্মণ সেনের পৌত্ররা ক্ষীণরাজ্য, হীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভ্রাতৃদ্রোহে ব্যস্ত। সেন রাজ্যের এই মুমূর্ষু অবস্থায় সাহায্য ভিক্ষায় ফললাভের আশা নেই। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় অবশিষ্ট দেহবলের সঙ্গে মনোবলও ক্ষয় হতে লাগল। অবশেষে নিরুদ্বেগ মৃত্যুর কোলে বিশ্রাম নিলেন জগদীশ। চোখের জলে স্বামীকুল প্রদীপ নির্বাপিত করে গ্রহবিপ্রকে প্রণাম জানিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন সুদেষ্ণা।

লুণ্ঠিত সম্পদ গৃহে রেখে, সংগৃহীত সৈন্য নিয়ে সরযূতীরে তঘ্রোল-এর যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন কুলিশ খান। কুলিশের সৈন্য সংগ্রহে প্রসন্ন হয়ে তাকে সহস্র দিনার ইনাম দিলেন তঘ্রোল। তারপর বলবন-এর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ জয় করে সাহঙ্কারে রাজধানী লখ্‌নৌতিতে ফিরে এলেন। বলবন শুনলেন সেনাপতি আমীর খান প্রায় বিনা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং পরাজিত সৈন্যদলের অনেকেই তাহার সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে, তঘ্রোল-এর দলভুক্ত হয়েছে।

যুদ্ধ অবসানে বহু পারিতোষিক এবং জায়গীর লাভ করে, হাতী বাঁদী ও প্রচুর স্বর্ণে ইজ্জৎ ভারী করে হাল্কা হাওয়ায় মন উড়িয়ে এক বৎসর পর গৃহে ফিরলেন কুলিশ খান। সদ্য অপহৃতা অবন্তীমালাকে কুলিশ অনেকটা অনুকম্পার চোখেই দেখেছিলেন, তবু যুদ্ধ ক্ষেত্রে কর্মক্লান্ত অবসরে বার বার

মনে পড়েছে, অবন্তীমালার আত্মজন হারানোর ব্যথায় ব্যাকুল অশ্রুপূর্ণ ঘন পল্লবান্বিত আয়ত-চোখ দুটি ও ক্রন্দন-কম্পিত রক্তিম ঠোঁটের স্ফুরণ। দীর্ঘ এক বৎসর পরে কুলিশ আবার অবন্তীমালার দর্শন পেলেন। দেখে শুধু মুগ্ধ নয়, একবারে আত্মহারা হলেন। সেদিনের সেই অর্ধস্ফুট বনপুষ্পস্তবক আজ যেন পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত! কিশোরীর অস্থির চাঞ্চল্য সংবদ্ধ হয়েছে সুকৃষ্ণ দীর্ঘ পল্লবিত আয়ত-চোখের ভ্রমরকৃষ্ণ তারায় আর সরস রক্তিমাভ ঠোঁটের অনুচ্চারিত অহঙ্কারের সুবঙ্কিম ভঙ্গিমায় ঝরে পড়ছে যেন সাম্রাজ্যজয়ী স্ফুলিঙ্গ! গতি-ছন্দের আন্দোলনে প্রতি অঙ্গে শাণিত তরবারির ঝলক! দূরে গেলে কেবল কাছে টানে, আবার কাছে এলে স্পর্শ করতে ভয় হয়।

দ্বিধা-শঙ্কিত মনে সাহস সঞ্চয় করে বিবাহের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হলেন কুলিশ।

মাত্র এক বৎসর। কিন্তু এই এক বৎরের মধ্যেই পরিবেশ ও ভাগ্যের খেলায় মনে হয় যেন দশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে অবন্তীমালা। প্রত্যাখ্যানে লাভের আশা কম। বরং আজকের বশ্যতায় কাল উদ্ধারের দ্বার উন্মুক্ত হতেও বা পারে! বিশ্রাম-কক্ষে দাঁড়িয়ে সুন্দর মুখের সুনীল রেশমী মসলিনের ওড়না সরিয়ে অবন্তীমালা তীক্ষ্ণ ঋজু দেহ হেলিয়ে বিনীত কুর্ণিশ করে, সরস রক্তিম ঠোঁট দুটি টিপে মৃদু হেসে কুলিশের আত্মহারা আবেদনের উত্তর দেয়। হাসিতে টোল পড়ে নিটোল পদ্মাভ গালে। সুরমা-আঁকা দীঘল-চোখে কটাক্ষ হেনে বলে, "হিঁদুর মেয়ে, বিয়ে হয়েছে শিশু বয়সে, এখন এ-বয়সে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য মন কি অত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা যায় খোদাবন্দ? পূর্ব স্বামীর স্মৃতি মুছে জনাবের মূর্তি বুকে কায়েম করতে হলে অন্ততঃ আরও বছর ঘোরবার অবকাশ চাই।" মুক্তার মতো দাঁতে রক্তিম ঠোঁট চেপে আবার মৃদু হাসির ঝিলিক ছড়ায় অবন্তী। সে হাসির মোহেই হয়তো আকাশে গুরু গুরু করে উঠে বর্ষার মেঘ আর কালো মেঘের বুকে ঝল্‌কে ওঠে বিদ্যুৎ! কাঠের জাফরি আঁটা অলিন্দের ফাঁক দিয়ে সে ঝলক সন্তর্পণে এসে চুম্বন দিয়ে যায় অবন্তীমালার হাসি-ঝরা রক্তিম মুখে চোখে। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ কুলিশের বুকের রক্তে ওঠে অস্থির চঞ্চল নৃত্য! মোটা লাল গালিচায় অর্ধ-নিমজ্জিত পদ্ম মুকুলিত পা দু'খানির 'পরে অবাধ্য চোখ অবনত করে জড়িতকণ্ঠে কুলিশ যা বলেন, তা শুনে আবার হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে অবন্তীমালা বলে—"হ্যাঁ খোদাবন্দ, আশমানের রোশনি আরো একবার চুম্বন করেছে আমায়, কিন্তু, তার ফল ভালো হয়নি। তাই তো বলি জোর করে আমাকে গ্রহণের চেষ্টা করবেন না।"

—"না সুন্দরী, আমি জোর করতে চাই না। জোর করবার ইচ্ছা থাকলে আগেই করতাম। তোমার ইচ্ছাই বহাল থাক। আমি অপেক্ষা করবো। তোমার বুকে আসন কায়েম করবার লোভে স্বয়ং খোদা তাল্লাহ্‌ও হয়তো যুগ

যুগ অপেক্ষা করবেন। বান্দা কুলিশের পক্ষে এক বৎসর প্রতীক্ষার দুঃখ তো সামান্য কথা।”

কুলিশের মুখের ভাবে বুকের উত্তাপ অনুমান করে আর একবার বাঁকা চোখের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করে কুর্নিশ করলো বিজয়িনী অবন্তীমালা।

বুকের নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে স্মিতমুখে বেরিয়ে গেলেন কুলিশ।

সজল চোখে অলিন্দের জাফরি সবলে চেপে ধরে অবন্তীমালা। আর কত যুদ্ধ করবে সে! এখন তুমি কোথায় রুদ্রতাপ? পিতামহ বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তুমি? তোমার বলিষ্ঠ বাহু নিয়ে তুমি কোথায় রয়েছ! অবিরল ধারা বইতে লাগল অবন্তীমালার চোখে।

সুলতানের সৈন্য প্রতিহত করে অহঙ্কারে উগ্রতর হয়ে উঠলেন তঘ্রোল। অনুচর কুলিশ খান সৈন্য সংগ্রহে গিয়ে সুন্দরীও সংগ্রহ করে এনেছেন, এ সংবাদ তঘ্রোল-এর কানে যেতে বিলম্ব হয়নি। বিজয়ী মনের উগ্র বিলাসে উন্মত্ত তঘ্রোল কুলিশ সংগৃহীত সুন্দরীকে অবিলম্বে প্রাসাদে পাঠাবার হুকুম-সহ সসৈন্য পাল্কি পাঠালেন।

সংবাদ পেয়ে কুলিশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁর পক্ষে তখন আর অবন্তীকে অন্তর থেকে বিদায় দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু সামান্য জায়গীরদার হয়ে পরাক্রমী মুঘীষের সঙ্গে বিবাদের অর্থ মৃত্যু-নিমন্ত্রণ। নিজের মুণ্ডই যদি না থাকে তবে সুন্দরী ভোগ করবে কে। সুতরাং কৌশলে পথ খুঁজলে পদোন্নতি, খেলাৎ এবং অবন্তীমালার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটা অসম্ভব নয়। কুলিশ তরুণ হলেও বুদ্ধিমান। মুঘীষের বল আছে বুদ্ধি নেই। মন্ত্রীর বুদ্ধিতে বলবনকে জয় করা সম্ভব হলেও সুন্দরীকে জয় করা যায় না।

চিন্তা প্রপীড়িত কুলিশ অর্ধরাত্রে অবন্তীমালার কক্ষে প্রবেশ করলেন। অসময়ে কুলিশের আগমনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওড়নাখানি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলে অবন্তীমালা। ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে গেলেন কুলিশ। কিন্তু নাগিনীর মতো হাতের ফনা তুলে সারেঙ্গীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে অবন্তীমালা।

থমকে থেমে গেলেন বিমূঢ় কুলিশ। করুণ দৃষ্টিতে অবন্তীর মুখের দিকে চেয়ে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

উদ্ধারের নতুন পথ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় মনের আগ্রহ মুখে প্রকাশ না করে অবন্তী নত চোখে উত্তর দিলে—“জনাবের আদেশ শিরোধার্য।”

স্তব্ধবিস্ময়ে খানিকক্ষণ অবন্তীমালার দিকে চেয়ে ত্রস্তপদে কুলিশ কক্ষ ত্যাগ করলেন।

অবন্তীমালার রূপ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন তম্রোল। তুরস্ক রমণীকেও নিষ্প্রভ করে দিয়েছে কাফের বাঙালী কন্যা!

নবাগতাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ পদ পান, তাঁরাই অধীশ্বরী হন শিশমহলে। অবন্তীমালার জন্যও নির্দিষ্ট হলো সুলতানের বিশেষ অনুগৃহীতার সেই আবাস —আরসী-আঁটা শিশমহল।

কুলিশের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বাঙলার স্বাধীন সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ তাঁকে পারস্য-মোতির মালা ও খিলাৎ নিশানাদার দিয়ে, অন্যতম পার্শ্বচররূপে গ্রহণ করলেন। মালেক কুলিশের জন্য বহাল হলো কিল্লার অনতিদূর নগরে নবনির্মিত আমীরী বালাখানা।

বিশ্রাম কক্ষে ফুরসীর রূপোর নল অলক্ত-রঞ্জিত বিম্ব থেকে নামিয়ে পার্শ্বচরী মামুদাকে জিজ্ঞাসা করেন তম্রোল-এর প্রধানা—"একটা বঙাল কাফেরাণী এসেছে, শুনলাম নাকি অতি বড় রূপসী! একটু নজর রাখিস। এসেই নাকি শিশমহলে উঠেছে। দেখিস, শেষ পর্যন্ত না বড়খাসমহলে হানা দেয়।"

সহাস্যে অভয় দেয় মামুদা—"হু! রূপসী! আর হলেই বা কি? একটা বঙাল টিয়ার ঠোঁটে পারস্য-মোতির মালা তুলে দেবেন, সুলতানের আক্কেল এমন জখম করবার মতো টিয়া আজও পয়দা হয়নি সুলতানা। তা ছাড়া সুলতানের নজর এখন দিল্লীর তক্ত্-এ, রূপসীর তক্ত্ বখরার অবকাশ নেই। এসেছে টিয়া, খাঁচায় ছোলা পাবে, ব্যস্। এ বাঁদীর কসম সুলতানা, নিজের তক্ত্-এ নিশ্চিন্ত থাকো।"

—"কিন্তু···সে রূপসীকে আমায় একবার দেখাতে পারিস মামুদা? সে রূপের ধার কেমন?"

—"হায় সুলতানা, তুমিও যেমন? বঙাল কাফেরাণীর আবার ধার! বঙাল ছুরীর ঝলক যদিবা থাকে, ধার পাবে কোথায়? কালই সে কাফেরাণী বাঁদীকে এনে সুলতানার পঁয়জরের তলে হাজির করবো। নিজের চোখে দেখে সত্যি মিথ্যে বিচার করে বাঁদী মামুদাকে দশ পঁয়জর দিও।"

মামুদা যত সহজ মনে করেছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বঙাল কাফেরাণীকে বড় সুলতানার সম্মুখে হাজির করানো তত সহজ নয়। তম্রোল তাঁর প্রধানার উত্তাপ জানেন, সেজন্য শিশমহল-বিবি সংরক্ষণে মোতায়েন করেছেন সতর্ক প্রহরী। সে সতর্কতা ভেদ করে শিশমহল প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। কিন্তু মামুদা বাঁদী যুদ্ধে নেমে পরাস্ত হতে শেখেনি। মামুদার কৌশলী মন ভিন্ন পথে সিদ্ধি খুঁজতে থাকে।

দেহমনের বিশ্রাম থাকে না অধিকার-লোলুপদের। পরাজিত বলবন, অপমানে অধিকতর ক্ষুব্ধ হয়ে প্রবলতর আয়োজন করে দ্বিতীয়বার ফৌজ

বাঙলার পথে পাঠিয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। সুরায় নিজের উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত করে অর্ধরাত্রের পর নর্তকী বিদায় দিয়ে আদেশ করলেন পানমত্ত তভ্রোল—"নয়া বিবি লাও।"

আশমানী রং-এর সল্‌মাদার রেশমী মসলিনের ওড়নায় অগ্নি-কটাক্ষ আধো আড়াল করে বাঁদীর পেছনে পায়ের গুর্জরী পঞ্চমের ধ্বনি সংযত করে মহীয়সী পদক্ষেপে অন্দরের রঙমহলে প্রবেশ করে অবন্তীমালা। কুর্নিশ করে বিদায় নেয় বাঁদী। দু'হাত প্রসারিত করে বিবশ পায়ে উঠে দাঁড়ান তভ্রোল। বলেন—"গুলরাণীর মতো মুখ ঢেকে রেখো না সুন্দরী, ঘোমটা খোল।"

দু'পা পেছনে সরে মসলিনের ওড়না সামান্য তুলে বিজিতার ভঙ্গিতে গ্রীবা তুলে দাঁড়াল অবন্তীমালা। দু'পা পিছিয়ে আসেন বিস্মিত বিহ্বল তভ্রোল। প্রসারিত বাহু কুক্ষিতলে আবদ্ধ করে মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলেন—"বিবি, তুমি মানুষী নও, বেহস্তের হুরী!" সাবলীল ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে সরস ঠোঁট টিপে নিজস্ব ভঙ্গিতে হাসে অবন্তীমালা। টোল পড়ে নিটোল গালে। সুরমা-আঁকা তীর্যক কটাক্ষে খেলে যায় বিদ্যুৎ! দুই হাত প্রসারিত করে আবার এগিয়ে আসেন আত্মহারা তভ্রোল—"দূরে দাঁড়িয়ে আর যন্ত্রণা বাড়িও না সুন্দরী, কাছে এস। তোমার চোখে সুলতানের পাশে বসবার যোগ্য রোশনি! তোমায় নিকা করে আমি সুলতানার তক্‌ত্-এ বসাব। আজ রাত্রি প্রভাতেই তোমায় নিকা করবো বিবি!" পায়ে পায়ে পেছনে সরে তভ্রোল-এর দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখে বিনীত কুর্নিশ করে সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসে অবন্তীমালা—"সুলতানের হুকুম এ বাঁদীর শিরোধার্য।"

—"হ্যাঁ, তোমাকেই খাস সুলতানার তক্‌ত্-এ বসাব আমি।" ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করে আরো দু'পা এগিয়ে আসেন তভ্রোল। বাইরে কালো মেঘ ছিঁড়ে চমকে ওঠে বিদ্যুৎ! বজ্রের হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে সুউচ্চ প্রাসাদ-কক্ষ, দেয়ালে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে সে হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি! চমকে দু'পা পিছিয়ে যান বিমূঢ় তভ্রোল। গ্রীবা হেলিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে হাসে অবন্তীমালা—হাসির রিনি রিনি বজ্রের প্রতিধ্বনিতে মিশে অশ্রুত ভয়াল এক ঝঙ্কার তোলে। সুবঙ্কিম ঠোঁট টিপে বলে অবন্তীমালা—"আমরা হিন্দু রমণী জাহাঁপনা। বিবাহের পূর্ব হতেই স্বামীর চরণে হৃদয় বিকিয়ে রাখি। যে স্বামীকে বিবাহের পূর্ব হতে হৃদয়ে বসিয়ে ধ্যান করেছি, তাকে কি অকস্মাৎ ভোলা যায়? দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে সুলতানকে হৃদয়ে বসাবার সৌভাগ্য যে আসতে পারে—এ তো কল্পনায়ও আসেনি কোনোদিন। আজ জাহাঁপনার পবিত্র মুখে যা শুনলাম সে সৌভাগ্য যে সত্যি, তা অনুভব করবার মতো কিছু সময় দিন।"

—"সে হয় না বিবি, কালই হতে হবে নিকা। সময় আমার নেই। সম্মুখে যুদ্ধ। এবার বিপুল আয়োজন করে আসছে বলবনের সৈন্য। অবকাশ আমার খুবই কম। এবার যুদ্ধে মরি কি বাঁচি স্থিরতা নেই। কিন্তু, তোমার

মতো রূপসী দেখে, মরণ এসে দাঁড়ালেও গ্রহণ না করে মরণের মুখে প্রবেশ করা যায় না। যেমন করেই হোক কালই হতে হবে নিকা। আর দূরে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণা বাড়িও না সুন্দরী।" এগিয়ে আসেন তব্রোল। তব্রোল-এর স্পর্শ বাঁচিয়ে পায়ে পায়ে সরে যায় অবন্তীমালা। সুরারক্ত মুখে মুগ্ধ হাসি হাসেন তব্রোল—"তুমি কি জান না সুন্দরী, তোমার প্রথম কটাক্ষেই সিংহ-বিক্রমী বলবন বিজয়ী তব্রোল পরাস্ত হয়েছে! নতুবা ইতিপূর্বে নারীর করুণা ভিক্ষায় গৌড়ের ব্যাঘ্র মুঘীষ-উদ্-দীন্ সময়ের অপব্যয় করেছে, এমন কেউ বলবে না।"

—"কিন্তু, নিকার পূর্বে আমায় স্পর্শ করলে আপনার মঙ্গল হবে না জাহাঁপনা। সেই কথাই বলে গেলেন ঈশ্বরের বজ্র দূত।"

অজ্ঞাতে যেন ঈষৎ কেঁপে ওঠেন তব্রোল।—"অমঙ্গলের কথা এখন বলো না সুন্দরী! বলবনকে এবার উচিত শিক্ষা দিয়ে, মুঘীষ-উদ্-দীন্-এর বাহুবল ভালো করে জানিয়ে ফিরতে চাই। যাতে, ভবিষ্যতে আর বাঙলার পথে পা বাড়াবার সাহস না করেন তিনি। সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ একদিন দিল্লীর তকৃত্-এ বসবে সুন্দরী। সে দিন তুরস্ক-শৃগাল বলবন মুঘীষ-উদ্-দীন্-এর করুণায় প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে তুরস্কে ফিরে যাবে। আর তখন সুলতান মুঘীষ-এর সুলতানার তকৃত্-এ বসবে তুমি।"

তৃতীয়বার আভূমি বিনীত কুর্নিশ করে অবন্তীমালা—"জাহাঁপনার অনুগ্রহ আর এ বাঁদীর জন্মান্তরের তপস্যা। কিন্তু সম্মুখে যুদ্ধ। জাহাঁপনার মন সুস্থ নয়। সে সৌভাগ্যে-ভরা নিকার কি এই সময়? ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছায় জাহাঁপনা যুদ্ধ জয় করে ফিরুন। ততদিন, সেই সৌভাগ্যময় দিনের কামনায়, জাহাঁপনার বীর মূর্তি এ বাঁদীর হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠা করে, বাঁদী আপনার মঙ্গল তপস্যা করবে।" বলে আর একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানে অবন্তীমালা।

বিহ্বল তব্রোল সুরা-জড়িত স্বরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করেন—"হৃদয়-আসনে মূর্তি প্রতিষ্ঠা! বীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা!" কিছুক্ষণ আনত-মুখে থেকে বলেন তব্রোল—"বেশ……তাই হবে। সময় আমি তোমাকে দেবো সুন্দরী। কিন্তু দুই সর্তে।"

হাসির ঝলক দিয়ে কুর্নিশ করে বলে অবন্তীমালা—"সর্ত নয় জাহাঁপনা, হুকুম। জাহাঁপনার সে দুই হুকুম জানবার সৌভাগ্য হলে প্রাণের বিনিময়ে পালন করবে বাঁদী।"

—"প্রাণের বিনিময়ে নয়, প্রাণের স্পর্শ দিয়ে পালন করো সুন্দরী। প্রথম সর্ত: তোমার হৃদয় সিংহাসন আমার চাই। দ্বিতীয় সর্ত: যতদিন সে সর্ত পালনে প্রস্তুত হতে না পার, প্রতি সন্ধ্যায় রঙমহলে নাচমজলিসে তুমি উপস্থিত থেকে আমার পানপাত্র পূর্ণ করে দেবে।"

—"কি…ন্তু…"

—"কিন্তু কি?"

—"জাহাঁপনা সুরার চঞ্চলতায় যদি···"

—"যদি তোমার সুন্দর নয়ন সুন্দরতম দেখে অঙ্গ স্পর্শ করি ? তুমি জান না সুন্দরী, মুঘীষ-উদ্-দীন্ যাদের অনুমতির অপেক্ষা রাখে না, তারা নারী মাত্র। তাদের রূপ আছে, রোশনি নেই। মুঘীষ-উদ্-দীন্-এর চোখে আজ আর তুমি নারীমাত্র নও। বাঙলার মুঘীষ-এর আজ তুমি হৃদয়-সম্রাজ্ঞী। কেবলমাত্র তোমার সুন্দর দেহ নয়, তোমার ঐ রোশনি-চোখের মতো আলো-ভরা হৃদয়ও আমার চাই। সেজন্য অসংযমী মুঘীষও দিন গোনার অভ্যাস শিখবে। বহু নারীকে উপেক্ষায় চরণে দলে ফেলে দিয়েছি, কিন্তু প্রেম-কম্পিত হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করিনি কোনও নারীর প্রেম! সিংহাসন পেয়েছি, আকণ্ঠপূর্ণ সুরাপাত্র পেয়েছি, সুন্দরী নারীও পেয়েছি কিন্তু পাইনি নারীর প্রেম! তোমার হৃদয়দ্বারে প্রার্থী হয়ে সেই প্রাপ্তির আশায় দিন গোনার অভ্যাস শিখবে অসংযমী তঘ্রোল।"

তঘ্রোল-এর করুণ কণ্ঠস্বরে ও চোখের কাতরতায় অবন্তীমালার মনে হয়, ক্রীতদাস তঘ্রোল, আজ সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ হয়েও বড় অভাগা—বড় দরিদ্র! খাস বেলদার মসলন্দপোষে বসে পাশে রাখা হাতীর দাঁতের সরাব-ই-চৌকীর 'পরে রাখা সরাব-ই-সোরাই হাতে নিয়ে তঘ্রোল বলেন—"যাও, আজ রাত্রে আরাম তাকিয়ায় মাথা রেখে তঘ্রোল-এর হৃদয় বিচার করো, কাল সন্ধ্যায় তোমার চশমাশাহী চোখে নতুন মদিরা ঢেলে সুরাপাত্র পূর্ণ করে দিও।"

কুর্ণিশ করে করুণ মুখে গম্ভীর পায়ে চলে যায় অবন্তীমালা। অবন্তীমালার বিষাদ-মন্থর পদক্ষেপের প্রতি চেয়ে পানপাত্র পূর্ণ করেন তঘ্রোল।

গিয়াস্-উদ্-দীন্-এর সৈন্যদল পরিচয় পেয়ে গিয়েছিল সবুজ বাঙলার পথের এবং বহুমুখী খরস্রোতা ভাগীরথীর মতো অনায়াস ক্রীড়ারত বাঙালী সৈন্যের দক্ষতার। সুতরাং সেই অনুপাতেই আবার স্বীয়বাহিনী সুসজ্জিত করে পাঠিয়েছেন সুলতান বলবন। সে বিরাট রণ-সজ্জা পরিচালনা করে নিয়ে আসছিল—সেনাপতিরূপে তীরখুনী তুর্ক—সঙ্গে বলবন-এর অতিপ্রিয় অপর বৃদ্ধ ক্রীতদাস মালেক আমীর খান আবগীন, মালেক তাজ-উদ্-দীন্ ও ওমর খান জলাল-উদ্-দীন্ কন্দাহারী! নিষ্ঠুরতায় ও বলবীর্যে এরা কেউ কম নয়! এদের সঙ্গে সুশিক্ষিত বিপুল সৈন্যবল। চিন্তিত হয়ে উঠলেন তঘ্রোল। সমস্ত বুদ্ধি, শক্তি ও সময় হারিয়ে যায় প্রতিপক্ষের যুদ্ধ-সাজের নানা আড়ম্বরের সংবাদে।

নর্তকী-মুখরিত অন্দরের রঙমহল আজ নির্জন। নর্তকী ও বাঁদীরা অলসতার বিলাসে সুগন্ধি জর্দা পানে বিম্ব রঞ্জিত করে পর-কুৎসায় মন খুলে দিয়ে হেসে বেড়ায়। মন্ত্রণা সভায় সন্ত্রস্ত গম্ভীরমুখে সুরা যোগায় শুধু খিদ্‌মদ্‌গার।

সেদিন প্রভাতে তঘ্রোল-এর দর্শনপ্রার্থী হয়ে মেঘমুক্ত উষার সূর্যের মতো এসে দাঁড়ালো একজন সুদর্শন যুবক। দর্শন দিতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে দেখলেন তঘ্রোল,—যুবকের প্রশস্ত ললাটে অচঞ্চল প্রতিজ্ঞা, উন্নত নাসায় বিশ্বাসের স্থিরতা। নবীন গুম্ফরেখা উন্মুখ হয়েছে পৌরুষের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ নিরীক্ষণ করে সপ্রশংস প্রসন্ন চোখে জিজ্ঞাসা করেন তঘ্রোল—"সুলতান সাক্ষাতে কী তোমার প্রার্থনা?"

—"গ্রামে অন্নাভাব, কর্মের পরিবর্তে অন্ন চাই জাহাঁপনা।"

—"সুলতানের এখন একমাত্র প্রয়োজন সৈন্যের, তা জানো বোধ হয়?"

—"জানি।"

—"কিন্তু, তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। এদেশে ব্রাহ্মণেরা হীনবীর্য।"

দপ্ করে জ্বলে ওঠে যুবকের আয়ত-চোখ। পরক্ষণেই সংযত হয়ে গ্রীবা উন্নত রেখে বলে—"বীর্য পরীক্ষার প্রয়োজন হলে এ-অধীন পশ্চাৎপদ হবে না।"

—"উত্তম। হাবিলদার যথা সময়ে তোমার সামর্থ্য পরীক্ষা করবে।"

—"পরীক্ষা প্রয়োজন হলে সুলতানের সাক্ষাতে দিতে এ অধম প্রস্তুত। সুলতানের ভৃত্যের সম্মুখে নয়।"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু হাসেন তঘ্রোল—"আচ্ছা, তোমাকে সৈন্যদলে বাহাল করা হলো। যথা সময়ে ক্ষমতা অনুযায়ী পদ ও দরমাহা ধার্য হবে।"

আভূমি কুর্ণিশ করে পিছু হটে চলে যায় তরুণ। তার দৃপ্ত ভঙ্গির দিকে চেয়ে খুশি হয়ে ওঠেন তঘ্রোল।

কিন্তু যুদ্ধ-কৌশলী বলিষ্ঠ বাঙালীও যেন এখন যুদ্ধ-বিমুখ! প্রচুর বেতন দানের আশ্বাসেও প্রয়োজন মতো সৈন্য সংগ্রহ হচ্ছে না। যুবকের নির্ভীক চোখের রোশনিতে প্রসন্ন সুলতান। তাঁর বদান্যতায় মাসিক দশ কপর্দপুরাণ প্রতিশ্রুতি পেয়ে সৈন্যদলে নিযুক্ত হলো রুদ্রতাপ।

বেশভূষার শেষে চোখে সুরমা টেনে পালঙ্কে বসে জুঁইফুলের মালাটি তুলে আঘ্রাণ নিয়ে ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কের ময়ূরের গলায় সন্তর্পণে ঝুলিয়ে দেয় অবন্তীমালা। বলে—"মালা, সাক্ষী থাকো বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাসের।"

কাল যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করবেন তঘ্রোল, সংবাদ এসেছে অন্দরে। অপেক্ষা করে আছেন অন্দরের একশ' ষাঠ সুলতানা, প্রধানা সহ। বিদায় সম্ভাষণে আসবেন তঘ্রোল। সকলের ভাগ্যে সুযোগ হয়তো আসবে না, তবু আশা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয় সকলকেই বাসকসজ্জায়। কোন ভাগ্যবতীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে দেখা দেবে কোন মুহূর্তে বলা তো যায় না? তাই সেই অনিশ্চিত মুহূর্তের জন্য প্রতি মুহূর্ত গুণতে হয়।

তঘ্রোল-এর গৃহে থেকে এই কয় মাসেই অবন্তীমালারও অভ্যাস হয়ে এসেছে এই অনভ্যস্ত বিসদৃশ আড়ম্বরের সুলতানী বিলাস। কিন্তু তবু কেন মনে পড়ে

সেই বাঁশের বাতায় ঘেরা গৃহ? মনে পড়ে কন্‌কায়েতপাড়ার হৈমবতীকে ও শেঠপাড়ার বৈজয়ন্তীকে? আর মালাকারদের গোহত্রীর লুকিয়ে লুকিয়ে হরিতেল মাটিতে আর করঞ্জা রসে তালপত্রে বরের পট এঁকে লুকিয়ে রাখা! মনে পড়ে ডোমপাড়ার ঝুম্‌নীর মাদলের তালে ঝুমুর নৃত্য, বুড়ো বাউল জ্যাঠার একতারায় একতালা বাউল গানের সঙ্গে প্রাণ-দোলান নৃত্য! পৌষালীর দিন ও লক্ষ্মী পূর্ণিমায় মা গোময় দিয়ে ঘর-দোর পরিচ্ছন্ন করে, গাঁয়ের বৌদের সঙ্গে মঙ্গল-গীত গেয়ে দেয়ালে উঠনে ভরে দিতেন মঙ্গল আল্পনা। লক্ষ্মীর ঘট ও সরায়, পৌষালীর কলসে ও ছাঁচে হরিতেল পত্রসারের কত অপরূপ চিত্র মা অঙ্কন করতেন। সূক্ষ্ম বুনানীর ধামায় ও কুলোয় গাবের আঠা লেপে নানা রঙ-এ জাঙালী আঁকতো ডোম ডোমনীরা! এমন দিনে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা ইতুর ঘট ভাসাতে যেত কোশাইয়ের স্রোতে শস্য-কন্যার গীত গেয়ে। অবন্তীমালাও ভাসিয়েছে কত!

"ভালো পতি ভালো ঘর।

শস্য-কন্যার বরে পাব, ভালো শাশুড়ী শ্বশুর।"

হাসে অবন্তীমালা—কি হয় ইতু পুজার শস্য-কন্যার আশীর্বাদে? কি হয় লোকনাথের নিত্য সেবায়? আর কিই-বা হয় এদের নিত্য মুয়াজ্জীনের ডাকে? মনে পড়ে যায়, জগদীশের কাছে হলায়ূধের মীমাংসা-সর্বস্ব পড়ছিল একদিন রুদ্রতাপ, সেদিন এই প্রশ্নই সে না বুঝে করেছিল। তার কথা শুনে রাগ খুবই করেছিল রুদ্রতাপ, আর অনেক করে তাকে বুঝিয়েছিলেন মর্মাহত জগদীশ। সেদিন জগদীশকে মর্মাহত দেখে যে-যুক্তি না বুঝেও অবন্তীমালা স্বীকার করে নিয়েছিল, আজ বিনা তর্কে যেন সেদিনের সকল প্রশ্নের উত্তর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ভাবতে পারে না অবন্তীমালা, ভাবতে কেমন যেন ভয় হয়। আবার সেই পুরনো প্রশ্নটিকেই ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে: আবার যদি ফিরে আসে সেই গ্রাম? সে অবন্তীমালাকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? কে জানে? উঠে যায় অলিন্দের পাশে। কারুখচিত কাঠের ঝিলিমিলি কাটা অলিন্দ, বাইরের আকাশ চেষ্টা করেও চোখে পড়ে না। সন্ধ্যা নেমেছে। ঘরে ফিরছে গ্রামের রাখালরা গরু নিয়ে বাঁশীতে ভাটিয়ালী সুর দিয়ে। খেতের আল ধরে ঘরে ফিরছে কৃষাণরা নিড়েনি হাতে গান গেয়ে—

"বাল কুমার ছঅ মুণ্ডধারী, উবাঅহীণা মুই এক নারী
অহং নিসং খাই বিসং ভিখারী গঈ ভবিত্তী কিলকা হমারী।"

ঘরে ফিরছে খেয়া-পারের মাঝি তাতাই খুড়ো, খেয়া-পণের ধানের পুঁটুলি মাথায় নিয়ে, পণের কড়ি ট্যাঁকে গুঁজে, আর হাল্কা মনে উত্তুরে হাওয়ায় ভাটিয়ালী সুর উড়িয়ে—

"ভবনই গগন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।

দু আন্তে চিনিল মাঝে ণ থাহী॥"

কুর্ণিশ করে কাছে এসে দাঁড়ায় বাঁদী রোশেনা। সহানুভূতির সুরে বলে, —"এতো উদাসকণ্ঠে ভাটিয়ালী ধরেছো? দেশের আকাশের জন্য মন কেমন করছে সুলতানা?"

ঝঙ্কার দিয়ে ফিরে দাঁড়ায় অবন্তীমালা,—"বলেছি না? সুলতানা বলে ডাকবে না আমায়!"

—"তবে কি বলবো? দিদি?"

—"হ্যাঁ, দিদি বলো, মাসী বলো, যা খুশি, কিন্তু সুলতানা নয়।"

—"কিন্তু সুলতান শুনলে এ বাঁদীর কবর হবে যে!"

—"কেন? সুলতানের সঙ্গে বিয়ে তো এখনো হয়নি আমার? বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সুলতানা হতে যাবো কেন?"

মলিন হাসে রোশেনা।—"বিয়ে? বিয়ে কারো হয় না সুলতানের সঙ্গে। হেরেমওয়ালীরা সবাই বাঁদী। তেমন ভাগ্যবতীর রূপ সুলতানের চোখ মাতালে 'নিকা' হয়, মন-ভোলান নিকা। সে নিকা বাহাল থাকে যতদিন না আবার নতুন আমদানীর তাঁর রূপ চোখ ধাঁধায়।" আবার একটু মলিন হাসে রোশেনা।

রোশেনার ব্যথিত কণ্ঠস্বরে করুণ হয়ে বলে অবন্তীমালা—"তোমারও তো অনেক রূপ রোশেনা?"

—"হ্যাঁ ছিল বৈ কি রূপ, যতদিন না জুবেদা রূপসী এসেছিল। জুবেদারও ছিল রূপ, যতদিন না তুমি এসেছিলে। আজ আমি আর জুবেদা দু'জনেই শিশমহল সুলতানার পার্শ্বচরী, অর্থাৎ বাঁদী।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোশেনা।

রোশেনার দীর্ঘশ্বাস অবন্তীমালার নির্জন মনে নাড়া দেয়।—"তুমি শিশমহল সুলতানার বাঁদী নও রোশেনা—সখী, ভগ্নী।"

আবার একটু মলিন হাসে রোশেনা।

একটু থেমে অবন্তীমালা বলে,—"জুবেদার আমার ওপর খুব রাগ, না রোশেনা?"

—"হওয়াই তো স্বাভাবিক দিদি। শুধু জুবেদা কেন? রাগ তোমার ওপর হয়তো অনেকেরই। এমনকি সুলতানা আজিনারও। তিনিও পথ খুঁজছেন রাগ মেটাবার। নিকা না হতে শিশমহল-সুলতানার সম্মান পায়নি তো কেউ এর আগে। এতদিন নিকা কবুল হয়েও থাকেনি কারো।"

—"কিন্তু বড় সুলতানার আমার ওপর রাগ কেন? তাঁর সিংহাসন কেড়ে নেবো, এমন তো কথা হয়নি।"

—"হয়নি বটে, তবে হবার সম্ভাবনা আছে বলেই হয়তো তিনি ভয় করেন।"

হাসির ঝলক খেলে যায় অবন্তীমালার ঠোঁটে। দেখে রোশেনার মনে হয়, সরস ঠোঁটে সে বুঝি ক্রূর হাসি!

অলিন্দের জাফরিতে চোখ রেখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে অবন্তীমালা —"তোমার আগের নাম কি ছিল রোশেনা ?"

—"মনোমোহিনী !"

—"মনোমোহিনী ?"

—"হ্যাঁ।"

—"সত্যিই তুমি মনোমোহিনী রোশেনা।" একটু হেসে আবার জিজ্ঞেস করে—"বাড়িতে তোমার আর কে কে আছে মনোমোহিনী ?"

ব্যথিত রক্তহীন মুখে ফ্যাকাসে হাসি এনে বলে রোশেনা—"ও নামে আর ডেকো না দিদি, ও নাম আমি ভুলে গিয়েছি।"

জাফরির ফোকরে চোখ রেখেই শ্লেষের হাসি হাসে অবন্তীমালা—"কেন ? তঘ্রোল-এর প্রসাদে !"

—"হয়তো তাই।"

—"কৈ বললে না তো বাড়িতে কে কে আছে ?"

—"বাড়িতে ছেলে আছে, মেয়েও হয়তো আছে।"

—"আর স্বামী !"

—"হ্যাঁ, স্বামীও হয়তো আছে। ছেলেটি—তা প্রায় বছর দশ হলো। মেয়েটি আছে কি না কে জানে ? ছেড়ে যখন আসি তখন মাত্র মাস পাঁচেকের। মায়ের বুক-হারা হয়ে সেকি আর বেঁচে আছে !"

—"তাদের জন্যে তোমার মন টন্ টন্ করে না রোশেনা ?"

—"করে বৈকি দিদি, রোজ রাতে মেয়েটির কান্না যেন এখনও স্পষ্ট শুনতে পাই !"

—"আর স্বামী ? স্বামীর কণ্ঠ শুনতে পাও না ? স্বামীর হাসি আর কথা মনে পড়ে মন টন্ টন্ করে না ?"

—"নাঃ স্বামীর জন্যে আর মন টন্ টন্ করে না দিদি।"

—"সে কি ! স্বামীকে তোমার মন চাইতো না বুঝি ?"

—"হিঁদুর মেয়ের মন স্বামী চায় না ?"

—"তবে যে বলছো স্বামীর জন্যে মন কেমন করে না ?"

—"যে-স্বামী স্ত্রীকে বিধর্মীর লালসা থেকে রক্ষা করতে পারে না অথচ বিধর্মীর অন্ন খেয়েছে বলে স্ত্রীকে বিধর্মীর কারাগারে পরিত্যাগ করে, তার জন্যে মন-কেমন কেন করতে যাবো বলো !"

—"কি করে জানলে সে তোমায় ত্যাগ করেছে ?"

—"সংবাদ নিয়েছি। তাই তো এই অন্ধকারকে আপন বলে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছি। নইলে এই কীটানল ছেড়ে কবেই তো যাবার পথ খুঁজে নিয়েছিলাম।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোশেনা।

—"তোমার স্বামী তোমায় ভালোবাসতো না মনোমোহিনী ?"

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোশেনা উত্তর দেয়—"তখন বাসতো বৈ কি ? ভালো করে জ্ঞান ফোটবার আগে বিয়ে হয়েছিল। শুদের গাঁয়ে তখন মেয়ে ছিল না, ভিন গাঁ থেকে আমায় এনেছিল। তাই শাশুড়ী দেখতে পারতো না আমায়। যত পারতো কাজ করাতো আর হাঁড়ির তলার পোড়া ভাত খাওয়াতো। রুক্ষ মাথায় তেল দিতো না। আমার স্বামী রাতে তেল চুরি করে ঘাটে যাবার পথে ভাঁড়ে করে তেল নিয়ে বেতের ঝোপের আড়ালে রেখে আসতো। নিজে ভাত খেয়ে, কাক খাওয়াবে, মাছ খাওয়াবে বলে বড় করে ভাতের দলা মেখে মাছ ঢেকে কলার পাতায় করে বেত ঝোপে রেখে এসে আমায় চোখ-ইশারায় জানিয়ে যেতো।" কথার শেষে ব্যথিত কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে রোশেনার।

—"তবে ? নিশ্চয় আজও তোমার স্বামী তোমায় ভালোবাসে মনোমোহিনী, শুধু সমাজের লাঠির ভয়ে হয়তো বুকের মধ্যে সে ভালোবাসার টুঁটি চেপে ধরে রেখেছে।"

—"থাক দিদি, ও সব কথা। নাও, তোমার অঙ্গুরীয়। মালেক কুলিশ খান পাঠিয়েছেন।" বহুমূল্য মণিখচিত অঙ্গুরীয় এগিয়ে ধরে রোশেনা।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না অবন্তীমালা। পালঙ্কে এসে পা ঝুলিয়ে বসে তাকিয়ায় গাল রাখে।

অঙ্গুরীয় তুলে এবার চোখের কাছে এগিয়ে ধরে রোশেনা। "নাও দিদি, তোমার অঙ্গুরীয়। জনাব কুলিশের ভেট।"

—"জনাব কুলিশ, সুলতান মুঘীয-উদ্-দীন্-এর সুলতানাকে অঙ্গুরীয় ভেট পাঠান কোন সাহসে ! কোন স্পর্ধায় রোশেনা ?"

অবন্তীমালার চোখে ঝক্‌ঝকে ছুরীর ঝলক্ ! কণ্ঠে সম্রাজ্ঞীর গাম্ভীর্য ! উপেক্ষা-ভরে সুবঙ্কিম হাসে রোশেনা ! বলে,—"সুলতান মুঘীষ-এর অন্দরে এমন উপঢৌকন সকলের জন্যই নিয়ত আসে সুলতানা। নইলে…"

—"নইলে কি ?"

—"কি নিয়ে থাকবে এই উপেক্ষিতার দল ?"

—"কিন্তু, কুলিশের উপঢৌকন অন্দরে নিয়ে এল কে ? তুমি ?"

—"আমিও অন্দর-নিবাসিনী সুলতানা। আজও উপঢৌকন বহন করি না। তবে বাইরের উপঢৌকন অন্দরে বহন করবার বিশ্বস্ত লোকও আছে প্রাসাদে। নইলে প্রত্যহ অন্দর-বাহিরে লেন-দেন চলে কেমন করে ?"

—"কিন্তু তুমিই তো নিয়ে এলে রোশেনা ?"

—"শুধু তোমার চোখ থেকে উপঢৌকন-বাহিনীকে আড়ালে রাখতে সাহায্য করেছি।"

ভ্রূভঙ্গি করে হাসে অবন্তীমালা।—"ও, তা ঐ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠা বলে উপঢৌকন দিলাম রোশেনা। ওটি মিতুই নাও।"

—"এ অঙ্গুরীয়ে কুলিশের নাম অঙ্কিত আছে। কুলিশ আজ স্থলতানের পার্শ্বচর। ওটা হেলায় ত্যাগ করো না দিদি। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে লাগতে পারে। হাজার হোক তুমি আমার বাঙলা গাঁয়ের মেয়ে, আমি তোমার শুভ চাই। আমার অনুরোধ, এটা তুমি রাখো।"

অঙ্গুরীয় হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অবন্তীমালা। তাই তো? সত্যিই তো? কখন কোন সামান্য জিনিষও অসামান্য পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়! কুলঙ্গির কোটরে ফেলে রাখে অঙ্গুরীয়।

কুর্ণিশ করে বিদায়ের আগে বলে রোশেনা,—"তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, রূপও আছে, ইচ্ছে থাকলে আবার মুক্ত আকাশ দেখতেও পার।" তারপর মুখ টিপে হেসে চলে যায়।

অবন্তীমালা ঠিক বুঝতে পারে না এই রোশেনাকে—কখনো মনে হয় মমতায় কোমল, কখনো বা ঈর্ষায় কুটিল। তবু এ-প্রাসাদের সর্পিল বেষ্টন থেকে তাকে সর্বদা সতর্ক রাখে রোশেনাই।

অলিন্দে গিয়ে আবার দাঁড়াল অবন্তীমালা। জাফরিতে চোখ রেখে আকাশ দেখতে চেষ্টা করে। চোখে পড়ে ঝিক্‌ঝিকে চাঁদের আলোর সামান্য চোখ-ইশারা। নাঃ, কখনো কি আর দেখা যাবে মুক্ত আকাশের অসীম জ্যোৎস্না-প্লাবন? কিন্তু অসম্ভবই বা কি? ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অবন্তীমালার। তব্রোল-এর কড়া পাহারার যে ছিদ্র দিয়ে এসেছে কুলিশের মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, সেই ছিদ্র দিয়েই হয়তো দেখা দিতে পারে আবার সেই মুক্ত আকাশের পথ! আর সেই একখানি মুখ! কিন্তু···মনোমোহিনীর মতোই যদি পরিত্যক্ত হয় ম্লেচ্ছপুরবাসিনী বলে! কিন্তু···না···সে সম্ভব নয়। বজ্র সাক্ষী আছে যে! কিন্তু তবু—। আশা-নিরাশায় কেঁপে ওঠে মন। অদৃষ্ট! অ-দৃষ্ট যা, তা তো দেখবার নয়। জ্যোতিষার্ণব বলেছিলেন, রাজরাণী হবে সে। হ্যাঁ তাতো সত্যিই ফলেছে। রাজরাণীই তো হতে চলেছে অবন্তীমালা। নিত্যি রাজভোগই তো আসে। অবন্তীমালার উপেক্ষায় অপেক্ষা করে আরো কত ভোগ!

শয়নকক্ষের পালঙ্কে অর্ধনিদ্রিতা অবন্তী হঠাৎ চমকে উঠে বসলো। বাইরে তাকিয়ে অনুমান করলো রাত প্রায় ভোর হয়ে এল! রঙদার বেলোয়ারি কেয়ারি সেজের স্ফটিক দীপে তেল প্রায় নিঃশেষিত। রুপোর কারাবা থেকে কেয়াচূর্ণ জল মাথায় মুখে দিয়ে আবার এসে পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসলো অবন্তী। রাত্রি শেষ হলেই এ যন্ত্রণার অবসান! আবার নিদ্রায় জড়িয়ে আসে চোখ। হঠাৎ হোশ্‌দারের ডাকে সম্বিৎ ফিরে এল—'হুকুমদার, হুঁশিয়ার, স্থলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ ওয়া-স্-সালাতীন আবুল ফতে তব্রোল।' সর্বনাশ! তব্রোল এখানে! এতদিন সময়

হয়নি তাঁর। কিন্তু আজ! আজ কি আর শেষ রক্ষা হবে! মনে পড়ে আবার বাঘের সঙ্গে খেলতে হবে! চমকে উঠলো সারা বুক। উঠে দাঁড়িয়ে বেশবাস ঠিক করে আরশিতে মুখ দেখলো। চোখের সুরমা মোটা হয়েছিল ঘুমের আবেশে। ক্ষিপ্রহাতে সুরমা মুছে সরু করে, দেমাক-ই-সুরত গালে ঘষে এসে পালঙ্কে বসলো। দ্বিতীয়বার হাঁক পাড়ে হোশদার! মস্ মস্ ঝন্ ঝন্ শব্দের দৃপ্ত পদক্ষেপ শ্রুত হলো! হোশদারের তৃতীয় হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন তভ্রোল! সুরার আবেশে চোখ ঈষৎ রক্তাভ। পরিপাটি-হীন বেশবাস। মুখে উদ্বেগ ও পরিশ্রান্তির রেখা সুস্পষ্ট। পালঙ্ক থেকে নেমে তিনবার আভূমি নত হয়ে বিনীত কুর্ণিশ জানালো অবন্তীমালা।

—"রাত্রি কাবার হয়ে গেল। ভেবেছিলাম, আজ মৃত্যুপথে যাত্রার পূর্বে তোমার চিত্তবিনোদন করে, তোমার সুখনীড়ের সঞ্চয় কিছু নিয়ে যাবো। কিন্তু অবকাশ আর মিললো না।"

দ্বিতীয়বার কুর্ণিশ করলে অবন্তীমালা।—"এত ব্যস্ততার মধ্যেও বাঁদী স্মরণে আছে জেনে ধন্য হলো।"

—"কী জানি, হয়তো অভিমান করে আছ, কিন্তু বিশ্বাস কর প্রত্যহ প্রতিক্ষণে তোমার মুখ মনে পড়ছে। কিন্তু মনের সে-সম্রাজ্ঞীর চরণে হাজিরা দেবার অবকাশ মেলেনি।" বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন তভ্রোল।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে অবন্তীমালা বলে,—"জাহাঁপনা কি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়েছেন ?"

হতাশায় ঝুলে পড়ল তভ্রোল-এর আগ্রহ-প্রসারিত বাহু।—"ও, হ্যাঁ, না, বিস্মৃত হইনি। কিন্তু বহু রাত্রির প্রতীক্ষিত মনকে আর শাসন করতে পারছি না। মৃত্যুর মুখে চলেছি জেনে, আজ সামান্য হলেও কিছু প্রসাদ দাও।" দু'হাতে অঞ্জলি পাতেন সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্।—"আজ উদ্দাম হয়ে উঠেছে বুকের রক্ত। একটু প্রেম, একটু ভালোবাসা, একটু শুভকামনা নিয়ে কেউ ছায়া হয়ে চলুক আমার পাশে পাশে এই মৃত্যুর ডাকে। কে আছে আমার যে মৃত্যুর পথে নির্ভয় দেখাবে ? মনে পড়লো বিশ্বাস-ভরা তোমার চোখের চাউনি, তাই ছুটে এলাম সহস্র কাজ ফেলে।" ব্যগ্র মিনতি-ভরা কণ্ঠে পুনর্বার এগিয়ে এলেন তভ্রোল—"চল, তুমি চল প্রেয়সী, আমার ছায়া হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনবে চল।"

দুরু দুরু বুকে শুষ্ককণ্ঠের রুদ্ধ পিণ্ড গিলে অবন্তীমালা জিজ্ঞাসা করলে—"কিন্তু···সুলতানা···সুলতানার কাছে বিদায় নিয়ে এসেছেন কি ?"

ব্যঙ্গ হেসে তভ্রোল বললেন—"পারস্য রমণীরা স্বামীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে শেখে না সুন্দরী। মায়া দিয়ে স্বামীর কায়া রক্ষার মন্ত্র তাদের জানা নেই। তাদের হৃদয় অধিকার-ভোগের আর এক যুদ্ধক্ষেত্র। না, এ যুদ্ধ-যাত্রায় সুলতানা আর্জিনার সঙ্গে সাক্ষাতের আর অবকাশ মিললো না।"

—"কিন্তু সে কি উচিত হলো? তাঁর প্রাপ্য সম্মান…"

—"প্রাপ্য? প্রাপ্য খোদার দান, মানুষ উপলক্ষ মাত্র। আজ এই-ই হয়তো তাঁর দান।"

ব্যথিত হাসির রেখা তব্রোল-এর ঠোঁটে। অবন্তীমালার মনে গভীর রেখা কেটে গেল সে হাসির করুণতা।

করুণকণ্ঠে বলেন তব্রোল,—"সুলতানের প্রাণের চেয়ে তাঁর সিংহাসনই সুলতানার কাছে চিরদিন বেশি মূল্যবান। কিন্তু তুমি? তুমি আজ তোমার ঐ গণ্ডি-বাঁধা সিংহাসন পরিত্যাগ করে এসে মৃত্যু জয় করবার মতো আমায় কী দেবে প্রেয়সী?"

দেয়ালের কুলঙ্গি থেকে অবন্তীমালা নিয়ে এল ক'টি ফুল।—"এই নিন জাহাঁপনা বাঁদীর শুভ প্রার্থনার প্রসাদ। ঈশ্বর আপনাকে বিজয়ী করুন।"

সাগ্রহে অঞ্জলি পেতে ফুল কয়টি গ্রহণ করলেন তব্রোল। আবার দু'পা পিছিয়ে অঞ্জলিবিস্তৃত করে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে ফুল কয়টি দেখে ভীতমুখে বলেন, —"কিন্তু এ…কাফেরের প্রসাদ!"

—"ঈশ্বরের প্রসাদ জাহাঁপনা। ঈশ্বর জাহাঁপনার দরবার আর বাঁদীর দরবার সম-আগ্রহে শোনেন। মঙ্গল কামনার কোনো জাত নেই।"

ফুল ক'টি সাগ্রহে বুকে চেপে ধরলেন তব্রোল।—"ঠিক! ঠিক বলেছ প্রেয়সী। ঈশ্বরের প্রসাদের জাত নেই। তোমার চশমাশাহী-চোখের মতোই তোমার হৃদয় নির্মল!" কিংখাপের মেরজাইয়ের জেব খুলে সযত্নে ফুল ক'টি রাখলেন।—"এই-ই আমায় রক্ষা করবে, নিশ্চয়ই রক্ষা করবে। কিন্তু বিদায়ের পূর্বে, মৃত্যুপথযাত্রীকে আর কি কিছু দেবার নেই তোমার? শুধু শুভ-ইচ্ছার ফুল দিয়েই কি বিদায় করবে সখি?"

—"যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসুন জাহাঁপনা, বাঁদী আপনার জন্য জয়মাল্য হাতে প্রতীক্ষা করবে।"

—"কিন্তু আজ এই অনিশ্চিত জীবনের বিদায়ের ক্ষণে, আমি যে তোমাকে ফেলে যেতে পারছি না সুদূর প্রতীক্ষার ভরসায়, ছেড়ে যেতে পারছি না তোমার সিতারায়ে মশ্‌রিক-এর মতো চোখ, তোমার মহ্‌তাব-ছাওয়া আশমানের মতো হৃদয়? চল,.প্রেয়সী তুমিও যুদ্ধে চল। রোজ যুদ্ধ-শেষে মহ্‌তাব দেখে ফিরবো তোমার মঙ্গল আশ্রয়ে, প্রভাতে আবার তোমার পদ্মহাতে ঈশ্বরের প্রসাদ নিয়ে, নব বল নব উদ্যমে যুদ্ধ করবো।"

নতজানু হয়ে অঞ্জলি পাতেন সুলতান।—"চল প্রেয়সী তুমি তোমার নির্ভয় মঙ্গল হাতে আমার হাত ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে পথ দেখাবে।"

বল সঞ্চয় করে স্বকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল অবন্তীমালা।—"তা হয় না জাহাঁপনা, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেয়সীর মুখ বল দেয় না। বল ক্ষয় করে। বাঁদী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে সুলতানের মন করুণায় দুর্বল হবে। মন বিভক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয়

হবে। মৃত্যুজয়ের পণ দুর্বল মন নিয়ে হয় না সুলতান। এক লক্ষ্য, এক মন হওয়া চাই।"

সৈন্য প্রস্তুতির দুন্দুভি বেজে উঠলো। অলক্ষ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবন্তীমালা। বলে—"উষার আলো দেখা দিয়েছে সুলতান, সৈন্য প্রস্তুত, নিঃশঙ্ক মনে যুদ্ধযাত্রা করুন।"

—"প্রভাত হয়ে গেল! তাই তো। বলবনকে আমি নিজেই ডেকেছি, মরণকে ডেকে এনে আর রোধ করা যায় না। যেতে হবে, যেতেই হবে। আচ্ছা, বিদায়। তুমি অপেক্ষা করো, রাত্রে সুখের উপাধানে মাথা রেখে এ হতভাগ্যকে একবার স্মরণ করো।...আর...তোমার ঈশ্বরের কাছে এ দুর্ভাগার জীবন ভিক্ষা করো।" বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন তঘ্রোল।—"বিদায় দাও প্রেয়সী, বিদায়।"

দ্রুত পিছিয়ে দু'হাত তোলে অবন্তীমালা।—"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনাকে বিজয়ী করুন জাহাঁপনা।"

হতাশার ভারে অবসন্ন ব্যগ্র বাহু আবার ঝুলে পড়ে। দ্বার পর্যন্ত গিয়ে মুখ ফিরিয়ে মলিন হেসে বলেন তঘ্রোল,—"আচ্ছা, তাহলে বিদায়। যদি ফিরি দেখা হবে।" ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে বিষাদ ছড়িয়ে চলে গেলেন তঘ্রোল।

পালঙ্ক ধরে কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে গালিচায় বসে পড়লো অবন্তীমালা। তঘ্রোল-এর করুণ কণ্ঠস্বর বদ্ধ ঘরে করুণতর হয়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

এক হাতে লাগাম, অপর হাতে অশ্ব-মুখের চাপরাস ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রুদ্রতাপ। প্রাসাদের সম্মুখের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে প্রসন্ন অনুগ্রহে রুদ্রতাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে হেসে বলেন তঘ্রোল,—"ভারী বুদ্ধিমান তুমি! আজ থেকে আমার দেহরক্ষীর পদ তোমার। চলো, আমার সঙ্গে। এই নাও অঙ্গুরীয়।" আপন অঙ্গুলি থেকে বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয় খুলে রুদ্রতাপের হাতে দিয়ে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে জীনের রেকাবে পা রাখলেন তঘ্রোল।

সুলতানের দান গ্রহণ করে কুর্ণিশ করলে রুদ্রতাপ—"বান্দা ধন্য হলো। সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্-এর জয় হোক। ঈশ্বর বাঙলার সিংহাসন শত্রু-মুক্ত করুন।"

রুদ্রতাপের সৌভাগ্য, কুটিল কটাক্ষে দেখলেন তঘ্রোল-এর পার্শ্বস্থিত অশ্বারূঢ় কুলিশ। কদমে কদমে গতি বাড়ে অশ্বের, দুর্গতোরণ পার হবার পূর্বে একবার চকিতে চেয়ে দেখলে রুদ্রতাপ অদৃশ্য প্রায় প্রাসাদ-অলিন্দ। চোখ ফেরাতেই লক্ষ্য করে, তঘ্রোল-এর দৃষ্টিও প্রাসাদ-অলিন্দে নিবদ্ধ। মনে ভাবে রুদ্রতাপ, দুর্ধর্ষ তঘ্রোলকেও তাহলে প্রাসাদের মোহ পিছু ডাকে!

পরিখা পার হয়ে সৈন্যের সারি দেখে প্রসন্ন হলেন তব্রোল। কুলিশের প্রতি চেয়ে অনুগ্রহ-স্মিত মুখে বলেন—"এবারও তোমার সৈন্য সংগ্রহ উত্তম। যুদ্ধজয়ের পর তোমার পুত্র ইক্তাদারের প্রতিশ্রুতি রইল।"

ভাগীরথীর তীরবর্তী রাজপথ বেয়ে সবৎসা গাভী নিয়ে হাটে চলেছে গোপালিকারা। সৈন্যের বহর ও বাদ্যে ভীত হয়ে গাভী ও বৎস বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করছে। সন্ত্রস্তা গোপালিনীরা ভয়ে উন্মত্তের মতো ছুটে সংযত করতে চেষ্টা করে বিভ্রান্ত গাভীযূথ। হঠাৎ তব্রোল-এর বেগবান অশ্বের সম্মুখে এসে পড়ে একটি বিভ্রান্ত বৎস। বাধা পেয়ে অশ্ব সম্মুখের দু'পা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, মুহূর্তে অশ্ব সংযত করেন তব্রোল। তারপর সম্মুখের বৎসকে বর্শায় বিদ্ধ করে ভাগীরথীর স্রোতে নিক্ষেপ করে অট্টহাসিতে শান্ত আকাশ অশান্ত করে অশ্ব ছুটিয়ে দেন। বৎসের যন্ত্রণা-কাতর হাম্বা-রব মিশে যায় উদ্বিগ্না জননীর হাম্বা-রবে, আর গোপালিকাদের হৃদয়ের হাহাকার কণ্ঠ পর্যন্ত এসে ভয়ে ফিরে গিয়ে বুকের পঞ্জরে পঞ্জরে আঘাত করে গুমরে মরতে থাকে।

ফুরসি-বরদারণী রুপোর ফুরসি পালঙ্কের পাশে রক্ষিত শিশুকাঠের কারুখচিত ফুরসি-চৌকিতে রাখে। পালঙ্কে অর্ধশায়িতা অবন্তীমালা মুখ ফিরিয়ে দেখে বিরক্ত মুখে বলে,—"প্রত্যহ ওটা বার বার সাজিয়ে আনিস কেন ফতেমা? জানিস তো ওটা আমি খাই না।"

ঠোঁট টিপে হাসে বাঁদী,—"দেখতে দেখতেই খাবে সুলতানা, গন্ধ নাকে যেতে যেতেই ঠোঁটে আদর পাবে।"

—"না, ও গন্ধ আমার ভালো লাগে না।"

—"না লাগলে, প্রাসাদের এই দিন-রাত্রির অলসতা কি দিয়ে কাটাবে সুলতানা? তাই তো প্রাসাদে এসে সুলতানা, বাঁদী, সকলকেই সময় কাটাবার ওষুধ ধরতে হয়।" মুখ টিপে একটু হেসে লঘু পায়ে মল বাজিয়ে চলে গেল ফতেমা।

সত্যি, এই একস্রোতা অলসতায় দিনগুলো যেন ছেদহীন অনন্ত মনে হয়। হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা রুপোর ফুরসির সোনার নল একবার ঠোঁটে স্পর্শ করে নামিয়ে রাখে। নাঃ, এটা আর অভ্যাস করে কাজ নেই। শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত-চোখে দেয়ালের বড় আরশির কাছে দাঁড়িয়ে মসলিনের ওড়নাখানি গুছিয়ে মুখের 'পরে টেনে দিয়ে সকৌতুকে বলে,—"সত্যি, কেমন লাগবে তার চোখে এ রূপ? চিনতে পারবে কি সে সেই ঝড়ের মুখে চুল উড়িয়ে মলিন ডুরে-শাড়ির আঁচলে চেপে-ধরা আমকুড়োনী অবন্তীমালাকে, এই সযত্ন-রচিত সুলতানা-রূপে? পড়বে কি মনে এই সুরমা-আঁকা চোখ দেখে গাঁয়ের কাজল চোখের সজলতাকে?" মনে পড়ে যায়—একদিন 'কুল সংগ্রহকারিণী

অবন্তীমালাকে একলা পেয়ে রুদ্রতাপ বসন্ত-রাগে গেয়ে উঠেছিল কবিরাজ চন্দ্র চন্দ্রের গীত—

"ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালঙ্কুরা।
দোর্বল্লীষু শলাটুকেনিলকলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ।
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবভিবর্ণস্নিগ্ধ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যনাগরবধূবর্গস্ত বেশগ্রহঃ।।"

এই রূপ আর সেই রূপ! নিজের মনেই হেসে ওঠে অবন্তীমালা। হাসির ঝঙ্কার রিন্‌রিন্‌ শব্দে শিহরণ জাগায় আরশি-আঁটা শিশমহলের দেয়ালে দেয়ালে।

ঘরে ঢোকে রোশেনা।—"কি দিদি, একাই যে হেসে খুন? যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান হয়তো এখন শ্রান্ত, সে কথা মনে করে একটু সমবেদনার বিষণ্ণতা পর্যন্ত নেই!" মুখ টিপে হাসে রোশেনা। তার আয়ত-চোখে কৌতুকের আভাষ।

স্মিতমুখে এগিয়ে আসে অবন্তীমালা।—"এস রোশেনা, তা মন বিষণ্ণ হচ্ছে বৈ কি? আহা বেচারী সুলতান, বাইরে থেকে লোকে ভাবে নিষ্ঠুর দুর্ধর্ষ, কিন্তু ভেতরে ওঁরও একটা মমতাকাঙ্ক্ষী প্রাণ আছে।"

ভ্রূভঙ্গীতে হাসি ঝরে রোশেনার।—"শেষ পর্যন্ত সুলতানের প্রেমে পড়েছো বলো?"

অন্যমনে অবন্তীমালা উত্তর দেয়,—"প্রেম? না, তবে হাঁ, মন একটু কেমন করে বৈকি, মমতা হয় ওঁর অন্তরের নির্জনতা অনুভব করে, দুঃখ হয় উচ্চাভিলাষীদের ভুলের আগুনে জীবন-আহুতি দেখে। আকুল হয় মন, উচ্চাশার আগ্নেয়গিরিতে উঠে মরণ-কুণ্ডে পা দিয়ে যখন জীবনকে ফিরে পাবার জন্য এরা হাহা করে কেঁদে ওঠে।"

অন্যমনে অলিন্দের দিকে চেয়ে বিষণ্ণমুখে বলে রোশেনা,—"কাঁদে বৈকি দিদি, মরণ নিমন্ত্রিত হয়ে এলেও ভয়, আর অনিমন্ত্রিত এলেও ভয়। মরণকে কাছে দেখলে সকলেরই বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাই তো মনকে অনেক সাধনায় প্রস্তুত করেও মরণের চরণ স্পর্শ করতে গিয়ে অজানা অন্ধকার গহ্বরের ভয়ে ফিরে আসি।"

—"মরবে কেন রোশেনা? নিশ্চিত মরণকে ঠেকিয়ে রাখাই তো জীবন!"

—"হুঁ, কিন্তু এ-জীবনকে সহ্য করাও তো সহজ নয়?"

—"তাতো নয়ই। কিন্তু সহিষ্ণুতার কাছে পরাজয় স্বীকারই তো মানুষের প্রকৃত লজ্জা।" তারপর পালঙ্কে বসে তাকিয়া কোলে টেনে নিয়ে অবন্তী জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা এবার বল তো রোশেনা আমার কুন্মীর সংবাদ কি?"

মলিনমুখে রোশেনা উত্তর দেয়—"সংবাদ ভালো নয় দিদি। তুমি আসবার পরই জগদীশ শর্মা দেহ রেখেছেন।"

আচম্বিতে নড়ে ওঠে অবন্তীমালা, বুক শ্বাস-রুদ্ধ বোধ হয়। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করে—"দেহ রেখেছেন জগদীশ শর্মা! আর তাঁর পুত্রবধূ?"

—"পিতৃগৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। গত বৎসর লোকাভাবে কৃষি হয়নি। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে, মহামারীতে গ্রামবাসী অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করেছেন। অনেকে গ্রামান্তরে বা নগরে গিয়েছেন অন্ন-চেষ্টায়। গ্রামে কৃষি নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। সামান্য কয়জন অক্ষম নিরুপায় বৃদ্ধ, স্ত্রী কন্যা বধূ নিয়ে কুশীগ্রামে প্রদীপ জ্বালছেন মাত্র।"

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অবন্তীমালা। তারপর সজল-চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করে—"আ-র ব্রহ্মতাপ ভট্ট? তাঁর পরিবার ও পুত্র?"

—"ব্রহ্মতাপের একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ! আর ব্রহ্মতাপ পুত্র-শোকে মৃতপ্রায়!"

—"ব্রহ্মতাপের পুত্র নিরুদ্দেশ! কেন?"

—"নিরুদ্দেশের কি কেন থাকে দিদি? হয়তো অন্নাভাবে পিতৃ পরিবারের দুঃখে, কিম্বা নিজের উচ্চাভিলাষ পরিপূরণের জন্য ভাগ্যের অন্বেষণে। অথবা···প্রে···প্রেয়সী সন্ধানে?" কৌতুক কটাক্ষে মৃদু হাসে রোশেনা।

অবন্তীমালা বুকের ঝড় সংযত করতে ব্যস্ত, লক্ষ্য করে না রোশেনার কৌতুক কটাক্ষ। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে যেন অবন্তীমালার বাইরের পৃথিবী! রোশেনা চুপ করে থেকে যেন অনুভব করে অবন্তীমালার অন্তরের ঝড়ের বেগ। মনে পড়ে তার বুকেও একদিন উঠেছিল প্রবল ঝড়! আজ তা শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্ত হয়ে এসেছে আর তার বুকের এদিক ওদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শুধু পড়ে রয়েছে রক্তে-লেখা ক'টা শুকনো পাতা।

নিস্তব্ধ অবন্তীমালার রক্তহীন শাদা মুখে আবার দেখা দেয় রঙ-এর আবেশ। অবোধ্য কণ্ঠে উচ্চারণ করে—আমার সন্ধানে বেরিয়েছ তুমি! পিতার পরম স্নেহাশ্রয় ছেড়ে কি অবন্তীমালা উদ্ধারে তুমি নিরুদ্দেশ! তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোশেনাকে বলে—"তুমি আমার জন্য অনেক করেছ দিদি, তাই তোমার কাছে আরো ভরসা রাখি। এ কারান্ধকার থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পার?"

রোশেনা অবন্তীমালার মুখ নিরীক্ষণ করে তীর্যক কটাক্ষ হেনে বলে, —"পারি না! কিন্তু এ কারান্ধকার থেকে মুক্তি পেলেই যে বাইরের মুক্ত আকাশ তোমায় গ্রহণ করবে তার নিশ্চয়তা আছে কি?"

—"সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তুমি শুধু এই পথটুকু উত্তীর্ণ করে দাও! তুমি ইচ্ছে করলে সব পারো।"

—"অতো শীগ্‌গীর নিশ্চিত হয়ো না অবন্তী। নিজের একান্ত বিশ্বাসী অন্তরও ভুল বুঝে জন্মগত বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্থির হয়ে

ভাবলেই বুঝবে, অচেনা আলেয়ার অনিশ্চিত আলোর চেয়ে নিশ্চিত অন্ধকার নির্ভরযোগ্য।"

—"আমার আলোর রূপ আমি চিনি ভাই, তুমি শুধু এই অন্ধকার পথটুকু আলো দেখিয়ে পার করে দাও।" ব্যাকুলতায় পালঙ্ক থেকে নেমে রোশেনাকে জড়িয়ে ধরে অবন্তীমালা।—"মুক্তির পথ দেখিয়ে তুমি আমার জীবন কিনে রাখো রোশেনা। কি ভাবে তুমি মুক্তির সন্ধান আনো? কোন পথে দেখেছিলে তুমি তোমার মুক্তির পথ?"

কুটিলতর হাসে রোশেনা।—"এ পথ অপরে দেখাতে পারে না, নিজে দেখে নিতে হয়। তোমার রূপ আছে, বুদ্ধিও আছে। রূপের ঝলকে বুদ্ধির ধার দিয়ে তব্রোল-এর প্রাসাদনিগড় কাটা কঠিন নয়। শিশমহল পরিত্যাগের ইচ্ছা যদি তোমার প্রকৃত হয়, রাত্রের অন্ধকারে রূপের আলো দিয়ে পথ খুঁজলেই পথ দেখতে পাবে। সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে প্রাসাদে এখন অবাধ উৎসব চলেছে। সুরামত্ত দ্বারীরা অসতর্ক।"

রোশেনার ঈর্ষা-ভরা উত্তেজিত রক্তাভ মুখের পানে চেয়ে অস্পষ্ট হাসি দেখা দেয় অবন্তীমালার ঠোঁটে। বলে,—"আচ্ছা, এখন একটু বিশ্রাম করগে ভাই, আমি ভেবে দেখি।"

—"ভাবো, ভালো করে ভাবো। নিজের দশা ভালো করে ভাবলে মৃত্যুর কাছে মুক্তি চাইতেও ভয় করবে। মৃত্যুর পরিণাম জাহান্নম? না নরক?" তির্যক কটাক্ষে অগ্নি ঝরিয়ে হেসে কুর্ণিশ করে চলে যায় রোশেনা!

রোশেনার নির্গমনের দিকে চেয়ে পালঙ্কে গা এলিয়ে দেয় অবন্তীমালা। হ্যাঁ, শুভ-কামনারও তো সীমা আছে। রোশেনা হয়তো অবন্তীমালার শুভ চায়, কিন্তু তাই বলে সে অবন্তীমালার আগের জীবনে ফিরে যাওয়া সইবে কেমন করে?

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করে মামুদা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করে অবন্তীমালা।

বিনীত কুর্ণিশ করে আগন্তুকা বলে—"আমি সুলতানার পার্শ্বচরী মামুদা।"

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে মামুদা অবন্তীমালাকে দেখে। এত রূপ! তাহলে গুজব মিথ্যা নয়!

ফুলের রেকাব থেকে একটি গন্ধ চামেলী তুলে নিয়ে গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করে অবন্তীমালা—"কি প্রয়োজন?"

—"সুলতানা আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষ করেছেন। আমার সঙ্গে আসুন।"

নিবিষ্ট হয়ে একটি একটি করে ফুলদল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অবন্তীমালা জবাব দেয়,—"সুলতানাকে আমার সহৃদয় ভালোবাসা দিয়ে সম্মান জানিয়ো, আর বলো সময় ও সুযোগ এলে অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। এখন আমি অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। সুলতানার অভিলাষ পুরণে অক্ষম।"

বিকৃত হাসি হাসে মামুদা।—"কিন্তু সুলতানার অভিলাষের অর্থই আদেশ, সে কথা আশা করি আপনি বুঝেছেন?"

—"বুঝেছি বৈ কি। সুলতানার আদেশ পালন করবার অবসর থাকলে সুখী হতাম। কিন্তু বলেছি তো, এ সময়ে সে আদেশ পালনের আমার অবসরের অভাব।"

গ্রীবা বেঁকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে হেসে মামুদা বলে—"কিন্তু সুলতানার আদেশ অমান্যের ফল জানবার অবসরও হয়তো আপনার ইতিপূর্বে হয়নি, তাই তার পরিণামও আপনার জানা নেই।"

অবজ্ঞার হাসি হেসে অবন্তীমালা বলে—"সত্যিই তা জানা নেই, কিন্তু জানবার জন্য কোন আগ্রহও অনুভব করছি না সুলতানার সখি!"

—"সুন্দরী! তোমার রূপ আছে, কিন্তু তুমি বুদ্ধিহীনা। সুলতানের প্রাসাদ বুদ্ধিহীনাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী।"

—"নিজের বুদ্ধিতে সকলেরই বিশ্বাস থাকে, আমারও আছে। মানুষের জীবনটা যখন স্থায়ী নয়, তখন অনাগত অস্থায়ী অবস্থার জন্যই বা চিন্তা কেন? শিশমহলের অধিকার চিরস্থায়ী মনে করবার মতো আমার অল্প বুদ্ধির জন্য সুলতানাকে দুশ্চিন্তার অসুস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ থাকতে বলো।"

কুটিলতর হয় মামুদার ভ্রূভঙ্গি—"তুমি শুধু বুদ্ধিহীনাই নও, দাম্ভিকাও বটে!"

সুবঙ্কিম হেসে অবন্তীমালা উত্তর দেয়—"দম্ভ নয়, অভিমান। রূপের যদি অভিমানই না থাকে, সে রূপ ঝুঁটো মোতির মতোই নিষ্প্রভ।"

—"হুঁ।" তীক্ষ্ণ অনায়ত চোখে ব্যর্থ ক্রোধ ঝরে মামুদার।

গন্ধচামেলীর দল শেষ হয়েছে, এবার অবহেলায় মখমলের তাকিয়ার রেশমী ঝালর খুঁটে, নত-চোখে সুতো বার করে অবন্তীমালা। রক্তাভ সুগঠিত নাসা মাঝে মাঝে সামান্য কম্পিত হচ্ছে উত্তেজনায়।

ঠোঁটে দাঁত চেপে কঠিনকণ্ঠে বলে মামুদা—"সুলতানা তোমায় কেন ডেকেছেন জানো কি সুন্দরি?"

উত্তর দূরে থাক, চোখ পর্যন্ত তোলে না অবন্তীমালা। ঝালরের সুতো খুঁটে যেন বহু বাঞ্ছিত মণি মিলবে এমনই তার ভাবখানা।

মনে মনে জ্বলে ওঠে মামুদা। এত অহঙ্কার! এ অহঙ্কার ভস্ম করে ওর রূপের ছাই ওড়াতেই হবে—এই মামুদার পণ। তাই মুখের হাসিতে বুকের জ্বালা ঢেকে মামুদা বলে—"তিনি তোমাকে এই প্রাসাদ-কারা থেকে মুক্তি দিতে চান।"

তবুও চোখ তোলে না অবন্তী। শেষ সন্ধানী-বাণ ত্যাগ করে মামুদা—"তুমি গাঁয়ের পাখী, গাঁয়ের মুক্ত আকাশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আনন্দ কর, এই শুভ-কামনা নিয়েই তোমাকে ডেকেছেন সুলতানা। সুলতান অনুপস্থিত, সে-সৌভাগ্য গ্রহণের এই তো সুবর্ণ-সুযোগ!"

এতক্ষণে মুখ তুলে ভ্রূভঙ্গি করে হাসে অবন্তীমালা—"সুলতানার অনুগ্রহ ও শুভ-কামনার জন্য তাঁকে আমার সম্মান দিয়ে জানিয়ো—শিশমহল-অধীশ্বরীর পক্ষে রঙীন কেয়ারি-সেজে আলোকিত প্রাসাদ আজও অন্ধকার কারাগৃহ বলে মনে হয়নি। তেমন দুর্ভাগ্য যদি সত্যই শিশমহল-অধীশ্বরীর রূপের রোশনিকে অন্ধকার করে, সেদিন আর্জিনার শুভ-ইচ্ছা স্মরণ করবো। তা ছাড়া আমি সুলতান মুঘীষের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে না ফেরা পর্যন্ত এই শিশমহলের সুখের উপাধানে মাথা রেখে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করবো। প্রতিজ্ঞাচ্যুতি হিন্দুরমণীর পক্ষে অধর্ম।"

—"ধর্ম! সুলতানের প্রসাদে হিন্দুরমণীদের সকল ধর্মই কবরের মাটিতে চাপা পড়ে। কিন্তু সুলতান মুঘীষ যদি সুলতান বলবন-এর বিপুল সৈন্যের করালদন্ত থেকে নিস্তার না পান? তোমার সুন্দর মুখ দেখবার সুযোগ যদি আর সুলতান মুঘীষের অদৃষ্টে না ঘটে?"

আয়ত-চোখে শাণিত ছুরীর ঝলক খেলে যায় অবন্তীমালার। দু'পা পিছিয়ে যায় বিস্মিত মামুদা।

—"তা হলে? তাহলে সুলতানা আর্জিনার ভাগ্য তাঁকে চিন্তা করতে বলো। সুলতানা অবন্তীমালা তখন বাঙলার সুলতানার তক্‌ত্‌-এর পরিবর্তে দিল্লীর সুলতানার তক্‌ত্‌-এ পা বাড়াবে।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় মামুদা। চোখের অগ্নি তীক্ষ্ণতর করে দাঁতে দাঁত রেখে বলে—"বুঝেছি। কিন্তু অতি লোভের শাস্তি হয়তো তোমার জানা নেই। জানা নেই হয়তো এই শিশমহলের রঙীন আলো সুলতানের এক রাত্রির খেলা। সে-খেলা মিটলে এক রাত্রের বিবিজানকে অপর রাত্রের বিবিজানের বাঁদী হতে হয়? যেমন হতে হয়েছে আজ তোমার বাঁদী রোশেনাকে।"

পালঙ্ক থেকে নেমে দৃপ্ত-ভঙ্গিতে দাঁড়ায় অবন্তীমালা।

—"সুলতানাকে জানিও মামুদা, বাঙলায় এমন মেয়েও আছে, যে তুরস্ক-রমণীর কৃপা-ভিক্ষা চায় না। বরং অবিশ্বাসী আর্জিনার নিয়ত সিংহাসন-চ্যুতির ভয়কে সে করুণা করে।"

দাঁতের কড়কড় শব্দ স্পষ্টতর করে পায়ের গুর্জরী-পঞ্চমের ধ্বনি সপ্তমে চড়িয়ে বলে যায় মামুদা—"কাফেরাণী! তোর জাহান্নম বেশি দূরে নয়।"

মামুদার গতিপথের দিকে চেয়ে ক্রূর ব্যঙ্গ হাসি হাসে অবন্তীমালা। বলে—"বাঙলার মেয়ে জলের স্রোতে খেলে, তাতে ভেসে যায় না। বিদ্যুতের ঝলকে অনন্ত প্রাণ পায়, মরে না।"

উত্তেজনায় শ্রান্ত-দেহ পালঙ্কে এলিয়ে দেয় অবন্তীমালা। তাম্রবর্ণা মামুদার ক্রূর মুখের ভঙ্গি যেন গভীর দাগ কেটে গিয়েছে মনের পটে, বার বার মুছতে চাইলেও মোছে না, ওর দীর্ঘাঙ্গের অসহিষ্ণু ঝঙ্কার কৃষ্ণ ছায়া হয়ে ঘোরে মনের চারিপাশে বনের অন্ধকারের মতো।

রোশনি-বরদারণীর হুঁশিয়ারি ঝমরুদাঁড়ের ঘুঙুরের শব্দে চোখ খোলে অবন্তীমালা। ভোরের মোরগ ডেকে ডেকে কখন ক্লান্ত হয়েছে কানে যায়নি। ঘণ্টা-ঘরের প্রহরধ্বনিও কানে আসেনি। এই জন্মই সুউচ্চে লম্বিত কেয়ারি-বেলোয়ারি-সেজের গেলাশ-প্রদীপ নেবাবার দীর্ঘ দণ্ডটির নিচে বাঁধা থাকে কয়েকটি কাংস্য ঘুঙুর। সুলতানাদের নিদ্রা ডেকে ভাঙানো অনুমোদিত পন্থা নয়। যাঁরা মোরগের ডাকের পর ঘণ্টা-ঘরের সতর্কীকরণেও চোখ না খোলেন, প্রায়ান্ধকার সুলতানা-মহলে তাঁদের সূর্যোদয় সংবাদ জানিয়ে যায় এই ঝমরুদাঁড। ঝমরুদাঁড়ের মন্দ-মন্দ কাংস্য বাদ্যটি মধুর লাগে অবন্তীমালার কানে। প্রতি প্রভাতে চোখ বুজে শোনে এই বাদ্যটি। শিশমহলের কোণে কোণে লম্বিত কেয়ারি-সেজ-গেলাশের প্রদীপে প্রদীপে নেচে নেচে ঝমরুদাঁড় যেন লোকনাথের মন্দিরের ভৈরব রাগে দেবদাসীর নৃত্যের তাল মনে করিয়ে দেয়। থেমে গিয়েছে ঘুঙুরের শব্দ। চলে গিয়েছে রোশনি-বরদারণী। চোখ খুলে দেখে, দাঁড়িয়ে আছে হামিদা। হাতে সোনার থালায় কুমকুম, অভ্রচূর্ণ, রক্তফাগ, চন্দন হরিদ্রাচূর্ণ, কস্তুরীমদ, কেতকীরেণু, পদ্মরেণু থরে থরে সাজানো। দেখে মনে পড়ে—ওঃ, আজ এদের হোলাক উৎসব।

মামুদার সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে মনটা এমনই চঞ্চল হয়ে আছে যে কিছুই আর মনে পড়েনি। ঝুলা-মজলিসের একফালি আকাশে যে ক্ষণিক চাঁদের মুখ শুক্লপক্ষ জানিয়ে যায়, তাও দেখেনি আজ ক'দিন। মুদিত চোখে ফুটে ওঠে কুশীগ্রামের দোল-উৎসব। কতলোক এসেছে লোকনাথের নাটমন্দিরে দেবদাসীর নৃত্য দেখতে! লোকনাথের অঙ্গ ঢেকে ঝল্‌মল্‌ করছে বিনাসূতায় গাঁথা পলাশের মালার রক্ত রঙ! লোকনাথের প্রতীক বসেন দোলায়। দোলায় বসে ঠাকুর ফাগে আবৃত হন। দেবদাসীর নৃত্য শেষে অন্ত্যজ পাড়া থেকে আসে ডোম ডোমনী চণ্ডালরা। বছরে এই একটি দিন ঠাকুরের জাত নেই। অসঙ্কোচে স্পর্শ করতে পারে সবাই। দোলের পর বারুণী স্নান করে ঠাকুর আবার জাত নিয়ে মন্দিরে ওঠেন। ডোম ডোমনীরা পাটকাঠিতে আগুন নিয়ে বসন্ত আগ-নৃত্য করে চর্যা গীত গেয়ে। উন্মত্ত নৃত্য করতে করতে ডোম ডোমনীদের 'পরে লোকনাথের 'ভর' হয়। লোকনাথের ভর হলে কত যে অসাধ্য সাধন করে ওরা! আগুন খায়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে ফেলে, নিরুদ্দেশের সংবাদ বলে, এমন আরো কত কি!

হামিদার হাতের কঙ্কনের ধ্বনিতে আবার সম্বিৎ ফিরে আসে অবন্তীমালার।

চেয়ে দেখে দু'হাতে থালা ধরে আরও নিকটে এসে কুর্ণিশের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে হামিদা-বাঁদী।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে অন্যমনা অবন্তীমালা জিজ্ঞাসা করে—"কিসের উৎসব যেন বললি?"

—"প্রাসাদে আজ হোলাক্ উৎসব। ওঠ, হাম্মাম প্রস্তুত। স্নান সেরে, নববস্ত্র পরে, তিলক-সজ্জা করে যেতে হবে বড় সুলতানার রঙমহলে।"

—"কেন? বড় সুলতানার রঙমহলে কেন?"

—"এবার বড় সুলতানার তাই হুকুম হয়েছে যে? প্রতিবার হোলাক্-এ সুলতান উপস্থিত থাকেন। সুলতান উৎসব করেন সুলতানাদের নিয়ে সুলতানের অন্দর রঙমহলের অশোককুঞ্জের পর্দা বাগিচায়। এবার সুলতান অনুপস্থিত, বড় সুলতানা গত দু'বছর বাত রোগে ভুগেছেন। সেজন্য সুলতানের রঙমহলে এসে উৎসবে যোগ দিতে পারেননি। এবার মালেক্ হাকিম মামুদ গজর আলীর দাওয়াইয়ে কিছু সুস্থ আছেন সুলতানা, তাই হুকুম দিয়েছেন উৎসব হবে তাঁর মহলে।"

—"উৎসবে আর কে কে উপস্থিত থাকবেন?"

—"কে আর থাকবে, সুলতানা। দিনের আলোয় সুলতানারা ছাড়া আর কেউই থাকবে না।" ঠোঁটের হাসি আড়াল করবার জন্যই হয়তো ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন দেখে হামিদা।—"সুলতানারা অনেকেই যাবেন হয়তো। সুলতান অনুপস্থিত কাজেই বড় সুলতানার হুকুম বরবাদ করবার সাহস তো সকলের নেই।"

অলসতায় গা মুড়ে আবার শুয়ে পড়ে অবন্তীমালা।—"যাঃ, সুলতানাদের ঈর্ষার মুখে কে আর যাবে বসন্ত রঙ ছড়াতে?"

—"কি আর করবে সুলতানা? আহা! হোলাক্-এর দিন সুলতান কখনো রঙমহল ছেড়ে থাকেননি। কত নাচ গান উৎসব হয়, তিন রাত তিন দিন ধরে উৎসব করেন সুলতান আট কুড়ি সুলতানা নিয়ে। সে বার যুদ্ধে বিক্রমপুর গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছিলেন ঠিক হোলাক্-এর আগের দিন সুলতানা মরিয়মকে নিয়ে, সঙ্গে আরো কত হাতী বাঁদী জওহরত! সুলতানারা সবাই গা ভরে নতুন জওহরত পেয়েছিলেন। এবার তোমার ভাগ্য মন্দ সুলতানা, প্রাসাদের সবাই তো তাই বলাবলি করছে।"

—"কি বলাবলি করছে? নতুন সুলতানার ভাগ্য মন্দ, না?"

—"না তা নয়, তবে কিনা সুলতান নেই, উৎসব তেমন জমবে না: তাই বলাবলি করছে। তা এখনও তুমি উঠলে না সুলতানা?"

—"না, সুলতান নেই তার আবার উৎসব কি? সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রান্ত, এখন কি সুলতানাদের উৎসব সাজে?"

—"ঠিকই বলেছ সুলতানা। কিন্তু প্রাসাদে থেকে থেকে সুলতানাদের আর সুলতানের জন্যে ঠিক তেমন মায়া থাকে না তো?" রুদ্ধ হয়ে যায় হামিদার কণ্ঠ। কিছুক্ষণ থেমে বলে—"কিন্তু বড় সুলতানার হুকুম, না মানাটা ঠিক হবে কি? বরং মনের কথা চেপে যাওয়াই ভালো সুলতানা।"

—"তুই এখন যা হামিদা, আমার শরীর ভালো নেই, মনও ভালো নয়,

উৎসব আমার এখন সইবে না। তা ছাড়া মেয়েতে মেয়েতে রঙ ঢালাঢালি করলেই কি হোলাক্ উৎসব হয়? সুলতানের অনুপস্থিতিতে আবার বসন্ত কিসের?"

—"তাতো ঠিকই সুলতানা, কিন্তু অপর সুলতানারা যখন এ-উৎসব মেনে নিয়েছেন, তখন তোমার না যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে?"

—"বেশ দেখাবে। কি করব? শরীরের ওপর তো আর জোরজুলুম চলে না। তুই যা হামিদা। হাম্মাম তুলে ফেল, আজ আমি স্নান করবো না।"

বিরসমুখে দাঁড়িয়ে থাকে হামিদা।

—"আমায় একটু বিশ্রাম করতে দে হামিদা, আর দাঁড়িয়ে থেকে মন আমার অশান্ত করিস না।"

—"কিন্তু এই কুম্‌কুম্‌সাজ?"

—"ওসব নিয়ে যা তুই, সোনার থালাও আমি দিলাম তোকে। আজ সারাদিন তোর ছুটি। তোর জানের সঙ্গে অশোককুঞ্জে হোলি করগে।"

সজল করুণ চোখে কুর্ণিশ করে চলে যায় হামিদা। পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়ে আর একবার কুশীগ্রামের দোল উৎসব নিখুঁত করে মনের পটে আঁকতে চেষ্টা করে অবন্তীমালা।

—'গীতগোবিন্দ গান হবে লোকনাথের নাটমন্দিরে সন্ধ্যা-সমাগমে।'— এতক্ষণ হয়তো রামাই ঢুলি ঢেড্‌ড়া দিয়ে এই কথা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়! কি···ন্তু সে-গান শুনবে কে? গ্রামে কে আছে আর? ·····না! মন অসাড় করে ভাবনা পর্যন্ত থেমে গিয়েছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের মোরগ ডেকে ডেকে ক্ষান্ত হলো, ঘণ্টা-ঘরের ঘণ্টাও গেল থেমে, কিন্তু ঘুম নেই অবন্তীমালার চোখে! এ দৈত্যপুরীর শৈত্য মনকে অসাড় করে রাখে, কিন্তু আশ্চর্য চোখের পাতা এতো শ্রান্ত হয়েও বিশ্রাম নিতে চায় না। পালঙ্ক থেকে উঠে এসে শামাদানের পলিতা বাড়িয়ে দিয়ে দেয়ালগিরির আলোটাও উজ্জ্বলতর করে আরশির সামনে এসে দাঁড়ালো অবন্তীমালা। প্রাসাদে তখনও চলেছে হোলাক্ উৎসব। একটানা সারেঙ্গীর সুরের সঙ্গে সুরামত্ত হাসি মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আর সেই সঙ্গে জড়িতকণ্ঠের ভাঙা তালে গানের রেশের সঙ্গে স্খলিত পায়ের নৃত্যের তাল-কাটা নূপুরধ্বনি। আরশির কাছের সেজটা জেলে দেয় অবন্তীমালা। আরশিতে মুখ দেখে হেসে ওঠে, মুখে কালি পড়েছে যেন! চূর্ণ চুল সরিয়ে দেয় কপালের ওপর থেকে, চুলেও বোধ হয় পাক ধরলো রাত্রির পর রাত্রির এই অধৈর্য প্রতীক্ষায়! আর কি চিনতে পারবে রাজপুত্র? চোখের ভিজে সুর্মা রুমালে মুছে নতুন সুর্মা আঁকে। ঘুরিয়ে দেখে লবঙ্গলতিকার গুচ্ছে সযত্নে বাঁধা কবরী। জিজ্ঞাসা করে আরশির অবন্তীমালাকে—'কার জন্য নিত্য এ বাসকসজ্জা?

স্বপ্নে যে আসে নিত্য, সে কি আর আসবে সত্য সত্য ?' আলোর মুখে পোকা দেখে হঠাৎ টিক টিক শব্দ করে ওঠে একটা টিকটিকি। টিকটিকির দিকে উজ্জ্বল মুখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে অবন্তীমালা—'কিন্তু কবে ? অনেকদিন থেকেই তো তোমার আশ্বাস শুনে শুনে নিঃশ্বাস ফেলছি।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পালঙ্কে এসে বসে আঙুলের পর্ব গোণে। অনেক দিন, অনেক দিন চলে গেল যে? কোথায় সন্ধানে বেরিয়েছ রাজপুত্র? এ দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যা উদ্ধার কি এতই অসাধ্য? কিন্তু···রাজকন্যা? রাজকন্যা কেন রাজপুত্রকে এই কারাপথের সংবাদ দেয় না? খুঁজে নেয় না কেন নিরুদ্দেশ উদাসী রাজপুত্রকে? কিন্তু···শিশমহলের দ্বার উত্তীর্ণ হতে অবন্তীমালারও ভয় করে। কে জানে, বড় সুলতানা কোথায় কি জাল পেতে রেখেছেন! অসাবধানতায় সে জালে পা পড়লে কার পেটে গিয়ে প্রবেশ করবে কে জানে? হঠাৎ বদ্ধ দরজার কাছে মনে হলো কার যেন ভারী পদশব্দ! চমকে ওঠে অবন্তীমালা। এত রাত্রে আবার কে এল? মৃদু ঘা পড়ে দরজায়! দ্বারের কাছে গিয়ে দুরু দুরু বুকে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, কোনো শক্তিমানের ঘন দীর্ঘশ্বাস! মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবার। না, ভয় কিসের? এ নিশাচর প্রাসাদে বন্দিনী হয়ে ভয়কে জয় না করলে গৌরব নিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। দরজায় আবার আঘাতের মৃদু শব্দ হয়। সাহসে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে কম্পিত হাতে অর্গল খুলে নিজের অজানিতেই বিস্ময়ে দ্রুত পিছিয়ে আসে অবন্তীমালা—"মালেক কুলিশ খান! এত রাত্রে আপনি!"

অদ্ভুত হাসি হেসে চাপা জড়িতকণ্ঠে বলেন সুরাবিবশ কুলিশ—"এত রাত্রে উজ্জ্বল দীপ জ্বেলে তবে কি স্বয়ং সুলতানের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলে? কবরীতে ফুল বেঁধে কার আশায় ক্ষণ গুনছিলে? ভাবছিলে কি যে, দুর্ধর্ষ তন্ত্রোলও তোমার চুম্বক নয়নের আকর্ষণে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ছুটে আসতে পারেন?"

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি অবন্তীমালার। নির্বাক হয়ে চেয়ে দেখে কুলিশের সুরা-উত্তেজিত তৈল-স্বেদ-সিক্ত ঈষৎ রক্তাভ মুখ আর সুরার আবেশে নিস্তেজ রক্তবর্ণ চোখ।

পালঙ্কে বসে তাকিয়া টেনে গা এলিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কুলিশ উচ্চারণ করেন—"আঃ, কতদিন পাইনি এ সুখের শয্যা!"

তারপর অবন্তীমালার দিকে চেয়ে করুণকণ্ঠে বলেন—"থাকতে পারলাম না আর যুদ্ধক্ষেত্রে। আকাশে হোলাক্-এর চাঁদের ঢল্ঢলে মুখ দেখে তোমার মুখের ছবি মনে অস্থির দোলা দিতে লাগল। প্রাণের মায়া বেড়ে উঠলো। তোমার জন্যে হঠাৎ করে পালিয়ে এলাম।"

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে আসে অবন্তীর, দুরু দুরু বক্ষে আড়ষ্টতা অনুভব করে। এই গভীর রাত্রে প্রাসাদের এই নির্জন কক্ষে যদি সুরামত্ত কুলিশ খুন করে

রেখে যায়! মনে মনে হেসে ওঠে অবন্তী—খুন! সে কুলিশ কেন? এই শত্রুঘেরা কারাকক্ষে খুন যে-কেউ করতে পারে, যে-কোন মুহূর্তে! এই মুহূর্তে দ্বার খোলা মাত্র অতি অনায়াসে কুলিশের পরিবর্তে প্রবেশ করতে পারতো কৃপাণ হাতে স্থলতানার অনুচর!

দেহ উন্নত করে গ্রীবা হেলিয়ে এবার স্বকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়ালো অবন্তীমালা। জিজ্ঞাসা করে—"পালিয়ে এলেন এ বাঁদীকে স্মরণ করে, না প্রাণের ভয়ে?"

অস্ত্র ঝনৎকার করে উঠে দাঁড়ায় কুলিশ—"প্রাণ-ভয়! যুদ্ধে প্রাণভয়ের সাক্ষাৎ পায়নি কখনো কুলিশ খান! ভয়ের পরিচয় জানে না। পালিয়ে এলাম শুধু তোমার মুখের মায়ায়, মালা। তুমি জানো না মালা।" উত্তেজনায় এগিয়ে আসেন কুলিশ।—"কি করে কেটেছে আমার গত ছয় মাসের দিবারাত্রি। তুমি হয়তো বুঝবে না আমার অন্তরের এই সাহারার অগ্নিজ্বালা! এ জ্বালা সয়ে আর থাকতে না পেরে তব্রোল-এর অনুপস্থিতির স্থযোগ বুঝে তোমার চুম্বক নয়নের আকর্ষণে এত রাত্রে ছুটে এলাম এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। চল মালা, আজ বসন্তজ্যোৎস্নার অতন্দ্র চাঁদের মুখ দেখতে দেখতে দু'জনে দু'জনের হাত ধরে সৌভাগ্যের গান গেয়ে স্থখের ঠিকানায় চলে যাই। চলে যাই এস এ পাপ রাজ্য ছেড়ে। বেগবান অশ্ব প্রস্তুত করে রেখে এসেছি, সূর্যোদয়ের পূর্বেই দশ ক্রোশ পর্যন্ত চলে যেতে পারবো।"

নির্বাক অবন্তীমালা কুলিশের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বার বার—হ্যাঁ, যুদ্ধসাজ এখনও রয়েছে কুলিশের অঙ্গে! যুদ্ধ-চর্মপাদুকা ধারণ করে আছে মৃতদেহ দলিত রক্তচিহ্ন! যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই পালিয়ে এসেছেন কুলিশ।

—"নাও প্রস্তুত হয়ে নাও মালা। আর দেরী করলে হয়তো বেশি দেরী হয়ে যাবে।"

অবন্তীমালার বুক বার বার কেঁপে ওঠে কুলিশের মালা সম্বোধনে। মা যে বড় আদর করে তাকে ঐ নামেই ডাকতেন। কিন্তু আজ রাত্রে দুর্বলতা আশ্রয় করলে নিশ্চিত মরণ! সাবলীল দেহ দুলিয়ে কুর্নিশ করে অবন্তীমালা। বলে—"খোদাবন্দের কত অনুগ্রহ এ বাঁদীর 'পরে সে তো বাঁদীর অজানা নয়, কিন্তু—"...

—"কিন্তু কি মালা?"

—"এ বাঁদীর শত্রু আছে প্রাসাদের আনাচে-কানাচে। এত রাত্রে একলা পলায়নে বিপদ অনেক।"

—"একেলা নয় মালা, তুমি একেলা নও। একেলা কুলিশ খান প্রয়োজন হলে সহস্র রক্ষীর যোগ্যতা দেখাতে পারে। তা ছাড়া স্থলতানের অনুপস্থিতির স্থযোগে দুর্গের প্রহরীরা আজ উগ্রতম নিষ্ঠায় বসন্ত উৎসব পালনে মত্ত। তাদের স্থরাবিহ্বল চোখ যথেষ্ট সতর্ক নয়। আর উৎকোচ দানে দুনিয়া বশীভূত করা যায়, প্রাসাদ প্রহরীরা তো তুচ্ছ।"

—"মালেক কুলিশের যোগ্যতায় এবং প্রাসাদরক্ষীদের অযোগ্যতায় এ বাঁদীর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু…"

—"আবার কিন্তু কেন ?"

—"এত রাত্রে খোদাবন্দের সঙ্গে পলায়নে এ বাঁদীর যে দুর্নাম রটবে সেও তো তার মৃত্যুতুল্য।"

—"এক নারীর মায়ায় ভুলে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে এসেছে তগ্রোল-বাহিনীর অন্যতম বিশ্বস্ত হাবিলদার কুলিশ খান! কুলিশের পক্ষে সেও তো মৃত্যু, মালা। কিন্তু হোক মৃত্যু কুলিশ খান-এর, হোক মৃত্যু অবন্তীমালার, আমরা দু'জন ভিক্ষু ভিক্ষুণী হয়ে অজানা দরিয়ার কিনারে নীড় বাঁধবো। গড়বো দু'জনে প্রেমের অসীম স্বর্গ। সে-স্বর্গে তুমি গাঁথবে গীত—আমি দেব সুর—।"

ভ্রূভঙ্গি করে হেসে কুর্ণিশ করে অবন্তীমালা।—"জনাবের অনুগ্রহের সীমা এ বাঁদীর কল্পনারও অতীত। কিন্তু…"

বহু চেষ্টাকৃত সংযম আর বহুদিনের ধৈর্য এই মুহূর্তে বুঝি ভেঙে খান খান হয়ে পড়তে চায়—তবু সংযত কণ্ঠে বলেন কুলিশ—"এখনও কিন্তু ?"

—"বাঙলার স্বাধীন সুলতান দুর্ধর্ষ মুঘীষ-উদ্-দীন্ এ সংবাদ পেলে মালেকের জীবন বিপন্ন হবে নাকি ?"

—"যুদ্ধক্ষেত্র যখন পরিত্যাগ করে এসেছি তখনই তগ্রোল-এর ক্রোধাগ্নিতে জীবন বিপন্ন করেছি সুন্দরী।"

কুলিশের স্বরের উষ্ণতাটুকু অনুভব করেও সহজকণ্ঠেই মৃদু হেসে বলে অবন্তীমালা—"তাই তো ভাবছি, এরপর যুদ্ধ জয় করে ফিরে সুলতান যখন জানবেন তাঁর প্রণয়িণী অপহৃতা তখন অপহরণকারীর মুণ্ডের জন্য তিনি ভারতের অরণ্য পর্বতের সর্বত্র পাতি পাতি করে অনুসন্ধান করবেন না কি ? সাম্রাজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়েও প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি মানুষের হিংসা আরো নির্মম, আরো নিষ্ঠুর যে।"

বিকৃত হাসি কুলিশের ঠোঁটে—"মুঘীষ-এর প্রণয়িণী!" ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে কুলিশ প্রশ্ন করে—"আ-র তোমার সেই ধ্যানের আশৈশবের স্বামী! তিনিও কি ভেসে গিয়েছেন মুঘীষ-এর বিলাস-প্রণয় স্রোতে! ভেবেছিলাম তুমি খোদার পার্শ্বচরী, ফারিস্তা! কিন্তু দেখছি তুমিও তুচ্ছ জগতের তুচ্ছতম এক নারী মাত্র!"

—"নারীকে বিলাসের দৃষ্টিতে টেনে নামালে নারী জাহান্নমের দূতীই বনে যায় খোদাবন্দ্। নারীকে খোদার পাশে স্থান দেয় শুধু পুরুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি।"

বেদনাহত মুখে কুলিশ উত্তর দেয়—"হ্যাঁ, কুলিশ তোমাকে দেবীত্বই দিয়েছিল অবন্তীমালা। কিন্তু তগ্রোল-এর ভোগ-লালসাপূর্ণ সমারোহের মোহ তোমাকে কেবল তুচ্ছ বিলাসের সঙ্গিনী করে তুলেছে।"

বিনীত কুর্ণিশ করে অবন্তীমালা—"সত্য বলেছেন জনাব।"

—"কিন্তু বিলাস কি প্রেমের চেয়েও মধুর অবন্তীমালা? মুঘীষ-এর এমন কি ঐশ্বর্য আছে যা তোমায় মুগ্ধ করেছে? জিজ্ঞাসা করি, কি আছে বিগতযৌবন তম্রোল-এর?" আবেগ সংযত করতেই হয়তো পালঙ্কে বসে পড়েন কুলিশ।

ঈষৎ বঙ্কিম হয় অবন্তীমালা। ভ্রূ, ঠোঁটে খেলে যায় হাসির ঝলক। বলে—"মন, মন তো কারো অধীন নয় খোদাবন্দ্! অবন্তীমালার মতো সহস্র নারী উপেক্ষিতা হয়েও আপনারই পদপ্রান্তে প্রতীক্ষা করছে, তবু কি পেয়েছেন আপনি অবন্তীমালার রূপে যা মানুষী অবন্তীমালাকে আপনার দৃষ্টি দেবীর আসনে বসিয়েছে?"

—"সত্যি মালা, জানি না এ কোন নিষ্ঠুর মায়া—কিংবা মোহ? আজ তম্রোল-এর প্রণয়িণীকে তুচ্ছ মানুষী জেনেও ঘৃণা করতে পারছি না, বিসর্জন দিতে পারছি না নিজের মনে-গড়া দেবী-প্রতিমাকে! আশ্চর্য! মিথ্যা জেনেও তুচ্ছ করা যায় না তোমার সর্বাঙ্গে আঁকা দেবীত্বের মোহাবরণ!" পালঙ্ক ছেড়ে দীনতায় এগিয়ে আসেন কুলিশ—"না মালা, তোমায় ঘৃণা করেও পরিত্যাগ করতে পারবো না। পারবো না আমার হৃদয়-প্রতিমাকে মুঘীষ-এর বিলাসের স্রোতে বিসর্জন দিতে।"

সশঙ্কিত চিত্তে পায়ে পায়ে পিছু হটে অবন্তীমালা। লক্ষ্য করে থেমে যান ক্ষুব্ধ কুলিশ। অভিমানাহত কণ্ঠে বলেন—"তুমিই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে মালা তোমার হৃদয়-সিংহাসন? তুমিই না প্রাণ ভরে নিয়েছিলে আমার হৃদয়-সঙ্গীত?"

গ্রীবা হেলিয়ে মৃদু হাসির ঢেউ খেলিয়ে বলে অবন্তীমালা—"তখন দ্বন্দ্ব ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর প্রতাপশালী জায়গীরদার মালেক কুলিশ খান-এর মধ্যে। বাঙলার স্বাধীন সুলতান, দিল্লীর তক্ত্-প্রয়াসী মুঘীষ তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি।"

তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে কুলিশের ঘৃণা-ক্ষুব্ধ চোখ, দাঁতে দাঁত রেখে ভ্রূকুটি করে উচ্চারণ করেন—"তুমি এত সামান্যা!"

—"সামান্যা ব্রাহ্মণ-কন্যা, মালেক কুলিশের চেয়ে অসামান্য নয় খোদাবন্দ্। পুরুষের বিলাস নারীর রূপ, নারীর বিলাস পুরুষের বৈভব।"

—"উঃ! তোমার কুটিল হৃদয় আর উন্মুক্ত করো না নারী! আরও জাহান্নমে নেমে দাঁড়িও না।"

—"স্বর্গের আর এক নাম স্বপ্ন খোদাবন্দ্। সে-স্বর্গের স্থায়িত্ব ক্ষণিক। কিন্তু অমর হয় মানুষ শুধু এই মাটির জাগ্রত জগতে। আর এই মাটির মানুষের চোখেই চেনা যায় আত্মপ্রতিবিম্ব। আজ বাঙলার সিংহাসন যদি মুঘীষ-এর পরিবর্তে মালেক কুলিশকে আবাহন জানায় এ বাঁদীর জীবনের বিনিময়ে!

সেই মুহূর্তে এই নির্জন কক্ষে, পুরুষের অভ্যাসিত প্রথায় নারীকে স্তোক দিয়ে হয়তো বলবেন, সে সিংহাসন এ বাঁদীর জন্য আপনি উপলখণ্ডের মতো পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু বাস্তব হয়ে সে-স্বপ্ন-সিংহাসন পদতলে এলে, আপনার স্বপ্নে-গড়া এ বাঁদীর বরণীয় দেবীত্ব স্বপ্নেই বিলীন হয়ে যাবে জনাব। বাস্তব রাজমর্যাদার অহঙ্কার স্বপ্নের দেবীকে আচ্ছন্ন করে তখন জাহান্নমের অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে।”

—“তুমি জান না মালা, তোমার জন্য সামান্য হলেও আমার যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ করে ভিক্ষান্নে জীবন যাপনে আমি প্রস্তুত।”

কিঙ্কিণীর শব্দ ছড়িয়ে অবন্তীমালা হেসে জবাব দেয়—“আজ এই জ্যোৎস্না রাত্রে যে স্বপ্ন দেখছেন, ভিক্ষাপাত্র হাতে দ্বারে দ্বারে অবহেলিত হয়ে শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যেদিন বাস্তব জঠর জ্বালায় পীড়িত বোধ করবেন, সেদিন নিষ্ঠুর দিনের আলোয় এ-স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে। অবন্তীমালার দেবী-নয়ন তখন অন্নকাতরা ভিখারিণীর নয়ন বলেই মনে হবে।”

—“না না, তুমি জান না নিষ্ঠুরা, আজ জ্যোৎস্নালোকিত সারাপথ কি সঙ্কল্প নিয়ে ছুটে এসেছি! এই গভীর রাত্রের নির্জন পথ হাওয়ার বেগে অনায়াসে অতিক্রম করে এনেছে তোমার শুভ-দৃষ্টি লাভের আকর্ষণ। সারাপথ দেখেছি—আমি আর তুমি—যেন দুই ভিক্ষু ভিক্ষুণী প্রেমের আবিলতায় ছোট্ট একটু নীড়ে গড়ে তুলেছে—অনন্ত প্রেমের অসীম সাম্রাজ্য!

আবার ব্যগ্রভরে এগিয়ে আসেন কুলিশ—“তভ্রোল তোমার স্বলতানী বিলাস দিতে পারে, কিন্তু……নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, অসংযমী তভ্রোল কি তোমাকে দিতে পারবে সেই স্বর্গের স্পর্শসম্পদে গড়া অসীম প্রেমের সাম্রাজ্য?”

সস্মিত রক্তিম ঠোঁট শুভ্র দাঁতে চেপে বলে অবন্তীমালা—“সে-স্বর্গ মালেক কুলিশও দিতে পারবেন না!”

—“মুঘীষ-এর মোহ-নরক পরিত্যাগ করলেই কুলিশের হৃদয়-স্বর্গের মহিমার পরিচয় পাবে সুন্দরী।”

—“সাঁচ্চা মোতির পাশে ঝুঁটো মোতি রাখলে সাঁচ্চার জলুস চেনা অবশ্যই সহজ হয়। কিন্তু দুই-ই যখন ঝুঁটো, তখন জলুসের তারতম্য বিচার করি কি করে আর তার প্রয়োজনই বা কি? কাফের-কন্যা অবন্তীমালার পক্ষে মালেক কুলিশ এবং স্বলতান মুঘীষ, দুই-ই বেহেস্তের খোদাতাল্লাহর পয়গম্বর। কারো হৃদয়ের অন্দরমহলেই কাফের-কন্যার প্রবেশ সম্ভব নয়। রঙমহলেই যখন আসন তখন মালিক কুলিশের রঙমহলের চেয়ে স্বলতান মুঘীষ-এর রঙমহলে জলুসে বাহাল থাকার সম্মান নিশ্চয়ই অধিক।”

—“তুমি ভুল বুঝেছো সুন্দরী। তভ্রোল তোমাকে রঙমহলে বাঁদীর আসন দিলেও, কুলিশ তোমাকে তার হৃদয় সিংহাসনেই বসাবে।”

—“হয়তো জনাবের এ অনুগ্রহ সত্য, কিন্তু তার প্রমাণ আজও পায়নি

বাঁদী। সুলতান তাঁর প্রেমের চোখে এ বাঁদীর শুভ-কামনা ঈশ্বরের প্রসাদরূপে গ্রহণ করে কাফেরাণীর পুজার ফুল বুকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর চোখে আজ আর এ বাঁদী কাফেরাণী নয়, মঙ্গলদায়িনী দেবী।"

স্থির হয়ে চেয়ে দেখেন কুলিশ। চোখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর শাণিত দৃষ্টি।

—"সুন্দরী, তুমি বাক্‌চাতুর্যে পটীয়সী বটে, কিন্তু প্রকৃতই বুদ্ধিহীনা। মৃত্যু-পথযাত্রী তব্রোল, তোমার বা তোমার ঈশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ করেননি। প্রতারণা করেছেন নিজ অন্তরের মৃত্যুভয়কে। কিন্তু প্রবঞ্চনা দিয়ে শুদ্ধ বালিকার প্রেমকে প্রতারণা করতে চায় না কুলিশ। প্রেমের রাজ্যে বর্ণ, ধর্ম, কুল, মান কিছুই নেই অবন্তীমালা। প্রেম বর্ণহীন নির্মল স্রোতস্বতী। আজ থেকে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। আর যেদিন তোমার ধর্ম দিয়ে তোমায় জয় করতে পারবো সেদিন আমার ধর্ম থেকেও তুমি আর দূরে থাকতে পারবে না মালা।"

লক্ষ্য করে অবন্তীমালা, যুদ্ধবেশী কুলিশের চোখ সজল হয়ে এসেছে, রক্তরাঙা শমনের মতো পা দু'খানি ঈষৎ কম্পিত হচ্ছে।

—"কিন্তু, আর নয় মালা। এস যাই। আমার প্রাণ থাকতে আমার ইষ্টদেবীকে তব্রোল-এর বাঁদী হতে দেবো না আমি। চল মালা, চল যাই।"

কুলিশের সজল চোখ আর বার বার মালা উচ্চারণ, করুণ করে তোলে অবন্তীমালার মন। তবু সংযত হতে হয়। মন শক্ত করে বলে—"কিন্তু জনাব কি ভুলে গিয়েছেন যে একদিন এই তব্রোল-এর বাঁদী হবার জন্যই স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁর হাতে বাঁদীকে সমর্পণ করেছিলেন?"

—"হতভাগা আমি, তাই সেদিন হৃদয়ের হাহাকার শুনেও শুনিনি। বুঝিনি এমন করে সে ক্রন্দনের ভাষা! বুঝলাম, যেদিন তুমি দর্শনের আড়ালে চলে গেলে! তখন থেকেই চিনেছি তোমার নয়নের আকর্ষণ, অনুভব করেছি তোমার কণ্ঠের অপরূপ ঝঙ্কারের স্পন্দন! দীর্ঘ ছয় মাস ধরে পলে পলে বুঝেছি ও নয়নে নয়ন না রাখলে জগতের আলো নিষ্প্রভ! তোমায় না হলে আমার চলবে না মালা, কিছুতেই চলবে না।"

—"কিন্তু···তব্রোল-এর উপস্থিতিতে, এই দীর্ঘ ছয় মাসে আপনার সে নয়ন এ বাঁদীকে নয়নে বেঁধে নিতে আসেনি কেন জনাব? তব্রোল-এর ভয় উত্তীর্ণ হয়ে আপনার অদম্য অবাধ প্রেম কেন এসে সে-দেবীর চরণ চুম্বন করেনি এতদিন? যে নারীকে তব্রোল সৈন্যের তরবারির ঝনৎকারের সঙ্গে সসম্মানে নিয়ে এসেছেন, তাকে তস্করের মতো নীচ গোপন অন্ধকারের আশ্রয় নিয়ে ফিরে পাওয়ায় কোন সম্মান নেই জনাব। চুরির ধন নিয়ে স্বর্গ রচিত হয় না।"

কটিবন্ধ থেকে ঝনৎকারে তরবারি উন্মুক্ত করে উচ্চস্বরে চীৎকার করে

ওঠেন কুলিশ—"সাবধান পিশাচী! বুঝেছি, তোর মন আজ ঐশ্বর্যের মোহে তভ্রোল-এর বাঁদী হয়েও তকৃত্-প্রয়াসী! কিন্তু দেব না আমি তোর সে সাধ পূর্ণ হতে।"

উন্মুক্ত তরবারি হাতে এগিয়ে আসেন কুলিশ, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অবনতমুখী অবন্তীমালা। যাক, নিঃশেষ হয়ে যাক নারী-রূপের ক্লেদ রক্ত! অবন্তীমালার স্কন্ধ স্পর্শ করতে গিয়ে থেমে যায় তরবারি। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে তরবারি কোষে রাখেন কুলিশ।—"না, হত্যা করে নিষ্কৃতি দেবো না তোমায়, তার চেয়েও বড় শাস্তি জগতে আছে। প্রেমিক কুলিশের সাক্ষাৎ হয়তো আর পাবে না, কিন্তু অন্যরূপে আবার সাক্ষাৎ হবে সুনিশ্চিত। আজ আমি চললাম।"

গমনোন্মুখ কুলিশের প্রতি সজল চোখে চেয়ে হাত তুলে রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করে অবন্তীমালা—"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

সজল চোখে ফিরে আসেন কুলিশ।—"এ হতভাগ্যের জন্য তোমার এক ফোঁটা চোখের জল ও একটু শুভ-ইচ্ছা কি এখনও সঞ্চিত আছে অবন্তীমালা?" সন্তর্পণে অবন্তীমালাকে স্পর্শ করতে এগিয়ে যান কুলিশ।

কৌশলে নিচু হয়ে ধীর পায়ে সরে যায় অবন্তীমালা।—"আমায় স্পর্শ করে আমার ব্রত ভঙ্গ করবেন না জনাব।"

আহতমুখে কঠিন হাসেন কুলিশ। প্রশ্ন করেন—"তভ্রোল-এর কাছে তোমার ব্রত রক্ষা হয় তো সুন্দরী?"

—"হয় বৈ কি মালেক, প্রকৃত প্রেম কখনো উচ্ছৃঙ্খল নয়।"

—"নাঃ, তোমার মধুর কণ্ঠস্বরে আর বেশিক্ষণ গরল ঝরতে শুনলে এ তরবারি সংযত রাখা সম্ভব হবে না। আজকের মতো বিদায়। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরবে হয় কুলিশ, না হয় তভ্রোল। একজনকে জয়ের মালা দেবার জন্য প্রস্তুত থেকো সুন্দরী। তভ্রোল-এর শিরের জন্য আজ থেকে কুলিশের খুন কবুল।"

সমস্ত শরীরের দৃপ্ত আন্দোলনে কুলিশের যোদ্ধবেশ ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে। দ্বার পর্যন্ত গিয়ে পুনঃ মুখ ফিরিয়ে বলেন—"আ···র যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুলিশ খান-এর নাম লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে মুঘীষের বিলাস তৃপ্ত হলে পর যেদিন শিশমহল ত্যাগ করে বাঁদীমহলে যেতে বাধ্য হবে, সেদিন স্মরণ করো প্রিয়তম কুলিশের সেই মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। অঙ্গুরীতে জওহর-এর আবরণে জহর আছে।"

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই দৃপ্তপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান দগ্ধহৃদয় বেদনাহত কুলিশ।

অবন্তীমালার উত্তেজনা-শ্রান্ত দেহ রুদ্ধ ক্রন্দনে কম্পিত বিবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে নিকটস্থ মস্‌নদ-পোষে। সখেদে উচ্চারণ করে—হায় ভগবান, কেন সৃষ্টি করেছ এত দুঃখ! এত মোহ!

যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছিলেন কুলিশ। কিন্তু মধ্যপথে সংবাদ পেলেন যুদ্ধে জয়ী হয়ে বলবন-এর বহু সৈন্য নিজ দলভুক্ত করে সাহঙ্কারে ফিরছেন তঘ্রোল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কুলিশের গোপন পলায়নের সংবাদ তঘ্রোল-এর গোচরে এসেছে অনুমান করে, কুলিশের আর বিজয়ী তঘ্রোল-এর সম্মুখীন হওয়ার সাহস হলো না। ভিন্নপথে ঘোড়া ফেরালেন কুলিশ।

কুলিশের অনুমান মিথ্যা নয়। কুলিশের গোপন যাত্রা যথাসময়েই প্রকাশিত হয়েছিল তঘ্রোল-এর কাছে। কুলিশ সন্ধ্যার ছায়ায় গা ঢেকে রাজধানী অভিমুখে বেগবান অশ্ব ছুটিয়েছেন শুনে, সন্দিহান হয়ে যুদ্ধ-শেষে আর বিশ্রামে সময় নষ্ট না করে উদ্বিগ্নচিত্তে লখ্‌নৌতি অভিমুখে যাত্রা করলেন তঘ্রোল।

ওদিকে বলবন সেনাপতি, মালেক তীরখুনী তুর্ক পরাজিত হয়ে উদ্বিগ্নহৃদয়ে অধোমুখে দিল্লী অভিমুখী হলেন। বার বার তঘ্রোল-এর কাছে পরাজিত হয়ে অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বলবন।

তঘ্রোল রাজধানীতে ফিরে কুলিশের সন্ধান না পেয়ে অধিকতর উদ্বিগ্ন হলেন। কুলিশের কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে মনে করে নানাদিকে কুলিশের সন্ধানে গুপ্ত ও প্রকাশ্যে চর পাঠালেন। কুলিশের মুণ্ডের পরিবর্তে দশ সহস্র স্বর্ণ দিনার ঘোষণা করলেন। কুলিশের সৈন্য সংগ্রহ ও রণকৌশলে খুশি হয়ে জাজনগর যুদ্ধের পর তাঁকে যে জায়গীর, হাতী, বাঁদী ও স্বর্ণ পারিতোষিক দিয়েছিলেন, সে-সব পলায়নের অপরাধে তাঁর আপন-সংগৃহীত সম্পদসহ তঘ্রোল-এর খাসে বাজেয়াপ্ত হলো। কুলিশের প্রধানারা যাঁরা তঘ্রোল-এর বৃহত্তর প্রাসাদে স্থান পেলেন, তাঁরা অবশ্য মালেক কুলিশের পরিমিত আয়েশের মায়া কাটিয়ে সুলতানের অপরিমিত আয়েশে গা ভাসাতে বেশি সময় নিলেন না।

যুদ্ধ জয় করে প্রাসাদে ফিরেছেন তঘ্রোল। দ্বিতীয় সন্ধ্যা থেকেই তঘ্রোল-এর আবাহন আশা করে আছে অবন্তীমালা। প্রতীক্ষায় থেকে থেকে কেটে গেল দীর্ঘ দশ রাত্রি, দশ দিন। কিন্তু না এল ডাক, না এলেন তঘ্রোল স্বয়ং। নৃঘীষ-এর অনুপস্থিতি মিথ্যা ছলাকলার থেকে অবন্তীমালাকে নিষ্কৃতি দিলেও অনিচ্ছার এই প্রতীক্ষমান অবস্থা তার আপন অহঙ্কারকে যেন বারবার আহত করে!

ঘরে ঢোকে হাস্যমুখী রোশেনা—"দিদি, আজ সন্ধ্যায় প্রস্তুত থেকো। খবর পেলাম অন্দরের রঙমহলে আসছেন সুলতান। ঝাড়পোঁছ হচ্ছে রঙমহল। বলা যায় না, তোমার ডাকও হয়তো আসতে পারে।"

এই সংবাদের অপেক্ষায়ই তো ছিল অবন্তীমালা। তবু কেন দুরু দুরু করে ওঠে বুক! যুদ্ধশ্রান্ত, বিজয়-অভিমানী তঘ্রোলকে এবার প্রতিরোধ করবে

কোন প্রবঞ্চনা দিয়ে! কিন্তু···আজ কি সত্যি অবন্তীমালার ডাক আসবে? কুলিশের প্রধানাও তো কম সুন্দরী নন! চন্দ্রদ্বীপের কুঁচবরণ কন্যা, মেঘবরণ চুল! আজই হয়তো নবাগতা রূপসীদেরই রূপ বিচার হবে। না আজ অবন্তীমালার ডাক আসবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু না এলেই তো নিষ্কৃতি। অবন্তীমালাকে মনে না পড়লেই তো ভালো। ভুলে গেলেই মঙ্গল, তঘ্রোলের বিস্মৃতিতেই তো তার মুক্তি।

অন্যমনা অবন্তীমালার ঘনশ্বাস লক্ষ্য করে সহানুভূতির স্বরে বলে রোশেনা —"ভয় পাবার কিছু নেই দিদি, সম্ভাবনার কথাই কেবল বলছি, তোমার ডাক যে পড়বেই, এমন নিশ্চিত মনে করবারও কারণ নেই।"

স্তিমিতকণ্ঠে বলে অবন্তীমালা—"না! নিশ্চয় নেই। ডাক না পড়লেই তো বাঁচি। অনেক দিন হলো, হয়তো ভুলেই গিয়েছেন আমার কথা। কি বল?"

—"না, ভুলে হয়তো যাননি, কারণ তোমার ওপর সখ এখনও তো তাঁর মেটেনি? তবে খোদের মর্জি খোদাও নিশ্চিত বলতে পারেন না। অবশ্য কুলিশের গৃহ থেকে নবাগতারা এসেছেন এই যা। তবুও তোমার ডাক পড়বার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে বৈ কি?"

রোশেনার সব কথা যেন কানে যায় না অবন্তীমালার। অন্যমনস্কের মতো উচ্চারণ করে—"সুলতানের আশ্চর্য সাহস, না রোশেনা? বলবন-এর সৈন্য দু' দু'বার প্রতিহত করেছেন! একি সামান্য সাহসের পরিচয়!"

ভ্রূভঙ্গি করে ঠোঁট টিপে হাসে রোশেনা—"তঘ্রোল এখনও সুলতান হয়নি অবন্তীমালা। সুলতান বলবন এখনও তঘ্রোল-এর সুলতানী স্বীকার করে নেননি। ভীত বাঙলা, মুখে মুঘীষকে সুলতান বললেও মনে মনে তাঁকে এখনও সুলতান বলে স্বীকার করে না। স্বীকার করেন না অঙ্গ, পুণ্ড্র, চন্দ্রদ্বীপ ও বিক্রমপুরের হীনবল রাজন্যবর্গ। আর যুদ্ধ জয়? তা সুলতান বলবন কিম্বা সুলতান তঘ্রোলও কেউই করেন না। করে তাঁদের কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রিদের মন্ত্রণা, আর তাঁদের অর্থ ও সৈন্যবল। গত যুদ্ধে শেষ মুহূর্তে নিজ সৈন্যদল নিয়ে অসম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক হিন্দু হাবিলদার, নাম ভাস্কর নাগ। এবারকার যুদ্ধেও শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুলতানের দেহরক্ষী এক বাঙালী ব্রাহ্মণকুমার।"

—"বাঙালী ব্রাহ্মণকুমার? তাঁর নাম?"

নির্বিকার মুখে ঠোঁট উল্টে বলে রোশেনা—"নাম ধাম অত জানিনে। অন্দরে বাঁদীরা বলাবলি করছিল তাই শুনে এলাম। যাক, তুমি এখন মুঘীষ-এর সাহস বীর্য নিয়ে স্বপ্ন বোনো, আমি চলি।"

অযথা ঝঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে যায় রোশেনা। রোশেনার এমন হঠাৎ উত্তেজনায় বিস্মিত হয় অবন্তীমালা। কিন্তু কারণ খোঁজবার মতো তখন তার

মনের অবস্থা নয়। বার বার মনে এসে ধাক্কা দেয় একটি প্রশ্ন—কে? কে সেই অসম সাহসী বাঙালী ব্রাহ্মণকুমার? প্রশ্নের উত্তরে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে মন যুগপৎ উত্তেজিত ও বিমর্ষ হয়।

সত্যই যুদ্ধে শেষরক্ষা করেছিল রুদ্রতাপের জীবনপণ। বিনা দ্বিধায় তরুণ রুদ্রতাপ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মরণের মুখে। যুদ্ধবিলাসী তব্রোল বীরের মর্যাদা দানে কৃপণ নয়। রুদ্রতাপকে ডেকে প্রসন্নচিত্তে বললেন—"কুলিশের অর্ধেক জায়গীর, হাতী, বাঁদী ও স্বর্ণ তোমার।"

নিম্নকণ্ঠে পার্শ্বে উপবিষ্ট উজিরে আজম সামস্-উদ্-দীন্ বললেন—"একটা বাঙালী কাফেরকে এত হঠাৎ করে অতটা তুলে ধরা সঙ্গত হবে না জাহাঁপনা। আরো কিছুদিন বরং নজরে থাক।"

উজিরের উপদেশ যথার্থ মনে করে মত পরিবর্তন করলেন তব্রোল। —"আচ্ছা, এখনকার মতো যুবককে সহস্র দিনার ইনাম দিয়ে ডিভার-ই-শাহ্র মুস্তাফিজ-এর পদে বহাল করো। এক বৎসর বিশ্বাস সামাল রাখলে কুলিশের জায়গীর ব্রাহ্মণ যুবকের।"

আভূমি নত হয়ে বিনীত কুর্নিশ করে পায়ে পায়ে পিছু হটে বিদায় নেয় রুদ্রতাপ।

কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাতে বর্শা কাঁধে দুর্গ প্রাকারের মাথায় উঠে বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্রের ওপারে ঘন বন পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিস্তৃত করে দেয় রুদ্রতাপ। শুধু জোনাকীর আলোর উৎসব এসে চোখে লাগে। চোখ ফিরিয়ে দেখে, সুউচ্চ দুর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়নের জাফরির ফোকরে ফোকরে উজ্জ্বল আলোর খেলা। মনে হয় নব বধূ যেন ঘোমটার আড়াল থেকে তাকে ইশারায় ডাকছে।

প্রাকারের চতুঃসীমা ঘুরে রক্ষীদের সতর্ক করে আবার এসে দাঁড়ায় উত্তর-দক্ষিণ কোণে। নগরের তিন দিকেই কোলাহল আর আলোর সজ্জা। ভালো লাগে না রুদ্রতাপের। রাত্রি শেষে নগরের উজ্জ্বল আলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রাকার থেকে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে দুর্গের পথ বেয়ে নগর অভিমুখে চলে রুদ্রতাপ। বঞ্চিতের আর এক দুঃসহ রাত্রির অবসান হলো!

অজানিতে উঠে আসে গভীর হতাশার শ্বাস। কোন বাতায়নে বসে গাঁথ তুমি জুঁইয়ের মালা? কম্পিতহাতে স্পর্শ করে কোমরের চাপরাস। সেদিনকার সে-মালা শুকিয়ে গিয়েছে! নবজীবনের সরসতা নিয়ে আজও কি তুমি গাঁথ পুষ্পহার? কোন বাতায়ন পথ সন্তর্পণে উত্তীর্ণ হয়ে জ্যোৎস্না তোমার মুখ চুম্বন করে? কোন বাতাস বয়ে আনে তোমার বারতা? কিন্তু না, রুদ্রতাপ আজ সামান্য প্রাকার-রক্ষী। সুলতান মুঘীষ-এর অন্তঃপুরচারিণীর

গতিবিধি জানবার আকাঙ্ক্ষা তার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। কাঁধের বর্শায় পেশীকে সচেতন করে আবার চলতে আরম্ভ করে রুদ্রতাপ। কিন্তু চলতে গিয়ে আবার কখন থেমে যায়। সুদূর অলিন্দের ঐ জাফরির লজ্জাবতী আলোর ইশারা তার চোখে আনে অব্যক্ত আকুলতা! কিন্তু উপায় নেই, সামান্য প্রাকার-রক্ষীর সে ডাকে সাড়া দেবার উপায় নেই। মিছে শুধু মৃত্যুশ্বাস অনুভব করা! অনেক ভেবেছে রুদ্রতাপ, সমস্ত পথ অবরুদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন! কোনো উপায় নেই। সেদিনের বনের সেই লালমোনিয়া কুলকাঁটার দুঃখ এড়িয়ে আজ সোনার খাঁচায় সমাদর পেয়েছে। সে কি আর চিনতে পারবে তাকে! না, ভাবনা আর শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে না রুদ্রতাপ। কাঁধের বর্শা হাত থেকে শিথিল হয়ে পড়ে যেতে চায়। নিজের সমস্ত দেহে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজকে সতর্ক করে শক্ত হাতে বর্শা ধরে আবার পথ-চলা শুরু করে। ভাবনার কবলে পড়ে মন একই গণ্ডীতে কেবল অবিশ্রান্ত ঘুরে মরে। চোখ বুজে অনিচ্ছার স্বপ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই সুতোয় দিন রাত্রি গেঁথে উদ্‌ভ্রান্ত হয় রুদ্রতাপ।

অস্তাচলগামী দিবাকর, বিদায়ের বেদনায় রক্তিম মুখে মলিন হাসি হেসে নেমে যাচ্ছে ধীরে, অতি ধীরে। শিশমহলের মজলিসি ঝুলায় বসে একমনে চেয়ে আছে অবন্তীমালা। প্রত্যহ সূর্যের এই বিদায়-সম্ভাষণই তার একমাত্র সান্ত্বনা এই দৈত্যপুরীতে। চেয়ে চেয়ে আশ আর মেটে না! কারুখচিত সোনার সুঁইদান অবহেলায় পড়ে থাকে। অস্তগামী সূর্যের রক্ত আভায় ঝল্‌মল্‌ করে সোনার সুঁইদান আর সল্‌মামোতি। বিরহকরুণ মন্থর বাতাসের বিষণ্ণ হাসির রেশ মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যায় এই শিশমহলের সুউচ্চ চারখানি দেয়ালে-ঘেরা ঝুলা-মজলিসের বন্দিনীদের। আলো-ছায়া মেঘ-চিত্রিত অনন্তনীল আঁচলের আভাস চোখে না পড়লেও, নীলিমা সুন্দরীর নীল আঁচলের এক টুকরো কোণ দেখে অনন্ত অঞ্চলের রঙ-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। দিনের যতটুকু পারে এই ঝুলামজলিসের ঝুলায় বসে কাটায় অবন্তীমালা। উচ্চ চারখানি দেয়াল-আঁটা একটুকরো খোলা ছাতের এই অকিঞ্চিৎ আকাশটুকু পাবার জন্যই হয়তো তম্রোল-অন্তঃপুরচারিণীদের শিশমহলের প্রতি এত লোভ আর আকর্ষণ। দেয়ালে বড় বড় আরশি আঁটা শিশমহলের ঘর ক'খানির প্রতি আদৌ লোভ নেই অবন্তীমালার। দেয়ালের চারপাশ ঘেঁষে ছাতের 'পরে রাখা হয়েছে সারি সারি বড় বড় গুলজারি ঘট। তাতে মল্লিকা, মধুমালতী, সন্ধ্যামালতী, লবঙ্গলতিকা, কনকযূথী এবং নাম-না-জানা আরও অনেক ফুল স্থান পেয়েছে। ঘটে চারা বসিয়ে স্বল্পপরিসর জায়গাটুকুকে কুঞ্জরূপ দিয়ে বন্দিনীদের শুধু মন-হরণের প্রচেষ্টা ভিন্ন এ আর কিছু নয়!

কখন যেন আবার দুলতে শুরু করেছে ঝুলা, চোখে মুখে এসে লাগে ঝিরঝিরে উষ্ণ বাতাস, ছড়িয়ে দিয়ে যায় স্বেদসিক্ত চূর্ণ চুলের গুচ্ছ। শিথিল মসলিনের ওড়নাখানা মাথার ওপর থেকে খসে পড়ে। চমক ভেঙে চূর্ণ চুল সরিয়ে ওড়না তুলে মাথা ঢাকে অবন্তীমালা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশে রাখা সুঁইদান থেকে মখমলের টুকরোটুকু তুলে নিয়ে অর্ধসমাপ্ত জরির জুতোয় মোতি বসাতে শুরু করে। সলমা কেটে ছুঁচের মুখে পরাতে গিয়ে হাসে মনে মনে—কার জন্য এ মোতির পঁয়জর?

সুলতানের প্রাসাদে সুলতানা থেকে বাঁদী সকলেরই দিন কাটে পরম অলসতায়। দীর্ঘ অলসতা অসহ্য হলে জরির পঁয়জর, শিরপেঁজ তৈরি করে সময়ের বোঝা হালকা করে। ওড়না, সালোয়ারে সলমামোতি বসায়। সারেঙ্গী সুরবাহারণী আর নাচবাহার-ই-ওস্তাগরণী ঘুরে যায় মহলে মহলে সকাল-সন্ধ্যায়। যাদের ইচ্ছা হয় নাচ গান বা বাজনা শেখো। প্রাসাদে এসে নাচ গান অনেকেই শেখে। সুলতানের মেজাজ রাখবার ওটা একটা মস্ত বড় কৌশল। তা ছাড়া এসব কলাবিদ্যায় দক্ষ হতে পারলে সুলতানী-পদ হারালেও রঙমহলে আসন মেলে। অন্যথা সুলতানের অনুগ্রহচ্যুত হয়ে নবাগতা বিবির তাঁবেদারণী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। পায়ের কাছে পড়ে আছে সারেঙ্গী আর সুরবাহার। সেদিকে চেয়ে অবন্তীমালার মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। না, ওটা আর শিখবে না সে। সুলতানের রঙমহলে আশ্রয় পাওয়ার চেয়ে নয়াবিবির তাঁবেদারণী হওয়া বরং ভালো। তবে কি শিশমহলের সম্মান তার ফুরিয়ে এল! কাল সন্ধ্যাবেলাও সে প্রতীক্ষা করে কাটিয়েছে। তত্রোল অন্দরের রঙমহলে আসেনি। কিন্তু তাতে অবন্তীমালার ভাবনা কেন? তলব না এলেই তো মঙ্গল। ছুঁচ ফুটে যায় অন্যমনস্কতার ফাঁকে। সেলাই ফেলে আঙুল টিপে ধরে রক্তটুকু মুখে চুষে ফেলে দেয়। যবন খাল্যের রক্ত যতটুকু ক্ষয় হয় ততই মঙ্গল। না, সলমামোতির কাজ আর শিখবে না সে। এতদিন যে কি করে শিখেছে এটাই আশ্চর্য মনে হয়। হ্যাঁ, অনেক আশ্চর্যই সম্ভব হলো এই অল্পদিনে। স্রোতের মাছ আজও ডাঙায় এসে বেঁচে আছে! মনে পড়ে দুপুরে খাওয়ার পর প্রত্যহ মা বসতেন হয় চরকায় সুতো কাটতে, নয় তো বেতের সিন্‌পেটরা নিয়ে কাঁথা সেলাই করতে। নানা রঙ-এর পাড়ের সুতো তুলে পুরনো কাপড়ের কাঁথায় কত চিত্র-বিচিত্র ফুলই না তুলতেন! মা বলতেন—'আয় দস্যি, দুটো ফোঁড় শেখ। শ্বশুরবাড়ি গেলে শাশুড়ী বলবে কি!' কোনো রকমে ছুঁচে সুতো পরিয়েই দৌড়ে পালাতো সে। মা হয়তো বলতেন—'দুটো তুলো ধুনে চরকায় ক'টা পাঁজ তোল তো মা?' তুলোর ধামা রোদে ফেলেই দৌড়ে পালাতো অবন্তীমালা। তিরস্কার করতে গিয়ে হেসে ফেলতেন মা। মায়ের আরও কত নিপুণতা ছিল—সৌখিন ধামা কুলো, বকুল তেঁতুল বিচি ও কড়ির শিকে, প্রদীপদোলা, আমসত্ব,

চন্দ্রপুলির জন্যে মাটির ফুলতোলা ছাঁচ তৈরি করতে! এ রকম আরো কত শিল্প কাজে যে নিপুণ ছিল গাঁয়ের বৌ-ঝিরা! তাদের পাটী তৈরির জন্য খেজুর পাতা টেনে আনতো অবন্তীমালা। সৌখিন সলিতাপাটীর জন্য নারকোলের ডোঙা আর সুপুরির খোলা ভিজিয়ে সুতো তুলে আনতো কত পরিশ্রম করে।

হামিদা এসে দাঁড়ায় স্মিতমুখে, হাতে সুরৎ-ই সুর্মা-দান। তাকে দেখে উষ্ণস্বরে বলে অবন্তীমালা—"তুই চলে যা হামিদা। চুল এখন আমি বাঁধবো না। আমাকে আর একটু বসে থাকতে দে এই আকাশটুকুর তলায়।"

—"আঁধার হয়ে এল যে, এখন না এলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে কিন্তু সুলতানা। আজও অন্দরের রঙমহলে সুলতানের আসবার কথা আছে। শিশমহলে আসাও বিচিত্র নয়। তোমার এমন সাজ সুলতানের চোখে পড়লে এ বাঁদীর যে কবর হবে।"

—"আমার সাজ সুলতানের মনে না ধরলে আমার কবরের দিন ঘনিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তোর কবর হতে যাবে কেন?"

—"যতদিন তোমার শিশমহল বজায় আছে, ততদিন তোমার সাতখুন মাপ। শিশমহল সুলতানার সাজের অভাব ঘটলে কবর হয় শিশমহল আত্তর-বরদারণীর।"

—"কিন্তু আত্তর-বরদারণীর হুঁশিয়ারি যদি আমি না মানি, তাহলে তো শিশমহলের বিবিজানেরও কবর হতে পারে?"

—"না, শিশমহল-মালেকানী না যাওয়া পর্যন্ত বিবির কবরের ভয় নেই।"

কৃত্রিম নিশ্চিন্ততায় মুখ উজ্জ্বল করে সকৌতুকে বলে অবন্তীমালা—"আঃ···বাঁচলাম! যাক, আমার কবর তাহলে এখন সুদূর, কি বলো মুসম্মৎ হামিদা?"

বলবার ভঙ্গিতে হাসি উপচে আসে হামিদার কণ্ঠ পর্যন্ত, কিন্তু সে-হাসি সংযত করে সে। মালেকানীর প্রীতি-কৌতুকে বাঁদীর অপরিমিত হাসি বে-আদতী। সলজ্জ একটু হেসে বলে—"বলা যায় না কিছুই, খোদের মর্জির খবর খোদাও ভুল করেন। সুলতানের রাজ্যে কখন কার কিসমত-এ রাত্রি নামে, কখনই বা দিন জাগে, খোদাও তার দাদন লিখতে পারেন না।"

গম্ভীর হয়ে যায় অবন্তীমালা। সে-কথা অবন্তীমালার চেয়ে কি আর কেউ বেশি জানে?

অবন্তীমালার বিষণ্নমুখ দেখে থেমে যায় হামিদা। করুণ হয়ে আসে হামিদার ঘা-সওয়া মন। এমনই তো হয়! কত মেয়েই তো দেখলো হামিদা। এমনই বিষণ্ণ কান্নার হাসি হাসে প্রথম প্রথম। তারপর ক্রমে ক্রমে সয়ে গিয়ে এই প্রাসাদের এক একখানি পোড়া ইটের মতোই সে প্রাসাদের একটুকরো অংশ হয়ে নিজের বুক চাপড়ে সুরায় সুর-হারিয়ে সারেঙ্গীতে বিকৃত উল্লাসের প্রতিধ্বনি তোলে।

অন্যমনে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে অবন্তীমালা—"তোর আগে কি নাম ছিল রে হামিদা ?"

চমকে ওঠে হামিদা।—"ও-কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ সুলতানা ?"

—"এমনি, মাঝে মাঝে ভারী ইচ্ছে হয় এই প্রাসাদের মেয়েমানুষগুলোর সুলতানী-বোরখা খুলে তাদের আসল রূপ দেখি। বল না হামিদা তোর আগের নাম কি ছিল ?"

বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে বলে হামিদা—"জানিনে সুলতানা, কিছুই মনে নেই। শুধু আবছা মনে পড়ে এক ভীষণ রাত্রি ! শীতের রাতে শুয়েছিলাম একেবারে মায়ের উষ্ণ বুক জড়িয়ে। তারপর শুনি কেবল চেঁচামেচি ! তারপর আর মনে নেই। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখলাম এক ছইয়ের নৌকায় কতকগুলি মেয়ে আমরা, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরছি। রাত্রে চাচা হানিফের পা টিপি, দিনে ভাত রাঁধি আর বাসন ধুই পালা করে। চাচা হানিফ নগরে নগরে ভরার মেয়ের ব্যবসা করেন। একদিন এলেন সুলতানের খাসবাগে। সুলতান ইয়ার নিয়ে সরাবতোষ করছিলেন। আমাদের নিয়ে চাচা হানিফ এলেন সেই বাগে। ষাট ভরাণীর মধ্যে চারজনকে রাখলেন পছন্দ করে চার দিনার দিয়ে। সে চারজনের মধ্যে আমিই হলাম কেবল শিশমহলের আত্তর-বরদারণী, আর বাকী ক'জন হলো মহল সুড়ঙ্গ-পথের ঝাড়ুদারণী।"

—"শিশমহল আত্তর-বরদারণীর খুব কদর, নারে হামিদা ?"

বিষণ্ণহাসি হাসে হামিদা। বলে—"মেয়েমানুষের আর কদর কি সুলতানা ? একটা বাঁদীর কদর এক স্বর্ণ দিনার, এক গাই বাছুরের কদর দুই স্বর্ণ দিনার আর বলদের কদর তিন স্বর্ণ দিনার। একটা বলদ দিয়ে তিনটে বাঁদী কেনা যায়। মেয়েমানুষের এই তো কদর ! তবে শিশমহল যাতায়াতে কখনো ক্বচিৎ সুলতানের সঙ্গে দেখা হয়, হয়তো ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই একটা বাতচিত্‌ও হয়, তাই নোকর, নোকরাণী, নকীবরা একটু সমীহ করে—এই যা।"

—"মেয়েদের কদর নেই বলছিস অথচ এই মেয়েমানুষের জন্যই তো আবার কত রাজা-বাদশায় যুদ্ধ হয় ?"

—"তা হয় বৈ কি সুলতানা, কিন্তু সে-যুদ্ধ তো বাদশাহী খেয়াল। খেয়াল মিটলে পর সেই মেয়ের দর হয়তো এক দিনারও থাকে না। যেমন হয়েছে আজ প্রাসাদে কত সুলতানার।"

নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে অবন্তীমালা, হামিদা সামান্য বাঁদী কিন্তু ওর অনুভূতির অভিজ্ঞতা কারো চেয়ে কম নয়। মমতায় হামিদার হাতখানি ধরে জিজ্ঞাসা করে—"তোর মায়ের জন্যে মন কেমন করে না হামিদা ?"

—"যে-মায়ের স্নেহমুখ মনে পড়ে না তার জন্যে আর মন কেমন করবে কি

সুলতানা? তবে খোদা দুর্বল মায়ের বুকে জন্ম দিয়েছিলেন বলে খোদার উপর মাঝে মাঝে খুবই অভিমান হয়।"

—"তোর দেশ কোথায় ছিল রে হামিদা?"

—"শুনেছি কেন্দুবিল্বে। সেখান থেকেই চুরি করে এনেছিল চাচা হানিফ। মেয়ে লুট করে এনে সুলতান আমীর ওমরাহদের কাছে বেচে দেওয়া ছিল চাচা হানিফের ব্যবসা।"

—"এখন তোর চাচা হানিফ কোথায়?"

—"কে জানে কোথায়। তার খবর কি আর করতে ইচ্ছে যায় সুলতানা? তবে শুনেছি, এখন তার ব্যবসা আরও জোরদার চলেছে। ক্রমেই দেশে তুর্কীদের জুলুম বাড়ছে, নিত্যি নতুন সোনার দিনার বাজারে চলছে। তার ওপর অঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্রের রাজাদের আর তেমন প্রতিপত্তি নেই দেশে। হরদম দেশ এ-হাত থেকে ও-হাতে পড়ছে, লুটতরাজ লেগেই আছে। দেশের গরীব দুঃখীদের আর কে দেখছে? জমি-জমা ধন-সম্পত্তি স্ত্রী-কন্যা, হয় অভাবে পড়ে বেচছে, নয় তো লুটে নিচ্ছে। এদিকে নগরে নগরে তুর্কীদের খানদানী বাড়ছে, বড় বড় হারেম করছে মেয়ে কিনে, নয় তো লুট করে এনে।"

—"তুই এত কথা কোথায় শিখলি রে হামিদা?"

সলজ্জ হাসি হাসে হামিদা। বলে—"এই প্রাসাদে বসেই বাঁদীরা দুনিয়ার হালচাল শেখে। প্রাসাদের অন্দরে জ্যোতিষ, বৈদ্য, হেকিম, মৌলবী, পণ্ডিত সবাই তো আসেন সুলতানের চোখ এড়িয়ে। যাক ও-সব কথা, এবার এস তোমার চুলটা বেঁধে দি।"

—"কি হবে বল চুল বেঁধে? সুলতানের তো কালও আসবার কথা ছিল, আজও হয়তো কালকের মতোই সুলতানাদের চোখের নিদ্রা প্রতীক্ষায় ফুরোবে। প্রতি রাত্রে কি আর সুখের নিদ্রা এভাবে দীর্ঘশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়?"

—"সুলতান আসুন আর নাই আসুন তাঁর জন্য প্রতীক্ষারতা বন্দিনীদের দীর্ঘ নিঃশ্বাসই হারেম উষ্ণ করে রাখে।"

উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে অবন্তীমালা—"কিন্তু কাল সুলতান এলেন না কেন রে হামিদা?"

—"শুনেছি সুলতানের মন ভালো নেই।"

—"কেন? এত বড় যুদ্ধ জয় করে ফিরেও সুলতানের মন ভালো নেই?"

—"মালেক কুলিশের সংবাদ না পেয়েই শুনছি সুলতান বিশেষ অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বহুদিকে পেয়াদা ফিরিস্তিদা পাঠিয়েছেন, কিন্তু কেউই নাকি সংবাদ নিয়ে এখনও ফেরেনি।"

—"সামান্য কুলিশ খানের সংবাদের জন্য সুলতান এত চিন্তিত কেন?"

—"সামান্য একজন পেয়াদাও বরখেলাপী করলে স্থলতানকে হুঁশিয়ার হতে হয়, আর এ তো মালেক কুলিশ! মালেক কুলিশকে স্থলতান সামান্য মনে করতেন না। মালেক কুলিশের নিজের বাহুবল তো আছেই, তা ছাড়া বঙ্গে, উপবঙ্গে তার অনুগত লোকও অনেক আছে।"

—"আচ্ছা, যুদ্ধজয়ের মুখে মালেক কুলিশ হঠাৎ পালালেন কেন বল তো?"

—"সেইজন্যেই তো ভাবনা। কেন যে তিনি পালালেন তা কেউ জানে না, স্থলতানও হয়তো তাঁর এই বরখেলাপীর উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরেই এমন ভাবিত হয়েছেন।"

—"মালেক কুলিশ এমন অজ্ঞাত হয়ে লুকোলেনই বা কোথায়?"

—"সেই তো আশ্চর্য! প্রাসাদের সংবাদ, তিনি নাকি যুদ্ধজয়ের পূর্বরাত্রে এখানে এসেছিলেন।"

শুনে কেঁপে ওঠে অবন্তীমালার বুক, কিন্তু নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করে—"প্রাসাদে এসেছিলেন?"

—"তাই তো বলাবলি করছে প্রাসাদের বাঁদী, বরকন্দাজ, ফাটকখবরদাররা।"

—"শুনে স্থলতান কি বললেন?"

—"স্থলতানের কানে এখনো এ খবর যায়নি।"

—"কিন্তু স্থলতানের কানে গেলে নিশ্চয়ই স্থলতান আরো ভাবিত হবেন, আরো উদ্বিগ্ন হবেন?"

—"শুধু তাই নয়, স্থলতান জানতে পারলে যারা দ্বার ছেড়ে দিয়েছিল, আর অরক্ষিত দ্বার উত্তীর্ণ হয়ে যে-মহলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সে মহলবাসিনী সকলেরই কাঁটার কবর হবে বলে মনে হয়।"

চিন্তিত অবন্তীমালা সহজ স্থরে বলে—"কিন্তু এ-সংবাদ স্থলতানের কানে যায়নি তুই জানলি কেমন করে?"

—"এ পর্যন্ত কবরের হুকুম অন্দরে এসে পৌছয়নি বলেই জানি।"

—"কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এতক্ষণ স্থলতানের কানে সংবাদ পৌচেছে! কিম্বা হয়তো এই মাত্র কবরের হুকুমও এসেছে অন্দরে। তুই এখনও সে-খবর পাসনি?"

—"কিল্লার তুচ্ছ সংবাদও অন্দরের বাঁদীরা সকলের আগে ওয়াকিবহাল হয়ে যায় স্থলতানা। বাইরের আলো-হাওয়া বর্জিত স্থলতানের হারেমে বাইরের টুকরো খবর নিয়ে নাড়াচাড়া করে টেনে বড় করাই তো বাঁদীদের একমাত্র বিলাস।"

হাসি দিয়ে আড়াল করতে চাইলেও অবন্তীমালার মনের উদ্বেগ বোঝে হামিদা। একটু থেমে সহানুভূতির স্বরে বলে—"সহজে এ-সংবাদ স্থলতানের

কানে পৌঁছবে না সুলতানা। প্রাসাদে নিরপরাধ তো কেউ নয়, তাই একের অপরাধের কথা অপরে সুলতানের কানে তুলতে ভয় পায়। তা ছাড়া মালেক কুলিশ জেব ভরে স্বর্ণ দিনার দিয়ে গিয়েছেন। প্রাসাদরক্ষী তুর্কী ক্রীতদাসরা সহজে নেমকহারামি করে না। কিন্তু আর দেরী করো না সুলতানা, আশ্‌মানে যে আঞ্জম্‌ উঠলো।"

বুকের ভারী নিঃশ্বাস ফেলে ঝুলা থেকে উঠে দাঁড়ায় অবন্তীমালা। মিটিমিটি তারারা হাসছে, অবন্তীমালাকে করুণা করেই হয়তো! কিন্তু কুলিশ? কুলিশ গেল কোথায়? ঐ ঝক্‌ঝকে পুবের তারাটার দিকে কি? কে জানে? কিন্তু এমন গোপনে পালালো কেন? নিষ্ঠুরা অবন্তীমালার প্রত্যাখ্যানের বিষণ্নতায়? না বিজয়-অভিমানী তব্রোল-এর বিরূপতার ভয়ে? না প্রতিদ্বন্দ্বী তব্রোল-এর সর্বনাশের পথ অনুসন্ধানে?

অন্দরের কোণে কোণে বেলোয়ারিসেজের গেলাশে গেলাশে পরিপূর্ণ তেলে মোটা মোটা পলিতা জলছে—ঝল্‌মল্‌ করছে অন্দরমহলের উজ্জ্বল রঙ-এ চিত্রিত দেয়াল! এক মহল থেকে অপর মহলে যাবার সুড়ঙ্গ-পথের কোণে কোণে দেবদারু পাতার মালায় নানা ফুলের গুচ্ছ বেঁধে সুরভিত করা হয়েছে সুড়ঙ্গের রুদ্ধ বাতাস! খেজুরের পাতার সূক্ষ্ম বুননির বিচিত্রচিত্রিত পাটী দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়েছে গমনাগমনের পথ। কারুকার্যময় চন্দন কাষ্ঠের পাথায় অগুরু, কস্তুরী-মদ লেপন করে এবং খোপায় কামিনী ফুলের মালা জড়িয়ে প্রতীক্ষা করছেন সুবেশা রূপসী হারেম-শোভিনী প্রধানারা।

আর শিশমহলে প্রতীক্ষা করছে অবন্তীমালা। একমনে খুঁটে তুলছে পাথার শুকিয়ে যাওয়া অগুরুকস্তুরী, অসতর্ক আঙুল খোপায় লেগে একে একে খসে পড়ছে স্পর্শকাতর কামিনী ফুলের শুভ্রদল। সিংহ বলবন-বিজয়ী ব্যাঘ্র-তব্রোল আজ এসেছেন অন্দরের রঙমহলে। নৃত্য-গীতমুখর রঙমহলের সুরাবিবশ অবিন্যস্ত নূপুরের রুম্‌ঝুম্‌ আর তব্রোল-এর রুক্ষকণ্ঠের আবেশবিহ্বল উল্লাস-ধ্বনি আর অট্টহাসি মাঝে মাঝে এসে ঠিকরে পড়ছে শিশমহলের দ্বারে। এক সময়ে লক্ষ্যো আসে অবন্তীমালার, একে একে নিঃশেষ হয়ে ঝরে গিয়েছে সুরভিত কমনীয় মালা! দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবন্তীমালা। কামিনীর মালা অবন্তীমালার মতো এতো নিরুপায় নয়, প্রতীক্ষা অসহনীয় হলে অন্ততঃ মরতে জানে!

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে রোশেনা। সেদিন ঝঙ্কার দিয়ে চলে যাবার পর এ-ক'দিন আর পা দেয়নি শিশমহলে। অবন্তীমালা দেখেও দেখে না রোশেনাকে।

অবন্তীমালার এই অবজ্ঞাটুকু বুঝেও উপেক্ষা করে রোশেনা বলে—"সুলতান আসছেন শিশমহলের পথে, পাথা হাতে প্রস্তুত থেকো বিজয়ী

সম্ভাষণে। ঐ যাঃ! একেবারে নিরাভরণ করে ফেলেছো পাখাখানা! বল তো এখন কি করি! আচ্ছা দাঁড়াও দেখি!"

যেমন এসেছিল তেমনি ছুটে চলে যায় রোশেনা। তখনি ফিরে আসে হাতে আর একখানি সজ্জিত পাখা নিয়ে। এগিয়ে ধরে পাখাখানা অবন্তীমালার হাতের কাছে—"নাও, ধর।"

চোখ তোলে না অবন্তীমালা, নির্বিকার মুখে পাখার সুরভি প্রলেপ খুঁটতে থাকে। নিরুপায় বলেই রোশেনাকে সহ্য করতে হয় অবন্তীমালার এই নীরব অপমান। মনের আগুন ঢাকবার জন্যই রোশেনা অবন্তীমালার ওড়নার দিকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে ওঠে—"সর্বনাশ, এ কী ওড়না দিয়েছে হামিদা! এই কি সুলতান সম্ভাষণের বেশ! বাঁদীকে বাঁদী করে রাখতে শিখতে হয় অবন্তী। রোশেনার শিশমহলে কাজে এমন গাফিলতি করে হেসে বেড়াবার স্পর্ধা ছিল না হামিদার।"

এতক্ষণে ভ্রূভঙ্গি করে চোখ তোলে অবন্তীমালা। বলে—"সুলতানকে আঁচলে বাঁধতে যে এর বেশি উজ্জ্বল ওড়নার প্রয়োজন হয় না অবন্তীমালার, হামিদাও তা জানে। আর 'মনোমোহিনীকে' শিশমহলে এসে 'রোশেনা' হতে হয়েছিল, তাই হামিদা ছিল বাঁদী। কিন্তু অবন্তীমালা শিশমহল-অধীশ্বরী হয়ে আজও অবন্তীমালাই আছে। তাই হামিদা বাঁদীত্বের বেশ পরিত্যাগ করে সখীত্বের পরিচ্ছদে স্পর্ধিত হয়ে আনন্দ ছড়িয়ে বেড়ায়। এমন কি রোশেনাবাঁদীও অনুরূপ স্পর্ধিত বলেই এ-ক'দিন মালেকানীর সংবাদ না রেখেও নির্ভয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।"

অবন্তীমালার ভাষা ঠিক বোঝে না রোশেনা, কিন্তু অবন্তীমালার চোখের কাঠিন্য অনুভব করে জ্বলে ওঠে। তবু স্থান ত্যাগ করতে পারে না নিরুপায় রোশেনা। কি একটা দুরাশা যেন তার পা চেপে ধরে রাখে। হুঁশদারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ত্বরিতে এগিয়ে ধরে অগুরুসুরভিত পাখা—"ঐ আসছেন সুলতান। নাও, পাখা ধর। উঠে দাঁড়াও পাখা হাতে।"

রোশেনার চঞ্চল নিঃশ্বাস আর উদ্বিগ্ন মুখ দেখে কঠিন হাসি হাসে অবন্তীমালা। বলে—"সুলতানকে আমি কি দিয়ে কেমন করে অভ্যর্থনা করবো, সে কি শিখতে হবে আমায় বাঁদীর কাছে?"

ভিতরে আগুনের শিখা কেঁপে উঠলেও বাইরে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে রোশেনা। মধুরভাষিণী অবন্তীমালা এত কঠিন ভাষা পেলো কোথায়! সেদিনও তো কেঁদে এই অবন্তীমালাই মুক্তির পথ খুঁজেছে রোশেনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে! অসহায়া বালিকার এত স্পর্ধা! হ্যাঁ হঠাৎ সৌভাগ্য এলে এমনই হয়। রোশেনারও হয়েছিল। এই তো সেদিনও বাঁদীকে করুণায় কাছে ডেকেছিল রোশেনা! দিনের প্রথম আলো দেখলে রাত্রির জন্য সলতে প্রস্তুতির কথা আর মনে থাকে না। কিন্তু আসবে, অবন্তীমালার রাত্রিও নিকট।

দ্বিতীয়বার শোনা যায় হুঁশদারের উচ্চ কণ্ঠ !

হাতের পাখা ফেলে দিয়ে চোখের তারায় স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ছড়িয়ে চলে যায় রোশেনা। রোশেনার পুষ্পগন্ধ-শোভিত ভূলুণ্ঠিত পাখার বুকে পা দিয়ে আরামচৌকি থেকে নেমে নিরাভরণ পাখাটা হাতে নিয়ে অবন্তীমালা উঠে দাঁড়ায়।

হুঁশদারের তৃতীয় হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে সুরাবিবশ পায়ে সহাস্যমুখে প্রবেশ করেন তব্রোল।

—"কুশল তো সুন্দরী ?"

এক হাতে পাখা তুলে আভূমি কুর্ণিশ করে এগিয়ে এসে সুরভিত পাখা আন্দোলিত করে অবন্তীমালা।

—"যুদ্ধশ্রান্ত সুলতানের জন্যই উদ্বিগ্ন দিন যাপন করছে এ বাঁদী।"

হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে দুই বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে আসেন তব্রোল। বলেন—"সিংহাসন-ভৃত্যদের জীবন বড় নিষ্ঠুর প্রেয়সী। তৃষ্ণায় প্রাণ নিস্পন্দ হতে চাইলেও ইচ্ছামতো পানীয় গ্রহণের অবসর মেলে না। তাই নিয়ত তোমার মুখ স্মরণে তৃষ্ণার্ত হলেও সে-মুখ দর্শনে তৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব হয়নি এ-ক'দিন। তোমার এই কথা ক'টি শোনবার জন্যই তো ছিলাম অধীর প্রতীক্ষা করে আর ঐ মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিই তো বারবার তোমার কথা মনে করিয়েছে !"

কিন্তু ক্রমে এগিয়ে আসছেন তব্রোল ! পেছনে সরে তব্রোল-এর স্পর্শ বাঁচিয়ে স্বকীয় ভঙ্গিতে কুর্ণিশ করে হেসে বলে অবন্তীমালা—"জাহাঁপনার প্রতিজ্ঞা দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দেবার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।"

প্রসারিত বাহু নিরাশায় সঙ্কুচিত করে নিকটস্থ মসলন্দ পোষ-এ বসে পড়ে বিষণ্ণকণ্ঠে উচ্চারণ করেন তব্রোল—"বার বার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে ছলনায় ভুলিও না সুন্দরী।"

দু' পা এগিয়ে এসে সুমিষ্ট হেসে কুর্ণিশ করে অবন্তীমালা। বলে—"ছলনা ! ছলনা নয় জাহাঁপনা। আপনার মঙ্গল কামনা করে বলেই আপনার প্রতিজ্ঞা-বিস্মৃতি চায় না বাঁদী।"

উঠে দাঁড়ান উত্তেজিত তব্রোল—"বেশ, তবে কাল, কাল প্রভাতেই নিকার জন্য প্রস্তুত থেকো।"

—"জাহাঁপনার আদেশ শিরোধার্য।"

আভূমি কুর্ণিশ করে অবন্তীমালা বলে—"বাঁদী এ সৌভাগ্যের জন্য সানন্দে অবশিষ্ট রাত্রি প্রতীক্ষা করবে।"

নির্নিমেষে চেয়ে দেখেন তব্রোল, অবন্তীমালার উত্তেজিত নিঃশ্বাসে ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠ, আয়ত-চোখের কম্পিত পল্লব, ঘনশ্বাসে কম্পিত সুগঠিত নাসা। তব্রোল-এর অনিমেষ দৃষ্টিতে সলজ্জমুখে দৃষ্টি নত করে অবন্তীমালা। অবনতমুখী অবন্তীমালার অগ্নিশিখার মতো অঙ্গুলির কম্পনে মণিচুড়ের অঙ্গুরীয়ের

মণি ঝল্‌মল করছে! ওড়নার আঁচলের সুতো টেনে টেনে অবন্তীমালা স্থির রাখতে চেষ্টা করছে সে অবাধ্য অঙ্গুলি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন তন্ত্রোল—"কিন্তু আজ? আজও কি তোমার দুয়ারে এসে সারা বাঙলার ভীতি, দুর্ধর্ষ মুঘীষ বিতাড়িত ভিক্ষুকের মতো ক্ষুব্ধ মনে শূন্য হাতে ফিরে যাবে?"

—"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন জাহাঁপনা। কালকের মঙ্গলের জন্য বাঁদীর আজকের ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন সুলতান।"

মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখেন তন্ত্রোল, সুগৌর কপালে মণি-খচিত ঝাপ্টার মোতির ঝালর মৃদু মৃদু দুলে চুম্বন করছে সবঙ্কিম ভ্রূযুগল! কানের ঝুমকি চৌদানী এসে স্পর্শ করেছে গণ্ডের রক্তিম আভা! রক্তচূণীর নথ স্পর্শ করেছে রক্তিম ওষ্ঠ! কণ্ঠের মোতির নও-নর বুকের কম্পন স্পর্শ করে আনন্দে কাঁপছে! অতিকষ্টে চোখ ফিরিয়ে এনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিংখাপের মেরজাইয়ের জেব খুলে বার করেন কয়েকটি শুষ্ক ফুল। বলেন—"এই দেখো, তোমার সেই শুভ-ইচ্ছা আজও বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি। শুভ-ইচ্ছার ফুল প্রথম দু'দিন সরস থাকে, তারপর ক্রমে শুকিয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী সরসতা আর সজীবতার জন্য চাই প্রাণের স্পর্শ, মমতার আকুলতা।"

—"মমতা বড় ভীরু জাহাঁপনা, বড় স্পর্শকাতর। সে মমতাশীতল আশ্রয় ভিন্ন কূল হারিয়ে ব্যাকুলভাবে অগ্রসর হতে ভয় পায়। এ বাঁদীর প্রতি জাহাঁপনার অনুগ্রহ অসীম, কিন্তু অনুগ্রহ ও মমতায় যে চিরদিনের দ্বন্দ্ব।"

—"তোমার সকল কথা আমি স্পষ্ট করে বুঝি না সুন্দরী, কিন্তু মুগ্ধ করে তোমার ওষ্ঠের কম্পন, বিভ্রান্ত করে তোমার কণ্ঠের আবেদন। তোমার সিতারায়ে মশ্‌রিক্-ই আঁখিতে আছে জাদুর আকর্ষণ। আর মাত্র অর্ধরাত্রি—আর অর্ধরাত্রি পরে তুমি হবে আমার সুলতানা সিতারায়ে মশ্‌রিক্।"

দু'পা এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে যান তন্ত্রোল—"নাঃ, তুমি স্ব-ইচ্ছায় এগিয়ে এসে নিজেকে না দিলে আমি গ্রহণ করবো না তোমায় এই আমার পণ। কিন্তু তোমার চোখের তারায় ভিখারী তন্ত্রোল-এর প্রতিবিম্ব কম্পিত হতে দেখে হয়তো সংযত থাকবে না অসংযমী সুলতান মুঘীষ। তখন হয়তো প্রেমিক তন্ত্রোলকে পরাজিত করে আসন গ্রহণ করবে লুণ্ঠনকারী সুলতান। বিদায় প্রেয়সী। আর মাত্র আজকের এই অর্ধরাত্রি! এই দুঃসহ দীর্ঘ অর্ধরাত্রির পর আমার প্রতিজ্ঞা পালন হলে আসবে তোমার প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণের কাল। এ দুঃসহ রাত্রির পর তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আমার চাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই এ ভাগ্যবানকে গ্রহণ করবে, এই ভরসায় আমি এ-অর্ধরাত্রির আঁধার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ক্ষয় করবো।"

তারপর গলা থেকে খুলে কর্পূর ও মোতির মালা এগিয়ে ধরেন তন্ত্রোল, বলেন—"এ বান্দার হৃদয়ের মালা তোমার পঁয়জর, গ্রহণ কর প্রেয়সী!"

চেষ্টা করেও আর নিজেকে সংযত করতে পারে না অবন্তীমালা।

দ্বিধা-কম্পিত পায়ে দু'পা পিছিয়ে যায়। কিন্তু…বুদ্ধি হারালে নিশ্চিত মরণ! সকল অঙ্গের শক্তি দিয়ে অবাধ্য কম্পিত চরণ সংযত করে এগিয়ে এসে অবন্তীমালা কম্পিত অঞ্জলি পেতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—"জাহাঁপনার মালা ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ, পেয়ে ধন্য হলো বাঁদী!"

মালা গ্রহণ করতে গিয়ে কম্পিত অঞ্জলি-চ্যুত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। ক্ষিপ্র হাতে তুলে নেয় অবন্তীমালা। সেদিকে চেয়ে আরক্তমুখে কঠিন হেসে বলেন তস্ত্রোল—"আর অর্ধরাত্রি! মাত্র অর্ধরাত্রির অহঙ্কারে সুলতানের গলার মালা হস্তচ্যুত করো না ছলনাময়ী! ছলনা করে অবহেলায় হারিও না প্রেমিক তস্ত্রোলকে। প্রেমিক তস্ত্রোলকে বঞ্চনা দিয়ে আবার তার মধ্যে জাগ্রত করো না লুণ্ঠনকারী সুলতান। স্মরণ রেখো কালই নিকা। আজই ছলনার শেষ রাত্রি।"

তস্ত্রোল-এর নির্গমনের দৃপ্ত গম্ভীর পদধ্বনি অবন্তীমালার শঙ্কিত বুকে বহুক্ষণ পর্যন্ত ধ্বনিত হতে থাকে। নির্জন কক্ষের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বসে পড়ে নরম রেশমী গালিচায়। মোরগের ডাক আর ঘণ্টাঘরের ঘণ্টাধ্বনি রাত্রির তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করে। আজকের রাত্রি শেষ হলেই আসবে অবন্তীমালার মৃত্যু নিয়ে কালরাত্রি! জন্ম নেবে সুলতানা সিতারায়ে মশ্‌রিক্! কিন্তু……তারপর? তারপর…… সুলতানা সিতারায়ে স্থান নেবে বাঁদীমহলে সিতারা বাঁদীরূপে, কিন্তু তার আগে? তার অনেক আগেই সিতারার জন্ম-পথ রুদ্ধ করে দেয় না কেন অবন্তীমালা? অবন্তীমালার মৃত্যু-সম্ভাবনার বহু পূর্বেই যে মৃত্যুর দূতরূপে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাঠিয়েছে বন্ধু কুলিশ! না, অবন্তীমালার মৃত্যু হতে দেবে না বন্ধু কুলিশ। সিতারা বাঁদী জন্মাবার পূর্বেই তার মৃত্যুবাণ দিয়ে গিয়েছে 'কুলিশ' জওহরত-এর আবরণে জহর। বিবশ পায়ে উঠে গিয়ে কুলুঙ্গি খুঁজে শামাদানের কাছে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কুলিশের অঙ্গুরীয়ের 'পরে মণিখচিত তাঁর নামাঙ্কিত মোহর। কৌশলে টিপে মোহর খুলতেই ছোট্ট কৌটায় দেখা দেয় উগ্র হেকিমি বিষ। নাকের কাছে আনতে গিয়ে থেমে যায় অবন্তীমালা। হেকিমি বিষ! আঘ্রাণে পর্যন্ত মৃত্যু হতে পারে! অঙ্গুরীয়ের কৌটা বন্ধ করে ওড়নার আঁচলে বাঁধে। থাক আজকের রাত। মাথার ওপর থেকে এই উজ্জ্বল রঙিন আলোর ঝিকিমিকি নিভে যাক। আসুক আগামী দিনের প্রভাত। কাল প্রভাতে এই গবাক্ষহীন কক্ষের আধো-অন্ধকারে রুদ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাসে যখন মন স্তিমিত হয়ে আসবে, এ সুন্দর পৃথিবীর রূপ যখন ছায়া হয়ে কল্পনায় ভাসবে, সেই সুন্দর মুখের স্মৃতি যখন সুদূর অস্পষ্ট মনে হবে, বিদায় নেবার তখনই তো প্রকৃষ্ট সময়।

শয়নকক্ষে এসে পালঙ্কে গা এলিয়ে দিয়ে আঁচলে বাঁধা অঙ্গুরীয় শক্ত হাতে চেপে ধরে চোখ বোজে অবন্তীমালা। হ্যাঁ, কাল প্রথম প্রভাতে

অবন্তীমালার মৃত্যু ও সিতারার জন্ম-সন্ধিক্ষণে কণ্ঠে ঢেলে দেবে কুলিশের এই আশীর্বাদ। এই ঝলমলে সুন্দর আলো-ভরা পৃথিবীতে আর কয়েকটি মাত্র নিঃশ্বাস বাকি! বিদায়-নমস্কার গ্রহণ কর কুশীগ্রামের উৎসবে চঞ্চল নদীতট, হাসিতে-ভরা বকুলের বন, সপ্তকূল কুঞ্জ···আর সেই অবিস্মরণীয় দিনের বাথানের পথ। প্রণাম গ্রহণ কর দুঃখিনী জননী সুদেষ্ণা।

আজ সারা সন্ধ্যা রোশেনা বহুযত্নে বেঁধেছিল কবরী। আয়ত-চোখে টেনে দিয়েছিল সুরভিত সুর্মা। কানের পাশে গুঁজে দিয়েছিল আত্তর-ই-খস্‌খস্‌। কপালে মণিকীট বিন্দুর পাশে এঁকেছিল অগুরু চন্দনের ঝররা তিলক। তার ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছিল মণিখচিত সোনার ঝাপ্টা। নাকে পরেছিল মোতির বেশর, নীলমণির নথ। কোমরে দিয়েছিল সপ্ততারা চন্দ্রহার। পায়ে পরেছিল গুজরী-পঞ্চমের তলায় শতদলচরণপদ্ম। ঘরে এসে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কবরীতে গোঁজা রজনীগন্ধার গুচ্ছ, চোখের জলে ঘষে ঘষে মুছে ফেলে সজল চোখের সুর্মা। ঘুরিয়ে দেখে অভিমানাহত মুখ,—গিয়েছে কি সব রূপ ধুয়ে মুছে রোশেনার? অকস্মাৎ দেখা হলে মুখোমুখি, চেনা কি আর যায় না একেবারে? এই তো সেদিন—আঙুলে গুনলে হয়তো বছর দুই। এই মুখ দেখেই না অনুরাগে বিহ্বল-চোখে চেয়ে থাকতেন তম্রোল? আর আজ নবীনার রূপে এমনই কি অন্ধ হয়ে চলেছেন শিশমহলে যে পথে চোখাচোখি হলেও একটা কুশল প্রশ্নও জাগে না মনে!

আরশিতে ছায়া পড়ে কার! চমকে উঠে ফিরে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় রোশেনা। সুলতানা অনুচরী মামুদা! যে মামুদা কোনদিন সুলতানা রোশেনার শিশমহলে পা বাড়ায়নি অহঙ্কারে, সে আজ কোন অভিসন্ধি সাধনে এসেছে রোশেনার বাঁদীমহলে!

সহাস্যমুখে বলে মামুদা—"ভালো আছো তো?"

হতবাক রোশেনা বিবশ ঘাড় ঝুলিয়ে জানায় ভালো আছে। মামুদা এসে রোশেনার পালঙ্কের পাশে রাখা একমাত্র পাটী-পোষে বসে। মনে মনে বিরক্ত হয় রোশেনা। এই তো সেদিনও দেখা হলে কচিৎ কুর্ণিশ করে সম্মান জানিয়েছে মামুদা বাঁদী। আজ রোশেনা ও মামুদায় যে আর বিশেষ পার্থক্য নেই, সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতেই কি এসেছে মামুদা? কিন্তু না, মামুদার মুখে চোখে তো ঔদ্ধত্যের প্রকাশ নেই? বরং সহৃদয় কণ্ঠেই মামুদা বলে—"সব ব্যাপার শুনেছ তো সুলতানা?"

সুলতানা! মামুদা আজও রোশেনাকে সুলতানা বলে স্বীকার করে তা হলে? গলে যায় রোশেনা।

—"কোন ব্যাপারের কথা বলছ মামুদা?"

—"এই···সুলতান যে একটা ছুকরীকে নিয়ে নিদারুণ মেতেছেন, আর

কচি-মুখের বদ পরামর্শে রইস্ সুলতানাদের আর কোনো মান-সম্ভ্রম রাখছেন না।”

—“কেন? অসম্মান করেছেন কাউকে এমন তো শুনিনি?”

—“অসম্মান আর বলবে কাকে? যুদ্ধে যাবার আগে অন্দরে এসে একবার না করলেন তোমার তল্লাস, না করলেন সুলতানা আর্জিনার। আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে অন্দরে এসে প্রথমদিনেই গিয়ে ঢুকলেন গেঁয়ো ছুকরীর মহলে! তোমাদের পুরনো খানদানী যদি সুলতানের মনে না থাকে, চোখে না দেখেন, কানে না শোনেন, তবে পঁয়জর মারো অমন সুলতানীর।”

অমায়িক হাসি হেসে রোশেনা বলে—“কিন্তু কি করবে বলো? খোদের মর্জির ওপর তো খোদারও কলম চলে না?”

—“খোদা! খোদা তো তোমাদের হাত,পা, চোখ, বুদ্ধি দিয়েই দিয়েছেন। তিনি আর কত কলম চালাবেন? এত দেবার পরও যদি তোমরা পঁয়জরের বদলি পঁয়জর দিতে না পারো তো খোদা নাচার। আমার আর কি বলো? পয়দায়ীস্ থেকে বাঁদী আছি, মর্গ পর্যন্ত এত বরখেলাপী আর বরদাস্ত হয় না। গায়ের চামড়া পুড়ে ওঠে। তোমরা সুলতানী-নরম চামড়ায় কেমন করে এত গরম পঁয়জর বরদাস্ত কর ভেবে অবাক হয়ে যাই। কাল তো আবার নতুন নিকার হুকুম জারি হয়েছে শুনলাম।”

—“নতুন নিকা!”

—“হ্যাঁ গো, শিশমহলের নতুন তোতা কাল সুলতানের বুকের সোনার দাঁড়ে উঠবেন। এ আবার চলতি রেওয়াজী নিকা নয়, একেবারে দেনমোহর কবুল করে খাসনিকা।”

—“কখন হুকুম বেরোলো?”

—“এই তো মাত্র শুনে এলাম। নিকা-দরবার-সাজ শেষ করতে হবে রাতের বাতি না নিভতে। ভোরের কাক আকাশে উঠতে না উঠতে নিকা-দরবার লাগবে।”

উদাস দৃষ্টি মেলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রোশেনা। রোশেনার পর এসেছিল জুবেদা। কিন্তু সেদিনও রোশেনার নিজের কাছে নিজেকে এমন সর্বহারা মনে হয়নি।

মামুদা রোশেনার মুখ দেখে সহানুভূতির সুরে বলে—“কিন্তু এ বাঁদীর মন বলছে প্রথম দাবী তোমারই। তোমারই উচিত নতুন দাঁড়কাকের লোভের ঠোঁট মুচড়ে ভাঙা।”

—“আমার পরেও তো এসেছে জুবেদা রূপসী।” উদাসকণ্ঠে বলে রোশেনা।

—“রাখো তোমার জুবেদা রূপসী! তোমার রূপের নখ ধরবার যোগ্যতা নেই জুবেদার। বুদ্ধি না থাকলে রূপ! বুদ্ধিতেই রূপের জলুস।”

রোশেনা মুখ ফিরিয়ে একবার পেছনের আরশিতে নিজের মুখখানা দেখে দ্বিধাভরে বলে—"কি জানি রূপ আর আছে কিনা ?"

—"তুমি না জানো আর সবাই জানে, তাই তো বলছি। আমরা বাঁদী হলে কি হয় ? জওহরতের সঙ্গে দিবারাত্র বাস। দেখে দেখে ঝুঁটো সাঁচ্চা চিনতে ভুল হয় না। সুলতানের সুরা অন্ধ চোখে ঝুঁটো সাঁচ্চার জলুস সমান। কেবল নিত্যি নতুনের নেশা ! নইলে তোমার কাছে নতুন রূপসীর তুলনা ! দেখে এলাম তো সেদিন নিজের চোখে, চোখ ধরানোর মতো ওর আছে কি ?" রোশেনার সদ্য-জাগ্রত শোক মামুদার সহানুভূতির ভাষায় যেন তীব্রতম হয়ে ওঠে, চোখের কোণ্ বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ে ক'ফোঁটা অসংযত অশ্রু।

সত্যিই তো, কি আছে এমন অবন্তীমালার ? মামুদা মিথ্যে বলেনি, তম্রোল-এর চোখ নতুনত্বের চমকে অন্ধ। আসল নকল চিনবার সামর্থ্য নেই।

রোশেনার শোক উপভোগ করবার জন্যই হয়তো একটু থামে মামুদা। তারপর গলায় অধিকতর সহানুভূতি ঢেলে বলে—"প্রতিশোধ নাও সুলতানা, প্রতিশোধ নাও ! পঁয়জরের বদলি পঁয়জর !"

অশ্রুজড়িত বিস্মিতকণ্ঠে রোশেনা জিজ্ঞাসা করে—"প্রতিশোধ ! কার 'পরে ? কেমন করে ?"

সকৌতুক মৃদু হাসে মামুদা—"কার 'পরে আবার ? সুলতানের সোনার কলিজা ভাঙো। যেমন করে পায়ে দলে ভাঙছেন তিনি তোমাদের বেলোয়ারি কলিজা।"

মামুদার উত্তেজিত মুখের বলবার ভঙ্গিতে রোশেনার সমস্ত বুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভাবহীন বিহ্বলমুখে জিজ্ঞাসা করে—"নিকা বন্ধ ! সুলতানের নিকা বন্ধ করবে কে ! কেমন করে !"

বিজ্ঞের হাসি হাসে মামুদা—"শোননি গল্প আছে, একটি ক্ষুদ্র মশা পিল্‌শাহীকে পাগল করে চোরা-বালুতে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল ? বুদ্ধির বলই সাঁচ্চা বল। মামুদা বাঁদী সুলতানাদের পঁয়জর। তোমাদের আরাম-সফরের জন্য তপ্তবালুতে বুক পেতে দিতে নারাজ নয়। শিশমহল দাঁড়কাক বেহাত করা তো তুচ্ছ কথা।"

—"বেহাত !"

—"হ্যাঁ, বেমালুম সরিয়ে ফেলো ও জন্নাথকে, তাহলেই সুলতানের সোনার কলিজায় মোচড় খাবে। এতদিন যে টিয়া পুষেছেন সোনার দাঁড়ে মধু ছোলা দিয়ে, সে টিয়ার কপ্‌চানি যদি শুনতে না দাও, যদি টিয়া খাঁচার মুখ খুলে উড়িয়ে দিতে পার তবে সুলতানের সোনার কলিজা শোকে একেবারে চৌখান হয়ে যাবে!" হাতের ভঙ্গিতে বুকের চৌখানের পরিমাণ দেখিয়ে ছল্‌ছলিয়ে হেসে ওঠে মামুদা। রোশেনার বিহ্বল চোখের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে আবার সজোরে উচ্চারণ করে—"হ্যাঁ টিয়া উড়িয়ে দাও, আজই, আজই রাত্রে

উড়িয়ে দাও টিয়া। রৌশনচৌকিদাররা ঢোল কাঁসি ফেলে মুদ্দর কবরে ফেলুক।"

—"টিয়া ওড়াবে! কিন্তু কোথায়, কেমন করে!"

ক্রূর হাসি মামুদার কালো মোটা ঠোঁটের সাদা দাঁতে আরো বীভৎস দেখায়। বলে—"আছে, সে দাওয়া আছে মামুদার কাছে। সুলতানা রোশেনা নেকনজরের ইনাম কবুল করলে দেখাতে পারি।"

বিষণ্ণমুখে মণিখচিত ঝাপ্টা আর কণ্ঠের সোনার ধানবীজ কণ্ঠী খুলে এগিয়ে ধরে রোশেনা—"পুরস্কার চেয়ে আজ আর আমায় লজ্জা দিও না মামুদা। আজ আর রোশেনা সুলতানা নয়, সুলতানার বাঁদী। আজ বাঁদী রোশেনা তোমায় কি দেবে মামুদা? এই নাও, রোশেনার সামান্য স্মৃতি। এ আর কোন কাজে লাগে না আমার।"

কথার শেষে কম্পিত হয় রোশেনার কণ্ঠস্বর, ব্যথায় করুণ হয়ে জলে ভরে আসে আয়ত-চোখ।

উঠে বিনীত কুর্ণিশ করে মামুদা। বলে—"সুলতানের বেইমানী কলিজা তোমার জন্যে না কাঁদলেও মামুদা বাঁদীর দরদী কলিজা আজও তোমার পঁয়জরে মোতায়েন সুলতানা। মামুদা বাঁদীর কাছে আজও তুমি সুলতানাই আছো। কিন্তু বাঁদী মামুদা কাজ হাসিল না করে ইনামের জন্য হাত বাড়ায় না। মামুদা বাঁদী সুলতানা-রোশেনাকে আবার তার মজলিসি ঝুলায় বসিয়ে তার পুরনো মালেকানী বহাল করে সোনার পঁয়জর ইনাম নেবে, তার আগে নয়।"

লজ্জার ঝলক এসে রোশেনার সোনালী গণ্ড আরক্তিম করে তোলে। তাতো বটেই! আজ রোশেনাবাঁদীর হাত থেকে সুলতানা-আর্জিনার বাঁদী মামুদা হাত পেতে ইনাম নেবে, এমন অসম্ভব ভাবলো কেমন করে রোশেনা! অভিমানের আক্ষেপে মণির ঝাপ্টা, সোনার কণ্ঠী পালঙ্কের এক পাশে ফেলে রাখে।

রোশেনার মুখের বিষণ্ণতা লক্ষ্য করে মামুদা বলে—"তুমি ভুল বুঝো না সুলতানা। মামুদার লোভ বেশি বলেই আজকের ইনামের মুদ্দৎ বাড়তে দিলো। এইবার সুলতানের কলিজার জহরের কথা বলি, শোনো।"

সালোয়ারের ভিতরের জেব খুলে সন্তর্পণে বের করে ছোট্ট একটি রুপোর কৌটো। বলে—"এই দেখো, ডাব্বায় দুই বড়ি আছে। শিশমহলে তোমার হরদম আনাগোনা, কারাবাতে এক গুলী এখুনি গিয়ে ছল করে মিশিয়ে এস। আজ রাতে যদি জল পান করে তবে তো আজ রাতেই কাবার। নইলে এক গুলী তুমি নিজে নিয়ে যেও কাল প্রভাতের নাস্তায় তরবুজ সরবতে মিশিয়ে দিও।"

শুনে দু'পা পিছিয়ে যায় রোশেনা। ভয়ে বিস্তৃত করে আয়ত-চোখ। বলে—"বিষ! ও আমি পারবো না মামুদা!"

বাঁধভাঙা স্রোতের মতো আবার ছল্‌ছলিয়ে হেসে ওঠে মামুদা। —"নিষ্ক্রিয় নিজে তুষের আগুনে জ্বলে মরছো, আর জ্বলে একটা ছোট্ট গুলী ছেড়ে এই ধিক্কারের আগুন শেষ করে নিজে বাঁচতে পারবে না?"

—"না মামুদা, ও আমি পারবো না।"

মুহূর্তে ছল্‌ছলে হাসি শুকিয়ে যায় মামুদার, চোখে জ্বলে ওঠে রুদ্রের আগুন, বলে—"তবে তামাম জিন্দ্‌গী অবহেলার পঁয়জর খেয়ে চামড়া ঘা করে মর। আচ্ছা চলি আমি। কিন্তু······দেখো, মামুদার এ হজমি গুলীর সংবাদ যেন কখনো বদহজম না হয়। জেনো এ খবর দু'কান হলেই মামুদার কানেও আসবে। আর তা হলে সবার আগে তোমার পেটেই যাবে এ হজমি।"

দ্বার পর্যন্ত গিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে আবার বলে মামুদা—"তোমার ভালোর জন্যেই এসেছিল তোমার বেরাদার মামুদা। আর একটু ভালো করে নিজের জিন্দ্‌গীর কিস্‌মত ভেবে দেখো।"

বিচলিত হয় রোশেনার ক্ষুব্ধ মন। কিন্তু কি করবে রোশেনা? বিষ? না বিষ দিতে পারবে না রোশেনা, আপন দেশের মেয়ে অবন্তীমালার অসহায় কচিমুখে! কিন্তু···দ্বার উত্তীর্ণ হয়ে রোশেনার ভাগ্যে বিষ ঢেলে যে চলে যায় মামুদা! ঠিক! না, সেই বরং ভালো। সেই মুহূর্তে পথ দেখতে পেয়ে সহজ নিঃশ্বাস ফেলে মামুদাকে ডাকে রোশেনা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ফিরে চায় মামুদা।

—"ভেতরে এসো, কথা আছে। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।"

ফিরে এসে আবার মামুদা পাটীপোষে বসে।

—"বিষ দিয়ে বেচারীর প্রাণ কেন নেবে মামুদা? বরং বনের পাখী বনে ছেড়ে দাও।"

—"সে হবে না। পাখী বড় সেয়ানা। গিয়েছিলাম একদিন পাখীকে বনের পথ দেখাতে। দেখলাম, পাখী দু'দিন সোনার খাঁচায় বসে মেওয়া খেয়ে গলা ফুলিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছে। এমন মেওয়া মেঠাই ছেড়ে দিয়ে আবার বনের কুল খুঁজে খেতে পাখী নারাজ। এখন পথ দেখালেও পাখী স্ব-ইচ্ছায় যাবে না।"

—"যাবে মামুদা, আমি জানি পাখী যাবে।"

—"কোন কারসাজীতে যাবে, রোশনি বাতলাও।"

—"শুনেছ তো? এবার যুদ্ধে সুলতানের মন কিনেছে এক ব্রাহ্মণ যুবক, নাম রুদ্রতাপ। সেই রুদ্রতাপ ঐ শিশমহল-অধীশ্বরীর অধীশ্বর। গ্রাম ছেড়ে এসেছে ওর হারানো রাণীর সন্ধানে। সুলতান, কুলিশের অর্ধেক জায়গীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঐ যুবককে। এখন প্রাকাররক্ষী পদে নজরবন্দ হয়ে আছে! ছেড়ে দাও বনের পাখী বনের আকাশে, চলে যাক ওর ইষ্ট-

দেবকে বুকে ধরে। তুমি যদি কোনো কৌশলে দুর্গের বাইরে রেখে আসবার পথ করে দিতে পার, টিয়ার খাঁচা শূন্যের ভার আমার।"

ছল্ ছল্ করে হেসে অবিশ্বাসে মাথা দোলায় মামুদা, বলে—"তা কি কখনো যায়? আজ রাত কাবার না হতে যে সুলতানার পদ পাবে বলে জানে, সে কি সুলতানের কলিজা ছেড়ে প্রাকাররক্ষীর কুঁড়েয় জান রাখতে যায়? পুরনো প্রেমের এত জান থাকে না সুলতানা।"

বহু পূর্বে দেখা একখানি মুখ আভাসে বুঝি জেগে ওঠে রোশেনার মনে। একটু থেমে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলে—"তুমি জান না মামুদা, হিঁদুর মেয়ে শৈশবের প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে মরবার আশায় সাত সুলতানের ঐশ্বর্য তৃণের মতো পায়ে তুলে অবহেলার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারে।"

হতাশায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মামুদা। বলে—"হিঁদুর মেয়ের মন হয়তো জানিনে, কিন্তু মানুষের মন জানি। ফালতু কাজে সময় নষ্ট করে না মামুদা বাঁদী।"

পায়ের ঝুমরিপদ্ম উচ্চতালে বাজিয়ে চলে যায় মামুদা, আর ফিরে চায় না।

ক্ষুব্ধ মনে স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবে রোশেনা। হ্যাঁ, এমন একদিন গিয়েছে যখন অবন্তীমালা রুদ্রতাপের বুকে ফিরে যাক, তা সে চায়নি। কিন্তু আজ রোশেনা চায়, চলে যাক তত্রোল-নয়নমণি শিশমহল-রূপসী, যে নামে হোক, যেমন করে হোক। শিশমহল শূন্য করে বিদায় হোক দর্পিণী। কাঁদুক তত্রোল, অন্ততঃ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলুক, ফেলুক আশাহত দীর্ঘশ্বাস!

তৃতীয় প্রহরের মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাঘরের ঘণ্টাও বেজে ওঠে। অ্যাঃ! রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হলো! তত্রোল এখন কোথায়? শিশমহলে না খাসনিদ্‌মহলে? যাকগে, হোক না যেথায় খুশি, তাতে রোশেনাবাঁদীর কি? উঠে দাঁড়ায় রোশেনা! দ্বার বন্ধ করে শুয়ে পড়া যাক। কিন্তু বন্ধ করতে এসে আর বন্ধ করা হয় না, দ্বিতীয়বার বিস্মিত করে মামুদা! জিজ্ঞাসা করে—"আবার যে কষ্ট করে এলে?"

—"হুঁ, থাকতে পারলাম না। তোমার অসহায় কিসমত-এর কথা ভেবে ভেবে ঘুম হচ্ছিল না, তাই গেলাম বড় সুলতানার খাসমহলে। সুলতানাকে বললাম তোমার নাজুক-দিলের কথা। সুলতানা শুনে তোমার 'পরে খোশ হয়েছেন। তাঁরও তো মেজাজ না-খোশ, শিশমহলে নিত্যি নতুন ইঁদুরের দৌরাত্ম্য দেখে। সব শুনে বললেন, 'সেলাম দিয়ে আয় আমার রূপসী দুঃখিনী বোনকে। কেন বৃথা দুঃখ পাবে? দেখি যদি ওর ভাঙা কলিজার সুরাহা করতে পারি।' বড় সুলতানার মগজ বড় সাফ্‌সফা। সুলতানার ফরমাইশ যদি ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে পার সুরাহা নিশ্চয় হবে। চল আমার সঙ্গে সুরৎ-তসবীর নিয়ে, সুলতানা-মহলে তোমার আরামচৌকি হাজির।"

দ্বিধাগ্রস্ত রোশেনা অধোমুখে কিছুক্ষণ ভাবে। যাবে! হ্যাঁ, যাওয়াই হয়তো উচিত। একদিন শিশমহলের আদরিণী রোশেনা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছে সুলতানার ডাক, কিন্তু আজ বাঁদী রোশেনার সুলতানার ডাক উপেক্ষা করা কি উচিত হবে? না, যাওয়াই হয়তো উচিত। নিঃশ্বাস ফেলে বলে—"চল মামুদা, তাই না হয় যাই।"

বড় খাসমহলের বিশ্রামকক্ষে, রুপোর সিংহমুখ পায়াদার হাতীর দাঁতের মসলন্দ-পোষে মখমলের মোতিদার ঝালরযুক্ত তাকিয়ায় দেহ রেখে অর্ধশায়িতা সুলতানা অলক্তরঞ্জিত বিম্ব থেকে সোনার ফুরসির সোনার নল নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ চোখ মেলে অনেকক্ষণ রোশেনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। এমন রূপসীও আজ আর মন রাখতে পারে না সুলতানের! রোশেনাও স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করে সুলতানার রূপ! কিন্তু সে-রূপ আজ যৌবনের সীমান্তে এসে যত্নে-পালিত কুকুরের মতো বার্ধক্যে অবহেলিত হয়ে রুক্ষ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে! বঞ্চিতার ক্ষিপ্ত-বিলাসের কালিমা আয়ত-চোখের কোণ থেকে মুছে নিয়েছে শ্রদ্ধার আকর্ষণ। তীক্ষ্ণ খড়্গ-নাসিকার 'পরে কুঞ্চিত রেখায় বঞ্চিতার অতৃপ্তি লাঞ্ছিত। অলক্তরঞ্জিত পাতলা ঠোঁটের পাশে উপেক্ষিতার নিয়ত আক্ষেপের কর্কশ কুঞ্চিত রেখায় প্রতিহিংসার লোভ স্পষ্ট ধরা পড়ে! সুরা-রঞ্জিত চোখ তুলে আর মুখে অনুগ্রহ-মাখা হাসি এনে বলেন সুলতান—"এখনও তোমার নূর প্রতি অঙ্গ সিক্ত করে রেখেছে সুন্দরী! দুর্ভাগ্য, তুমি এত শীঘ্র সুলতানের সোহাগবঞ্চিতা হয়ে উপেক্ষার পয়জরে বুক পেতে দিয়েছ!"

রোশেনাকে বার • বার কুর্ণিশের নিয়ম ইশারায় স্মরণ করিয়ে দেয় মামুদা। কিন্তু রোশেনার দৃষ্টি তখন অন্যত্র নিবদ্ধ—একমনে নিরীক্ষণ করছে বড় খাসমহলের শোভা। সুউচ্চ কক্ষের বরগা থেকে রুপোর শিকলে বিলম্বিত রয়েছে সারি সারি রঙদারবেলোয়ারি গেলাশ! রঙদারগেলাশের মোহময় কৌশলী রঙিন আলোয় রোশেনার মনে হয়, এ যেন ঐশ্বর্যে-ঘেরা স্বপ্নের দৈত্যপুরী! হাতীর দাঁতের জাফরি-ঘেরা অলিন্দের গায়ে ধান্য ও গুঞ্জা মালায় বাঁধা দণ্ডক ফুলের গুচ্ছ। কোণে কোণে মর্মর নগ্ন মূর্তির হাতে বা মাথায় দীপাধার কিংবা ফুলের স্তবক! দেয়ালের খিলান ঘিরে ঝুলছে কিংখাপের ঝালরযুক্ত মখ্‌মল্‌বেলদার। ফুলদার রেশমী গালিচায় মোড়া মেঝেয় সারি সারি বসান রয়েছে রুপোর বাঘ এবং হাতীমুণ্ডের পায়াদার, হাতীর দাঁত ও চন্দন কাঠের কারুকার্যময় তক্তা-আঁটা শেরপোষ। সুলতানার রুপোর সিংহমুখ পায়াদার হাতীর দাঁতের মসলন্দপোষের পাশে পাশে আখরোট কাঠের কারুকার্যময় সরাব-ই-সোরাহী সরাব-ই-চৌকির উপর অপেক্ষা করছে। রুপোর মণিখচিত সোরাহী-এর পাশে অবহেলায় গড়াচ্ছে ক'টা সোনার পানপাত্র।

রোশেনার বিস্মিত মুখ লক্ষ্য করে ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটিয়ে বলেন সুলতানা—"বস এই শেরতক্তে, কথা আছে।"

সুলতানার নির্দেশিত নিকটস্থ বাঘমুণ্ড শেরতক্তে এসে বসে রোশেনা। পাশের রুপোর সরাব-ই-সোরাহী থেকে স্বর্ণ গেলাশে সুরা ঢেলে দেয় মামুদা, পানপাত্র শেষ করে পানদান থেকে সুগন্ধি পানের খিলি মুখে দিয়ে ফুরসির নল ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলেন সুলতানা—"শুনলাম, শিশমহলের নতুন টিয়ার এক পুরনো জান নাকি ডিভার-ই-শাহ্র মুস্তাফিজ্ হয়েছে?"

—"হ্যাঁ সুলতানা।"

—"আর তুমি সে-কথা জেনেও এতদিন তোমার ঝুলা-মজলিসির পুরনো মালেকানীর দখল নিতে পারনি!" ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসির আভাস ফুটিয়ে চোখ বুজে ফুরসিতে মৃদু টান দেন সুলতানা।

বিস্মিত রোশেনা তখনও সুলতানার রূপ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করছে। সুলতানা চোখ খুলে মামুদার দিকে দৃষ্টি ফেরান। আর এক পাত্র সুরা ঢেলে এগিয়ে ধরে মামুদা। রোশেনার বিস্মিত দৃষ্টি বিস্মিততর করে সোজা হয়ে উঠে বসে পানপাত্র নিঃশেষ করেন সুলতানা। আবার তাকিয়ায় দেহ রেখে ফুরসির নল ঠোঁটে ছুঁইয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেন—"বাঙলার মেয়েদের মন একেবারে কিচ্ছু না। নোনা জলের ফেনার মতো মন নিয়ে পাষাণ সুলতানের সুলতানী করা যায় না।"

মনে মনে হাসে রোশেনা। পারস্যের পাথর-মন নিয়েই বা সুলতানের ওপর কতটা সুলতানী করছো উপেক্ষিতা?

সুরাবিবশ দেহ মখমলের তাকিয়ায় ভালো করে ডুবিয়ে দিয়ে বলেন সুলতানা—"শোনো সুন্দরী, নিছক তোমার মায়ায় কাতর হয়েই তোমায় বড় খাসমহলে ঢোকবার সম্মান দিয়েছি, এমন কথা বলবো না। আমারও স্বার্থ এতে জড়িত। সুলতানা মহল্লা আমি অচিরে নারীশূন্য করতে চাই, বুঝলে? সবাইকে যেতে হবে একে একে। শিশমহলের নতুন টিয়া আমার প্রথম শিকার। সোজা পথেই নিঃশেষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে যখন অন্য উপায় আছে, তখন সেই পথই বেশি নিরাপদ মনে হলো। মহলের মধ্যে নতুন জান কাবার হয়েছে দেখলে সুলতান হয়তো মহল্লা সমেত কবর দেবেন। তার চাইতে তোমার পথই ভালো।"

মামুদাকে ইশারা করেন সুলতানা। মামুদা দু'পাত্র সুরা ঢেলে একপাত্র সুলতানাকে দিয়ে, অপর পাত্র রোশেনার দিকে এগিয়ে ধরে। সুরাপাত্র হাতে নিয়ে জড়িতকণ্ঠে বলেন সুলতানা—"খাও, এটা খেলে বুদ্ধির ছোট ছোট খিড়কিগুলো পর্যন্ত খুলে যায়। প্রচুর আলো পেয়ে বুদ্ধির অন্দরমহলের ঘুমন্ত হুরীগুলো জেগে উঠে চটপট্ কাজ করে।"

উঠে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে বিনীত কুর্ণিশ করে রোশেনা। সরাব দিয়ে সমাদর

করা মানেই ইয়ার বলে স্বীকার করে নেওয়া। রোশেনাকে তাহলে ঠিক বাঁদী মনে করছেন না সুলতানা। বিনীতকণ্ঠে বলে—"না সুলতানা, শিশমহল ছেড়ে আসবার পর থেকে ওটা আর খাই না।"

—"ভালো করোনি, এর বড় গুণ হলো জগতের অতি বড় নিষ্ঠুরতাকেও বিস্মৃত করে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া।" বলে নিজের পাত্র নিঃশেষ করেন সুলতানা। তারপর আবার বিবশকণ্ঠে উচ্চারণ করেন—"হ্যাঁ যা বলছিলাম, আজ রাত্রেই তোমাকে এক কাজ করতে হবে।" উঠে বসে হাতের তালিতে সঙ্কেত করেন সুলতানা। সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দের পাশের ফোকর থেকে বেরিয়ে আসে দুই সাদা ময়ূরী পায়রা। উড়ে এসে সুলতানার কাঁধে বসে। সাদরে পায়রার মুখ চুম্বন করে বলেন সুলতানা—"মরকত, মোতি, চিনে রাখ এই সুন্দরীকে। এখন যা, সুলতানের পাঞ্জা নিয়ে আয়।"

কথাটা শুনেই ঝট্‌পট শব্দে কক্ষের সুউচ্চ খিলানের কিংখাপের ঝালরের আড়ালে লুকোয় পারাবত-দম্পতী। পরক্ষণেই ঠোঁটে ধরে নিয়ে আসে সুলতানের আদেশ অঙ্কিত মোহর। তাম্রখণ্ড হাতে নিয়ে বলেন সুলতানা—"এই দেখো, সুলতানের পাঞ্জা কৌশলে সংগ্রহ করেছি। সাবধান! কেউ না জানতে পারে। আজ রাত্রেই এটি সেই মুস্তাফিজ-এর হাতে দিয়ে আসবে। কৌশলে মন গলিয়ে বলবে, এ পাঞ্জা যার হাতে থাকবে প্রাসাদে তার অবাধ গতি। শিশমহলে রয়েছে তাঁর বিরহাকুল বিবিজান। সেই বন্দিনী বিবিজান মরণপণ করে এ পাঞ্জা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। কালই তার সঙ্গে সুলতানের নিকা। তার পূর্বে তিনি যেন অসহায়া বিবিজানকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এই নাও পাঞ্জা—বাইরে যাবার অনুমতির নিদর্শন আর আমার এই অঙ্গুরীয়—ফেরবার পথের নিশানা। সঙ্গে থাকবে আমার ঘুঙুর বাঁধা কবুতর। ওরা সর্বক্ষণ তোমার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং সর্বাবস্থায় তোমাকে রক্ষা করবে।"

দ্বিধাকম্পিত হাতে পাঞ্জা ও অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে রোশেনা। সুলতানার ইশারায় আর একপাত্র সুরা ঢেলে দেয় মামুদা। সুরাপাত্র হাতে নিয়ে উঠে বসলেন সুলতানা। জড়িতকণ্ঠে আজ্ঞা করলেন—"যাও রাত্রি ভোর হয়ে এল, আর দেরী করলে নিকা রোধ করা সম্ভব হবে না। মলিন ছিন্ন বোরখায় নিজেকে ভালো করে আবৃত করে পথে বেরিও। মনে রেখো সুলতানা-মহল থেকে কিল্লার পথে বেরোলেই রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি পিছু পিছু চলে, তা ছাড়া আজ সুলতানের নিকা যদি কিল্লায় প্রচারিত হয়ে থাকে, তাহলে সারা পথ হয়তো খুবই সরগরম থাকবে।"

কুণ্ঠিত কম্পিতকণ্ঠে বলে রোশেনা—"কিন্তু…"

—"আর কিন্তু নয়, সুলতানের পাঞ্জার খবর জেনে পিছু হটা যায় না। যাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাজ হাসিল করে ফিরলে ঝুলামজলিসির

মালেকানী তোমার কায়েম করে দেবো। আর তার উপর পাবে সুলতানা আর্জিনার জেবরতহ্‌বিলের অর্ধেক। কিন্তু কাজ হাসিল করতে না পারলে সুলতানার শাস্তি অতি কঠিন। মনে রেখো এ কাজের সফলতা-বিফলতার ওপর তোমার ও আমার শুভাশুভ নির্ভর করছে। যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকে আমার মেজাজ নাখোশ করো না।"

ভীত অশ্রদ্ধ মনে কুর্ণিশের ভঙ্গিতে সামান্য দেহ হেলিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে চলে যায় রোশেনা।

পানপাত্র নিঃশেষ করে মামুদার দিকে ফিরে সুরা-রঞ্জিত চোখে সকৌতুক কটাক্ষে জিজ্ঞাসা করেন সুলতানা—"তারপর ?"

—"তারপর আর কি সুলতানা ? এবার মামুদাবাঁদীকে ঐ বাঁদীটার ওপর নজর রাখতে হবে। আর সেই লোভী কুত্তাটার হালচাল দেখে ঠিক সময় মতো সুলতানের খাসে খবর পেশ করতে হবে—যাতে শুক শারির এক মাটিতে কবর হয়।"

—"উহুঁঃ। এক মাটিতে নয়, দুই কবরে দুই গুদ্দর যাবে। মরেও যাতে এই শুক শারি এক মাটি না পায় তাই করতে হবে।"

—"তাই হবে সুলতানা। তুমি কিছু ভেবো না। সুলতানের দরবারে খবর সময় মতো পেশ করতে পারলেই তো হলো। সুলতান নিজের চোখে যদি দেখতে পান তখন আর তাঁর নতুন টিয়ার জন্যে শোক থাকবে না। হয়তো দুই মদ্দইয়ের আলাদা কাঁটার কবর হুকুম···"

হাত তুলে অধৈর্য হয়ে মামুদাকে নিরস্ত করেন সুলতানা। তারপর বলেন—"তবু শোক থাকবে রে, শোক থাকবে। সুলতান এত আয়োজন করছেন, ভেবেছেন ক্ষীরপুরিয়া রসে ফেলে খাবেন। সে-ক্ষীর পোড়া জানলেও নিজের হাতে মাটিতে পুঁততে শোক হবে বৈ কি ? আর সুলতানের শোকই যদি না হলো তাহলে আমার এত আয়োজন যে সবই বৃথা।"

—"আহা সুলতানা, তোমার মনের বেলোয়ারিতে যত তর-বে-তর খোশ-চেরাগ সাজিয়েছ তার সব ক'টা শিসই জলবে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। কিন্তু এখন হুকুম হলে এ বাঁদী কি বিদায় নিতে পারে ?"

—"কোথায় যাবি ?"

—"রোশনি-বরদারণীর বোরখাটা আনতে, বাঁদীটার পিছু নিতে হবে না ?"

—"আঃ, তোর ছাতি আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো মামুদা, তুই আমার মনের কথাটি না বলতেই এমনভাবে বুঝে ফেলিস !"

বিনীত কুর্ণিশ করে মামুদা বলে—"সুলতানার নেক-নজর।"

—"আচ্ছা, তবে তুই এখন যা। সাবধান, দেখিস কোনো ফাঁকে কারসাজী যেন ফসকে না যায়।"

কুর্ণিশ করে দাঁড়িয়ে মাথায় আঙুলের আঘাত করে মামুদা। বলে—

"এখানে যেটুকু যা পেয়েছি সে তো তোমারই ইনাম।" চলে যায় মামুদা।

আর একপাত্র সুরা ঢেলে নিয়ে তরল হাসি হাসেন সুলতানা। উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—"ময়ুর ময়ূরী সব পুড়ে ছাই হোক! শেষ হয়ে যাক যত প্রেমের কূজন!"

সুলতানের নিকার সংবাদ ঢাকী প্রচার করে চলেছে ঢাকে কাঠি দিয়ে। চলতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে রুদ্রতাপ। ভাবী সুলতানার নাম ঘোষণায় না থাকলেও রুদ্রতাপ ঢাকীর প্রত্যেকটি কাঠিতে যেন শুনতে পায় একান্ত প্রিয় সেই অনুচ্চারিত নাম। কাছে এসে দাঁড়ায় অপর প্রাকাররক্ষী—প্রভঞ্জন। রুদ্রতাপের একাগ্র দৃষ্টি অনুসরণ করে ঢাকীকে দেখতে পেয়ে বলে—"সুলতানের নিকা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু এবার যেন সাজসরঞ্জামটা একটু বেশি। বাজারে গুজব, ভাবী সুলতানার রূপের তেজেই নাকি এই আধিক্যের কারণ।" রুদ্রতাপের অনুমোদনের আশায় একটু বেশি জোর দিয়েই হাসে প্রভঞ্জন। কিন্তু রুদ্রতাপকে অন্যমনস্ক ও নিরুত্তর দেখে কথাটা পুনরুক্তি করে।

ভাবহীন চোখ তুলে প্রশ্ন করে রুদ্রতাপ—"কি বললে?"

—"বলছি, সুলতানের নিকার তোড়জোড় দেখেই যে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লে, নিকার দেবীর রূপের তেজ দেখলে তো বেহুঁশ হয়ে পড়বে দেখছি!"

—"নগরে নতুন এসেছি, নগরের চাল-চলন হাঁক-ডাকে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি কি না?"

বিজ্ঞের হাসি হাসে প্রভঞ্জন—"তা অবশ্য প্রথম প্রথম অমন একটু হয়। তবে এবার সুলতানের বাড়াবাড়িটা একটু বেশি বলেই যেন মনে হচ্ছে?"

—"তাতো হয়েই থাকে। আত্মবিশ্বাস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আসে পদমর্যাদাবোধ, পদমর্যাদাকে অনুসরণ করে চলে জাঁকজমক আর সাজ-সজ্জা।"

—"তা বটে, তবে এবার নিকার এত ঘটার কারণ শুনছি নাকি ভাবী সুলতানার রূপ! সেই তিলোত্তমার রূপের মর্যাদা রক্ষার জন্যই রাত দুপুরে এই লোক-হয়রাণি! তা নিকা করবি বাপু দু'দিন আগে বললেই হয়! কর না বাবা যত ইচ্ছে ধূমধাম। কিন্তু লোককে এমন মরণ-শিয়রে দাঁড় করিয়ে না রাখলে সুলতানদের কি আনন্দ জমে? লোকের টুঁটি টিপে রাত্রি দিন মৃত্যুদণ্ডে না টাঙিয়ে রাখলে সুলতানদের কি সুলতানীর বাহার হয়!" প্রভঞ্জন বলে চলেছিল আপন মনের আবেগে। কিন্তু হঠাৎ রুদ্রতাপের বিষণ্ণ বিবর্ণ ভাবহীন মুখ লক্ষ্য করে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"বলি তোমার কি হলো হে?"

চমক ভেঙে মৃদু হাসে রুদ্রতাপ। উত্তর দেয়—"না কিছু না, বল, সব শুনছি। তারপর?"

—"তারপর আর কি? এবার কুলিশ খাঁ'র কবল থেকে যেটিকে উদ্ধার করে এনেছেন, তিনি নাকি একেবারে তিলোত্তমা বন্দিতা! সুলতানের নবপত্নী গ্রহণ এ পর্যন্ত ছ'মাস অপেক্ষা করেনি কখনো। কিন্তু এবার উর্বশী এসে সেই অসম্ভব সম্ভব করেছেন। সুলতানার আসনে বসবার আগেই এই! পরে না জানি কি ঘটবে!"

রসিকতাটা উচ্চাঙ্গের হয়েছে মনে করে জোর দিয়ে হাসে প্রভঞ্জন। অন্যমনে মলিন হেসে বন্ধুত্ব রক্ষা করে রুদ্রতাপ। রুদ্রতাপের হাসিতে উৎসাহিত হয়ে প্রভঞ্জন আবার বলতে শুরু করে—"যাক বাবা, জীবনের ভাঁটায় রূপসীর রূপে চোখ হারিয়ে ক'টা দিন মানুষকে সুখে শান্তিতে থাকতে দিলে বাঁচা যায়। যুদ্ধ লুণ্ঠন থেকে বিরত করে সুন্দরী যদি সুলতানকে অঞ্চলে আবদ্ধ করতে পারেন তবেই রাজ্যের লোক রূপসীকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবে।"

এত কথার পরও নিরুত্তর রুদ্রতাপকে অন্যমনস্ক দেখে নিতান্ত হতাশ হয়ে বর্শা কাঁধে টহল দিতে চলে যায় প্রভঞ্জন। স্থির অপলক নিষ্প্রভ চোখে দুর্গের পথে ব্যস্ত কর্মচারীদের প্রতি চেয়ে থাকে রুদ্রতাপ। আজ! আজই তাহলে শেষ, আর মাত্র কয় দণ্ড! উষার আলোককে রুদ্ধ করবার শক্তি তো বজ্রেরও নেই! উষার আলোর সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্রতাপের বজ্র সাক্ষী করা অবন্তীমালা হবে তন্ত্রোল-এর। রাত্রি প্রভাত হলেই সে হবে পরস্ত্রী! না, আর ভাবতে পারে না রুদ্রতাপ।

মুক্ত বায়ুর নিঃশ্বাসে দেহ কী এত হাল্কা হয়! মনে হলো যেন উড়ে চলেছে রোশেনা। সভয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঝাড়ুদারণীর ঘরওয়ালী কালো মোটা বোরখা আর অপর হাতে প্রাণপণে চেপে ধরে ঝাঁটাটা। নিজের কালো মখমলের ফুলদার বোরখা পরে বেরোতে সাহস করেনি রোশেনা সুলতানের নিকা-মুখর দুর্গের পথে। লোকের চোখ পড়বে। মহলওয়ালীকে কিল্লার পথে একলা দেখতে পেলে কথা উঠবে। কে জানে শেষে কতদূর অবধি গড়াবে তার প্রতিক্রিয়া। তাই বোরখার মাপ দেখবার ছল করে চেয়ে নিয়েছে ঝাড়ুদারণীর বোরখাটা। কিন্তু হলোই বা ঝাড়ুদারণীর মোটা বোরখা, তবু তার ভেতর দিয়ে এমন করে গায়ে বিঁধছে কেন গ্রীষ্মের মৃদু বাতাস! রোশেনা গৃহস্থের বৌ, এই তো সেদিনও গাঁয়ের ঘাটে জল আনতে যেতো 'মনোমোহিনী'-রূপে। শীতের বাতাসও তো কখনো এমন করে শিহরণ জাগায়নি! মুক্ত বায়ুর নিঃশ্বাসে বুকে এমন চাপও ধরেনি আর পায়ে পা জড়িয়ে ধরে এমনভাবে পথ চলতে কখনও বাধা পায়নি! আরো শক্ত করে

চেপে ধরে মৃদু বাতাসে আন্দোলিত বোরখা। রোশেনার এই নিরাশ্রয় অনুভূতির মধ্যে তুচ্ছ বোরখাটা যেন মস্ত বড় এক আশ্রয়স্থল মনে হলো। এ যেন মুক্ত বায়ুর নিঃশ্বাস হরণকালে বদ্ধ বায়ুর ক্ষীণ আশ্বাসের মতো এক বিরাট পরিহাস!

সুলতানের নিকা। পথে কত লোক মশাল জ্বেলে দেবদারু পাতার মঞ্চে রঙীন নিশান সাজাচ্ছে। পথের বাঁকে বাঁকে থাসগেলাশ পূর্ণ করে দিচ্ছে তেল। মোটা পলিতা জ্বলছে। ঝল্‌মল্‌ করছে সারা দুর্গ পথ। কেউ কেউ ব্যস্ততার মধ্যেও চকিতে চেয়ে দেখছে রোশেনার বিবশ পায়ে পথ-চলার প্রচেষ্টা। কেউ কি সন্দেহ করছে! সভয়ে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে রোশেনা বোরখার আঁখ-রোশনাই-জালের ফুটো দিয়ে। না, ব্যস্ত লোকের দৃষ্টি এখন তত প্রখর নয়। হঠাৎ সুলতানের হুকুম পেয়ে রাত শেষ না হতেই কাজ শেষ করতে ব্যস্ত। কেউ মন দিয়ে তাকে দেখছে না। আনমনে দেখে লোক হয়তো ভাবছে, সুলতানার শিশমহল সাফ্‌ করে চলেছে ঝাড়ুদারণী। অনুসন্ধানী লোকও ঘনায়মান বিপদের আশঙ্কায় সন্ধানী দৃষ্টি হারায়! যাক, ভগবান রক্ষা করেছেন! ঐ বুঝি দেখা যায় দীর্ঘ কালো ছায়ার মতো সুউচ্চ দুর্গপ্রাকার! একটু দাঁড়িয়ে আশ্বাসের নিঃশ্বাস নেয় রোশেনা। মাথার উপরে হঠাৎ ঘুঙুরের শব্দে চমকে ওঠে। ওঃ, সুলতানার পায়রা! দাঁড়াতে দেখে বুঝি তাড়া দিচ্ছে! ওঃ, ভুলেই গিয়েছিল রোশেনা ওই দুই প্রহরীর কথা! আসছে সঙ্গে সঙ্গে! রোশেনার বিশ্বাসহারা গতিবিধি দেখলে হয়তো গিয়ে তক্ষুনি সুলতানাকে সংবাদ দেবে! সামান্য পায়রারও সুলতানপ্রাসাদবাসী হয়ে অনিষ্ট করবার শক্তি কত অসীম! নিঃশ্বাস ফেলে আবার চলতে আরম্ভ করে রোশেনা—পায়রারাও ঘুঙুর বাজিয়ে উড়ে যায় দূরে, আর সাড়া পাওয়া যায় না। প্রাকারের কালো ছায়া স্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু···রুদ্রতাপকে রোশেনা চিনবে কেমন করে? রুদ্রতাপের রূপ বর্ণনা দূতের মুখে শুনেছে মাত্র! ছিঃ, ঈর্ষার অন্ধকারে দৃষ্টি হারিয়ে এ-কথাটা আগে তো ভেবে দেখেনি রোশেনা। হ্যাঁ, ঈর্ষাই রোশেনার দৃষ্টি হরণ করেছিল। নইলে এমন কাজ কেউ ঘাড় পেতে কখনো নেয়? মামুদা, আর আর্জিনা তাদের কালো নিঃশ্বাসে সে অন্ধকার আরো গাঢ়তম করেছে! নাঃ, ঈর্ষা হবে কেন? এ তো অবন্তীমালার পক্ষেও শুভ। কেননা এ তো তারও একান্ত কাম্য। রোশেনার শুভ হোক আর নাই হোক, অবন্তীমালার যে এতে শুভ হবে তাতে তার সন্দেহ নেই। দুর্গের পরিচ্ছন্ন আলোকিত পথ ছেড়ে এতক্ষণে প্রাকারের অন্ধকার ছায়ায় পা দিয়েছে রোশেনা। বড় অন্ধকার মনে হয়! বুকের দুরু দুরু আরো দ্রুত তালে চলতে থাকে। মনে হয় এ অন্ধকারে রোশেনা বড় একা! কিন্তু রোশেনা তো একা নয়, তার মাথার উপর দিয়ে অলক্ষ্যে এসেছে খবরদার কবুতর আর পেছনে পেছনে অলক্ষ্যে ছায়ার মতো এসেছে এক রোশনি-বরদারণী। আর যেন

পা চলে না! অবশেষে প্রাকারের নিচে এসে দাঁড়িয়ে সভয়ে লক্ষ্য করে চারিধার।

দূর থেকে অন্ধকার এক মূর্তি দেখে দড়ির সিঁড়ি ফেলে দ্রুত নেমে আসে প্রাকাররক্ষী। বোরখা-ঢাকা মূর্তি দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে—"আপনার পরিচয়?"

পরিশ্রান্তি ও উত্তেজনায় নিঃশ্বাস থেমে আসে রোশেনার। অস্ফুটকণ্ঠে বলে—"স্ত্রীলোকের আর পরিচয় কি? তবে মহোদয়ের পরিচয় পেলে সামান্যা নিজ পরিচয় দিতে পারে।"

রুদ্রতাপ সতর্ক হয়। বলে—"সুলতানের রাজধানীতে সামান্য প্রাকার-রক্ষীর সবিশেষ কোন পরিচয় থাকে না, তবে অধীনের নাম রুদ্রতাপ ভট্ট। আপনি কোন প্রয়োজনে প্রাসাদ পরিত্যাগ করে প্রাকার পর্যন্ত এসেছেন জানতে পারলে, এ অধীন রক্ষীর কর্তব্য পালন করে ধন্য হবে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রোশেনা উত্তেজিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—"আপনিই রুদ্রতাপ ভট্ট! ভগবান সত্যিই করুণাময়। তিনিই অপর কোন রক্ষী না হয়ে আপনারই সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটালেন। আমার প্রয়োজন মহোদয়ের সঙ্গেই। কিছু গোপন কথা আছে। কিন্তু এ স্থান নিরাপদ তো?"

—"দুর্গের মধ্যে গোপনতার জন্য কোন স্থানই নিরাপদ নয়, বিশেষতঃ আজ সুলতানের নিকা-উৎসব প্রস্তুতিতে দুর্গের সর্বত্র এখনও জাগ্রত। তবে এ-স্থান আলোকহীন ও নির্জন—এজন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।"

—"নিরাপদ-আপদ বিবেচনার আর অবসর নেই। বিপদ সম্মুখে থাকলেও ততোধিক বড় বিপদের কাহিনী এখনই আপনাকে আমার বলা প্রয়োজন। কারণ, নিকা-উৎসবের পূর্বেই সেই আপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য আমাদের আয়োজন নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।"

—"আয়োজন! কিসেব আয়োজন! কার বিপদ!" বিস্মিত হলেও এবার রুদ্রতাপের কণ্ঠস্বর নিম্ন। কেননা রক্ষীর তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়েই সে অনুভব করে নিকটবর্তী কোন অদৃশ্য মানুষের চাপা নিঃশ্বাস!

উত্তরে রোশেনা জবাব দেয়—"আমার সকল কথায় যথাযথ উত্তর পেলে পর সবই আপনার নিকট ব্যক্ত করা হবে।"

—"অধম সাধ্যমতো আপনার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করতে ত্রুটি করবে না, বিশ্বাস রাখতে পারেন।"

—"মহোদয়ের বিনয়ে মুগ্ধ হলো অবলা!" একটু থেমে আবার বলে রোশেনা—"আচ্ছা—প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করি: সুলতানের এই নিকা-উৎসবে আপনিও কি উৎসাহিত?"

—"সুলতানের প্রাকাররক্ষীর পক্ষে প্রভুর উৎসব আনন্দে সমভাবে উৎসাহিত ও আনন্দিত হওয়াই তো স্বাভাবিক।" কৃষ্ণা দশমীর অস্তগমনোন্মুখ

চন্দ্রের ক্ষণিক দীপ্তিতে রুদ্রতাপের মুখ বোরখার ভিতর দিয়ে নিতান্তই অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। কিন্তু রুদ্রতাপের কণ্ঠস্বর বড়ই করুণ শোনায়।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে প্রশ্ন করে রোশেনা—"নিকা কার সঙ্গে তা কি আপনি জানেন ?"

—"সুলতানের নিকা কখন কার সঙ্গে তা কি সামান্য প্রাকাররক্ষীর পক্ষে জানা সম্ভব ? তবে শুনেছি, কোনো নবাগতা পরমারূপসীর সঙ্গে।"

—"সে পরমারূপসীর পরিচয় শোনেননি ?"

—"সুলতানের ঘরণী সুলতানা, তার চেয়ে বেশি জানবার সম্ভাবনা থাকে না প্রাকাররক্ষীর। প্রয়োজনও ঘটে না।"

—"সব জানাই কি প্রয়োজন মাফিক ঘটে থাকে ? তবু মানুষের কৌতূহলী মন না জেনে থাকতে পারে না। যাক, এখন শুনুন : সেই পরমা রূপসী ভাবী সুলতানাই হলো কুলিশ খান-অপহৃতা কুশীগ্রামের অবন্তীমালা।"

—"ও···।" ছোট্ট শব্দটুকু নিতান্ত অবহেলায় উচ্চারণ করে রুদ্রতাপ।

মুখ না দেখেও ঐ সামান্য শব্দটুকুর উচ্চারণ শুনেই অনুমান করে রোশেনা : ইনিও দেখছি খুব সেয়ানা। মনে মনে অনুভব করে—বড় শক্ত বাঁশ, সহজে নত হবার নয় ! তবু কণ্ঠে আকুতি এনে প্রশ্ন করে—"আপনার কি এখনও অবন্তীমালার জন্য বেদনাবোধ আছে ?"

উদাসকণ্ঠে রুদ্রতাপ উত্তর দেয়—"একজন সামান্য প্রাকাররক্ষীর প্রতি এমন প্রশ্ন নিরর্থক।"

—"ছলনা করবেন না মহোদয়। আমি জানি, আজও আপনার হৃদয় অবন্তীমালার দুঃখে দুঃখ অনুভব করে। এবং তা নিশ্চিত জেনেই এই দারুণ দুঃসময়ে অবন্তীমালা এ অধমাকে আজ আপনার নিকট সাহায্য ভিক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন।"

—"দুঃসময় !" রুদ্রতাপের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় আর উদ্বেগ। "আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে যিনি সুলতানার সিংহাসনে বসবেন তাঁর দুঃসময় কেন ?"

রুদ্রতাপের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর উপভোগ করে মনে মনে হাসে রোশেনা। তার মনের গতি কুটিলতর হয়। রুদ্রতাপকে আরও প্রলোভিত করবার উদ্দেশ্যে কণ্ঠে অধিকতর ব্যাকুলতা এনে রোশেনা বলে—"আজকের রাত্রি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটান্ধকারপূর্ণ রাত্রি। আপনি তাঁর একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই আজ এ দুঃসময়ে আপনার বীর হৃদয়ের দাক্ষিণ্য যাচ্ঞা করে পাঠিয়েছেন এ বাঁদীকে। আমি শিশমহলের বাঁদী আর অবন্তীমালা শিশমহল-বন্দিনী। এই সুদীর্ঘ দিনরাত্রি প্রতি মুহূর্তে তিনি বন্দীশালা থেকে মুক্তিপথ খুঁজছেন আর চোখের ধারায় নির্জন হৃদয়ে আপনারই আসন পুজা করছেন। এতদিনে বিধাতার করুণায় তিনি

আপনার সংবাদ পেয়েছেন। আপনি তাঁরই অনুসন্ধানে এসেছেন অনুমান করে এ বাঁদীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আশ্রয়লাভের আশায়।"

ক্ষণিক নীরবতার পর রুদ্রতাপকে নিরুত্তর দেখে বোরখা ঈষৎ উন্মুক্ত করে রোশেনা সুলতানের পাঞ্জা বার করে। বলে—"এই দেখুন, আপনার পথ নিরাপদ করবার জন্য কৌশলে সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন সুলতানের পাঞ্জা। এই নিন, শিশমহলের পথ এই মুহূর্ত থেকেই আপনার নিকট উন্মুক্ত ও নিরাপদ হলো।"

রোশেনা অনুভব করে নিরুত্তর রুদ্রতাপ অন্যমনস্ক। হাত আরো একটু বাড়িয়ে কঙ্কনের মৃদু শব্দ করে রোশেনা বলে—"সময় সংক্ষিপ্ত, অবহেলায় অপচয় করবেন না মহোদয়। নিন, সুলতানের পাঞ্জা গ্রহণ করে অবিলম্বে কার্যে অগ্রসর হোন।"

—"সুলতানের পাঞ্জা!"

—"হ্যাঁ, এই পাঞ্জা হাতে থাকলে সুলতানা-মহলের সর্বত্র আপনার অবাধ গতি। দুষ্ট কাল-প্রভাত আসবার পূর্বেই সুলতানের সুলতানা হবার চরম দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করুন আপনার অবন্তীমালাকে।"

—"আপনি এ কী বলছেন? সম্মুখে যাঁর সুলতানার পদ তিনি একজন সামান্য প্রাকাররক্ষীর আশ্রয় চান? এ অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য।"

—"আপনি কি নারীর সততা পরীক্ষা করছেন? নইলে আপনি কি জানেন না, প্রেমের আশ্রয়ের কাছে কত তুচ্ছ সুলতানার পদ? ছলনা রাখুন, অসহায়া বন্দিনীকে বীরের বাহুবলে উদ্ধার করে প্রেমের নির্ভয় আশ্রয়ে নিয়ে যান। নিন, পাঞ্জা গ্রহণ করুন।"

দুই বলিষ্ঠ হাতে ভারী বর্শা সজোরে কাঁধে ফেলে রুদ্রতাপ অবিচলকণ্ঠে উচ্চারণ করে—"আপনি ভুল বুঝেছেন, এখনই মহলে ফিরে যান। পূর্বদিকে সূর্যের রক্তিম আভা দেখা দিয়েছে, প্রভাত আসন্ন। দুর্গ ক্রমেই অধিকতর লোক চলাচলে মুখরিত হয়ে উঠছে, এরপর মহল প্রবেশের চেষ্টায় বিঘ্ন দেখা দিতে পারে।"

হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেনি রোশেনা। এ যে রোশেনারও জানা। মনের পৃষ্ঠায় বহুবার সে এই বেদনাময় ইতিহাস পাঠ করেছে। তবু দুঃখ জাগে অবন্তীমালার কচি বুকের অগাধ বিশ্বাসের কথা স্মরণ করে। তার পক্ষে এসব হিন্দুবীরদের তো আজও চিনবার অবকাশ ঘটেনি! এদের গৃহলক্ষ্মী দুর্বৃত্ত হরণ করলে এরা শুধু চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসে ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে পারে। শোকে বিবাগী হতে পারে। স্ত্রীর প্রতি অভিমান বুকে নিয়ে এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। তবু গৃহলক্ষ্মীর মান রাখতে নিজের জীবনের বিনিময়ে দুর্বৃত্তের জান নিয়ে প্রেমের প্রতিদান দিতে পারে না। চোখ সজল হয়ে আসে রোশেনার।

নিজেকে সংযত করে শেষবারের মতো বলে—"কিন্তু আমার কর্ত্রীর প্রার্থনা?"

—"আপনার কর্ত্রীকে বলবেন, সুলতানার সিংহাসনে পা বাড়ালে পর আর বনচারী সিংহের পৃষ্ঠে পা রাখা যায় না।"

—"আপনি কি তাহলে অবন্তীমালাকে নিঃশেষে অন্তর থেকে বিদায় দিয়েছেন?"

রুদ্রতাপের বর্শা সশব্দে স্কন্ধচ্যুত হয়। চমকে ওঠে রোশেনা। ক্ষণিক থেমে রুদ্রতাপ রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করে—"না···কিন্তু এ সব কথা নিষ্প্রয়োজন। আজ আর সময় নেই। আসন্ন প্রভাতে একা একজন ক্ষুদ্র প্রাকাররক্ষীর পক্ষে সুলতানের অন্দরে প্রবেশ মৃত্যুপণ করেও সম্ভব নয়। আপনি আর বৃথা বাক্যব্যয়ে অনর্থক নিজেকে বিপন্ন করবেন না। মহলে ফিরে যান।"

—"আচ্ছা, আজ না হয়ে যদি আগামীকাল রাত্রিবেলা হয়? তা হলে কি আপনি বন্দিনীর ব্যথা শোনবার মতো অবকাশ পেতে পারেন?"

—"কিন্তু আজ প্রভাতেই তো নিকা সুসম্পন্ন হয়ে যাবে শুনেছি।"

—"হোক নিকা। তাতে কি? অন্তরের বন্ধন, জন্ম-জন্মান্তরের বিয়ে কি ধরা-বাঁধা মূক-নিকার অনুষ্ঠানে মুছে যাবে?"

নিরুত্তর রুদ্রতাপের গভীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় রোশেনা। রোশেনার বড় চেনা এ দীর্ঘশ্বাসের ভাষা! এর স্বরূপ তার অতি পরিচিত! এ কেবল অক্ষমের পোড়া অন্তরের কালো ধোঁয়া। এ দীর্ঘশ্বাসে প্রণয়িণীর শিশমহল পুড়িয়ে দেবার আগুন নেই। অন্যমনস্ক রুদ্রতাপকে প্রলুব্ধ ও সজাগ করবার উদ্দেশ্যে রোশেনা আবার বলে—"আজ যদি সম্ভব নাও হয়, কাল আমার কর্ত্রী আপনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এই নিন পাঞ্জা।"

গম্ভীরকণ্ঠে রুদ্রতাপ বলে—"না, তা হয় না। কুলিশ ও তম্রোল-এর অপরাধের ভাগ গ্রহণ করা রুদ্রতাপ ভট্টের পক্ষে সম্ভব নয় ভদ্রে। আপনার কর্ত্রীর সংগৃহীত পাঞ্জা তাঁকে প্রত্যর্পণ করবেন। রুদ্রতাপ ব্রাহ্মণকুমার। অপহরণের পাপ কোন অবস্থাতেই তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার কর্ত্রীর যদি সত্যিই সুলতানার সিংহাসনে বিতৃষ্ণা থেকে থাকে তাহলে যে কৌশলে তিনি সুলতানের পাঞ্জা সংগ্রহ করেছেন সেই কৌশলী বুদ্ধিই তাঁকে মুক্তির পথ দেখাবে। ও পাঞ্জা তো তাঁর পক্ষেও মুক্তির সহায়ক হতে পারে? রাত্রি প্রথম প্রহরের পর দ্বিতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত আমি প্রত্যহ প্রাকারের এই উত্তর-দক্ষিণ কোণ প্রহরায় থাকি।" বলেই দড়ির সিঁড়িতে পা রাখে রুদ্রতাপ।

—"দাঁড়ান, কিন্তু আমি যে আপনার দর্শন পেয়েছিলাম তার নিদর্শন?"

কোমরের চাপরাস খুলে রুদ্রতাপ এগিয়ে ধরে একখানি তালপত্র। পত্রখানি গ্রহণ করে শ্লেষের সঙ্গে রোশেনা জিজ্ঞাসা করে—"কিন্তু আমার কর্ত্রীর নিকট কি আপনার আর কিছুই বক্তব্য নেই?"

—"না।"

—"উঃ, আপনি এত নিষ্ঠুর!"

—"ক্ষমা করবেন। রুদ্রতাপের নিষ্ঠুরতা আপনার কর্ত্রীর অবিদিত নয়। ভগবান আপনাদের নিরাপদ করুন।" বলেই দড়ির সিড়ি বেয়ে দ্রুত প্রাকারে উঠে যায়।

ব্যর্থতার অবসন্নতা নিয়ে ফেরে রোশেনা। নিকটস্থ কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে এক কৃষ্ণছায়া দূরত্ব বজায় রেখে সন্তর্পণে রোশেনাকে অনুসরণ করে।

চিন্তিত অবসন্ন রোশেনা যখন শিশমহলে পা দেয়, ভোরের কাক তখন আকাশে উড়েছে। অবন্তীমালার শয়নকক্ষে উঁকি দিয়ে দেখে: পালঙ্কের পাশে সুরৎ-সুর্মা-দান হাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে হামিদা।

•

উষার অস্পষ্ট আলোকে দূরে প্রাসাদের ক্ষুদ্র গবাক্ষগুলির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে রুদ্রতাপ মনে মনে বলে—'ক্ষমা করো অবন্তীমালা, নিরুপায় হতভাগ্যকে ক্ষমা করো।' প্রাকার ত্যাগ করে বিষণ্ণ নতমুখে সে নগর অভিমুখে চলতে থাকে। বাঁদীর বিদায়ের পর থেকেই সহস্র প্রশ্নের কুশাঙ্কুর তার হৃদয়ে বিদ্ধ হতে থাকে—কেন? কি আশায় পাঠিয়েছে সে সঙ্কেতের মিথ্যা সূত্র? কেন দিতে পারলে না নির্মম বিদায়? কেন সে এখনই ছেড়ে যেতে পারে না এ প্রাকার? কেন? কেন এসেছিল এত কাছে? কিসের আশায় সে বিনিদ্র রাত্রি প্রতীক্ষা করে? অবন্তীমালার সুলতানা-রূপ একটিবার দেখবার কেন এত প্রত্যাশা, কেন এত মোহ!

মৃদু স্পর্শে চোখ মেলে অবন্তীমালা। সুরৎ-সুর্মা-দান হাতে পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হামিদা। বলে—"ওঠ সুলতানা, নিকা-উৎসবের দিনে বিশ্রাম থাকে না নিকা-রাজী সুলতানার।"

নিকা-রাজী সুলতানা! তাই তো! রাজীই তো হয়েছে অবন্তীমালা! ধড়মড় করে উঠে বসে পালঙ্কে। হাতে তখনও ধরা আছে কুলিশের অঙ্গুরীয়। তবে? দেরী হয়ে গেল যে! ঘুমিয়ে পড়েছিল অবন্তীমালা! কি করে ঘুমিয়েছিল! নাঃ, এখনো সময় আছে। শান্ত হয়ে আবার শুয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে—"নিকার সংবাদ তুই জানলি কি করে হামিদা?"

চোখে-মুখে সানন্দ কৌতুক হামিদার। উত্তর দেয়—"নিকার সংবাদ কি আর কিল্লা অধিবাসীদের কারো জানতে বাকি আছে সুলতানা? কাল রাত্রেই যে নিকার হুকুম দিয়েছেন সুলতান। রাত থেকেই যে সাজানো হচ্ছে কিল্লার পথ, নিকা-দরবার। রোশনচৌকিদার সুলতানের নিদ্রাভঙ্গের চৌকি থেকে ভোর না হতেই রাগিণী শুরু করেছে। মৌলানা, পীর সবাই প্রস্তুত। দরবেশ সুফীরাও আসতে শুরু করেছেন। সুলতান এখনও বিশ্রাম করছেন

নিদ্‌মহলে। সুলতান প্রস্তুত হয়ে নিদ্‌মহল থেকে বেরুলেই নিকা-জিগির আরম্ভ হবে। কখন যে ডাক পড়বে তার তো কোনো ঠিকানা নেই, তোমাকে প্রস্তুত থাকতেই হবে।"

আলস্যে পাশ ফিরে বলে অবন্তীমালা—"তোদের সুলতানের নিদ্রা ভঙ্গ হোক তখন দেখা যাবে। এখন তুই বিশ্রাম করগে হামিদা। আমিও আর একটু বিশ্রাম করি।"

—"তাই কি হয় সুলতানা? সুলতানের ডাক পড়লে পর তুমি প্রস্তুত নেই জানলে এ বাঁদীর গর্দান যাবে।"

দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ায় ঝাড়ুদারণী বাঁদী। ফুলদার গালিচার উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে তম্বোল-এর প্রসাদ—ছিন্ন কর্পূর ও মোতির মালা। ঘরে পা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝাড়ুদারণী। ঝাড়ুদারণী ভীত চোখে ইশারা করে দেখায় হামিদাকে। এতক্ষণ লক্ষ্যে পড়েনি হামিদার। ঝাড়ুদারণীর ইশারা অনুসরণ করে হামিদাও শঙ্কিত হলো। ভীত হয়ে ত্বরিতে ছিন্ন মালাগাছি তুলে নিলে সে। জিজ্ঞাসা করলে—"সুলতানের কণ্ঠের মালা ভুঁয়ে ছিন্ন হয়ে পড়ে কেন? এমন করে মালা ছেঁড়বার সাহস কে করলো সুলতানা? সুলতান জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না যে!"

অলস বাহুমূলে চোখ ঢেকে অলসতর কণ্ঠে বলে অবন্তীমালা—"কি জানি কখন ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে!" মালা কখন ছিঁড়ে গিয়েছে মনে করতে চেষ্টা করে অবন্তীমালা।

ভীতমুখে হামিদা বলে—"এ মালা এখুনি গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দিতে হবে। সুলতানের প্রীতির দান গলায় নিয়ে নিকা-দরবারে উপস্থিত হওয়াই যে নিয়ম।"

চক্ষু মুদ্রিত রেখেই তাচ্ছিল্যের সুরে অবন্তীমালা উত্তর দেয়—"তুই ও-মালা নিয়ে যা হামিদা, ও-মালা আমার আর প্রয়োজনে লাগবে না।"

হামিদা হেসে উঠলো। বললে—"কি যে বল সুলতানা? বাঁদীর গলায় সুলতানের মালা! হামিদার কবরের ভয় নেই বুঝি?"

—"কবর তোর আর হবে না রে হামিদা, তার আগেই হয়তো কবরে যাব আমি।"

ততক্ষণে ক্ষিপ্রহাতে মালা গাঁথতে বসেছে হামিদা। আশ্বাস দিয়ে বলে—"আহা বালাই! এমন দিনে ও-কথা বলো না সুলতানা। ভোর না হতে আমরা সবাই খোদার কাছে প্রথম নওয়াজে আরজী জানিয়ে এসেছি যে, সুলতানী তোমার অক্ষয় হোক। তোমার দরদে নাজুক মন, খোদা কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না। নরম মনের 'পরে খোদার বড় দরদ! তাই তো তোমার নিকায় সুলতানের উকিল এত্তালা করে দেনমোহর কবুল করিয়ে নিয়ে গেল! বড় সুলতানার পর এ সম্মান আর কেউ পায়নি।"

ঝাঁট দিতে দিতে সায় দেয় ঝাড়ুদারণী। বলে—"হ্যাঁ, আমি আছি সেই মালেক জালাল-উদ্-দীন্-মস্থদ জানীর আমল থেকে, কত মালেক এল, গেল, এমন হতে আর দেখিনি। আমি বলছি স্থলতানা, তুমিই স্থলতানার বড় খাসমহল একদিন দখল করবে।"

ওদের সকল কথা অবন্তীমালার কানে যায় না, তবু 'দখল' কথাটায় জোর ধাক্কা লাগে মনে। দখল? দখল করবার মতো মনের জোর কেন, মুখের জোরও আর যেন নেই সেই অবন্তীমালার। অথচ একদিন এই অবন্তীমালাকেই কিনা মা মুখরা বলে সর্বদা গালি দিতেন। ঝাঁট শেষ করে চলে যায় ঝাড়ুদারণী। আর মোতির মালা গাঁথা শেষ করে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায় হামিদা।

—"বড্ড দেরী হয়ে গেল স্থলতানা। নিকা সাজ, সেও তো সময় নেবে কম নয়? এস, আর দেরী করো না, তোমার পঁয়জর ধরি। আজকের দিনটাই না হয় আমার কথা শোন। এরপর তো থাকবে শিশমহলে গা এলিয়ে স্থলতানের সঙ্গে। স্থরা-বরদারণী স্থরা ধরে থাকবে আর নর্তকীরা আত্তর-ই-খস্খস্ ও চন্দন ছড়িয়ে খোশ হুকুমের অপেক্ষায় থাকবেন। খোজা খোশ-খবরদাররা রাত্রি দিন দ্বারে দাঁড়িয়ে হুকুমের অপেক্ষায় কান পেতে প্রতীক্ষা করবে।"

নিঃশ্বাস ফেলে যেন এতক্ষণে জেগে উঠে বসলো অবন্তীমালা। হ্যাঁ কত স্থখ, কত আনন্দ! স্থলতানা হয়ে স্থলতানের মুগ্ধ চোখের জ্যোৎস্না-স্নান! আগলহীন মুখের নির্ঝরিণীতে ডুবে নিয়ত বিলাস-সন্তরণ! মন্দ কি? হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখা কুলিশের অঙ্গুরীয় অনেকটা শিথিল হয়ে আসে। কেন, মরবে কেন অবন্তীমালা? কেন ছেড়ে যাবে জীবনের এত সম্ভাবনা, এত রঙ? ওড়নায় বাঁধা অঙ্গুরীয়টি আর একবার দু'হাতে টিপে দেখে খুলে নিয়ে পালঙ্কের গদীর তলায় গুঁজে রাখে। না, মরবে না অবন্তীমালা। মরণ নিষ্ঠুর বটে কিন্তু জীবনটাও তো বিচিত্র রঙ-এর স্বপ্নে ভরপুর। অনিবার্য মৃত্যুকে এখনই কেন নিমন্ত্রণ করবে? সে তো আসবেই একদিন, অনিমন্ত্রিত এসে গ্রাস করবে জীবনের আনন্দমধু। জীবনে আর কত অসম্ভবের সম্ভাবনা, কত আশা-নিরাশার স্বপ্ন-দোলা! না, জীবনকে তুচ্ছ বলে ফেলে দেবে না অবন্তীমালা। যা আসে আস্থক, যা না আসে সম্ভাবনার স্বপ্নে তা অপেক্ষা করুক। কিন্তু তাই বলে মরণকে, অন্ধকার মরণকে কি ভয়ে দূরে ঠেলছে অবন্তীমালা? না, তাও নয়, মরণের ভয়ে সে ভীত নয়, সেই অনিবার্য নিয়তিকে সে কেবল উপেক্ষা করতে চায়। এই চঞ্চল জীবনে সহিষ্ণুতার সঙ্গে সংগ্রাম করে সে নিশ্চিত মৃত্যুকে তুচ্ছ ভেবে শুধু দূরে ঠেলে দিতে চায়।

অবন্তীমালার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে হামিদা মহা উৎসাহে

তার অঙ্গরাগ শেষ করে কেশ বেশ শুরু করে। অবন্তীমালার সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে বিনুনি ঝুলিয়ে দিয়ে তাতে ফুল গুঁজে দেয়, মণিখচিত সোনার পাশ-চিরুণী মাথায় গুঁজে দিতে দিতে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে—"মাথায় লাগল কি সুলতানা?"

কথা হারিয়ে গিয়েছে অবন্তীমালার। শুধু মাথা দুলিয়ে জানায়—না। মাথায় এখন আর তার কোনো আঘাত লাগবার আশঙ্কা নেই।

নগরে স্থানাভাব বলে নয়, নগরের কোলাহল থেকে দূরে থাকবার জন্যই নগরপ্রান্তবাসিনী হরশঙ্করীর গৃহই বাসের যোগ্য স্থান বলে নির্বাচন করেছিলেন হরিশ্চন্দ্র।

নগরপ্রান্তে জীর্ণকুটিরবাসিনী বৃদ্ধাব্রাহ্মণী হরশঙ্করীর একদিন সবই ছিল। স্বামী রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্পাস ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ করে পতিত হয়েছিলেন। স্বামীর দেহরক্ষার পর অসহায়া রমণী দুঃখ পেয়ে পেয়ে দুর্গতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছেন। সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সম্মান সমাজে ক্ষীণ হয়ে এলেও, ব্রাহ্মণদের তখনও কিছু কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু তুর্কীদের রাজ্যবিস্তৃতির উৎসাহে এই অসহায়া রমণীর সে-সম্বলটুকু রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি। তাই এখন অপরের ঘরের শস্য ঝাড়া-পোঁছার সাহায্য বা অনুরূপ কাজ করেই বৃদ্ধাকে জঠরজ্বালার সংস্থান করতে হয়।

সমাজ-পতিতা ব্রাহ্মণীর গৃহে অন্নগ্রহণ তো দূরের কথা হাত পেতে ভিক্ষা গ্রহণ পর্যন্ত করে না সংব্রাহ্মণরা। এমন দুর্ভাগ্যের দিনে হরিশ্চন্দ্রকে পেয়ে কৃতার্থ হলেন হরশঙ্করী। হরিশ্চন্দ্র যদিও পতিত হয়েছেন বৈদ্যবৃত্তি নিয়ে তবু তো তিনি সংব্রাহ্মণকুমার বলে পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্যও হরিশ্চন্দ্র পরম নিষ্ঠায় পালন করেন। মুখে অনেক সময়েই বলেন বটে হরশঙ্করী—'বৈদ্যঠাকুর, তুমি নগরের মধ্যে বাস না নিলে কি আর রোজগার জমবে?' মুখে বললেও মনে মনে তাঁর ভীষণ ভয়, পাছে ব্রাহ্মণকুমার নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজনের সৌভাগ্যটুকু হরণ করে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের এই সামান্য উৎসবটুকু থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করে চলে যান। তরুণ বৈদ্যের মধুর স্বভাব বৃদ্ধার স্নেহতৃষিত মনে অনেকখানি বাৎসল্য-রসের সঞ্চার করেছিল। বৃদ্ধার মনোভাব বুঝে হাসেন নবীন বৈদ্য। বলেন—"পসার চাই না আই, পেট চলে গেলেই হলো।"

সূর্যোদয় না হতেই হরিশ্চন্দ্র নরুণ নিয়ে হস্তীদন্তে মূর্তি কাটতে বসেন। দেখে ঝঙ্কার দিয়ে আই বলেন—"রাত না কাটতেই আবার পুতলা নিয়ে বসেছ? নগরে বাস না হয় বাছা নাই করলে, তা বলে একবার পাঁচজনের

বৈঠকে গিয়ে বসলেও তো কিছু চেনা জানা হয়? ঘরে বসে রাতদিন পুতলা কাটলে কি আর বৈদ্যের পশার জমে, না বৈদ্যবিদ্যায় হাতযশ হয়?”

নিবিষ্ট মনে হস্তীদন্তের অর্ধসমাপ্ত মূর্তিটির কুঞ্চিত আলুলায়িত কেশের রেখাগুলি স্পষ্টতর করে তুলতে চেষ্টা করেন নিরুত্তর হরিশ্চন্দ্র। আই সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখে দেখে মৃৎকলসীটি তুলে ঘাটের পথ ধরেন। প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে মূর্তিটি। কপালে কয়েকটি স্বেদবিন্দু এঁকে দিয়ে হরিশ্চন্দ্র শিল্পীর আনন্দে মূর্তিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকেন। হ্যাঁ, ঠিক এমনই তো ছিল সে!

পূর্ণ কলসী দাওয়ায় নামিয়ে আই বলেন—“শুনছ হে পণ্ডিত? ঘাটে শুনে এলাম আজ নাকি সুলতানের আবার নতুন নিকার হুকুম বেরিয়েছে। যুদ্ধ জিতে আসার পর প্রথম নিকা। খুব নাকি ধুমধাম হচ্ছে! এবার নিকার পাত্রীও নাকি পরমারূপসী!”

ধ্যানী ভাস্করকে নিরুত্তর দেখে অতি নিকটে এসে হরিশ্চন্দ্রের পিঠে হাত রাখেন আই। বলেন—“বলি, শুনছ পণ্ডিত, যা বলেছি?”

বৃদ্ধার কথা কিন্তু কানে যায়নি শিল্পীর। পুত্তলিকায় চোখ রেখে বলেন—“শুনছি বৈ কি! তবুও আর একবার না হয় বলো, শুনি।”

সস্নেহে হাসেন আই—“কান আর প্রাণ কি আছে যে জগতের কথা শুনবে? সবই তো ঐ পুতলার পায়ে বিকিয়ে দিয়েছ! বলছি, নিকার সখে সুলতানের মন হয়তো খুব খুশি আছে। ঘর তো পুতলা কেটে কেটে ভরে ফেলেছ। ক'টা নিয়ে যাও না সুলতানের নিকা-দরবারে। সুলতানের খোশনজরে পড়লে যোগ্য মূল্য হয়তো পেতেও পারো। বলা যায় না, তোমার প্রাণ পোড়ানো ছাই দেখে সুলতানের মেজাজ ভরলে, চাই কি দরবারে খোদকারের তক্তাও পেয়ে যেতে পারো। তুমি পুতলাগুলো নিয়ে যাও। আমি ডালায় করে না হয় ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে দি।”

নবনির্মিত মূর্তিটি সম্মুখস্থ কাষ্ঠখণ্ডের 'পরে রেখে বলেন হরিশ্চন্দ্র—“এ পুতলা পেটের বিষের জন্য বেচবার সামগ্রী নয় আই। পেটের বিষ নিবারণের জন্য বৈদ্যের বিষ শিখে রেখেছি।”

কপালে করাঘাত করে বিষণ্ণমুখে আই উত্তর দেন—“কিন্তু সেও তো করবে না দেহ-মন লাগিয়ে!”

—“দেহের একটি অংশ মাত্র পেট, সেই পেটের জন্য আর কত দেহ-মনের অপব্যয় করা যায় বলো? এই যা করছি যথেষ্ট। চলে তো যাচ্ছে।”

—“এই কি চলা? বুড়ীর ভাঙাঘরে নিত্যি রাতে বসে জল সেঁচা!”

কৃত্রিম অভিমানে হরিশ্চন্দ্র জবাব দেন—“তাতে যদি তোমার দুঃখ বাড়ে, বল, না হয় চলে যাই কোনো গাছতলায়?”

—“ওমা! তাই কি আমি বলেছি! ষাঠ ষাঠ, গাছতলায় যাবে কেন?”

ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে হরিশ্চন্দ্র বলেন—"তাই তো বলছো রাত্রিদিন কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে। এ দরিদ্র তো তোমার চক্ষুশূল!"

—"ওমা! শোনো কথা! আমি একলা ঘরে থাকি, কখন মরে পড়ে থাকবো। অন্তত অন্তিমনাম শোনাবার জন্যে তুমি তো তবু আছো—তুমি আমার কতবড় ভরসা। কিন্তু কেবল আমাকে দেখলে তো চলবে না। তোমার সারাজীবন পড়ে আছে। ভালো করে বৃত্তি ধর, ছেলে-বৌ নিয়ে সংসার আশ্রয় করে পিতৃপুরুষের গতি কর, এই জন্যই তো বলা। আইয়ের ভাঙাকুঁড়ের মাটি ধরে থেকে তোমার কোন মোক্ষ লাভ হবে শুনি?"

—"মোক্ষ আমার চাই না আই। লক্ষ্যে পৌছলেই বেঁচে যাই। যাও, তুমি একবার নগরে গিয়ে দেখে এস সুলতানের নিকায় দানধ্যানটা কেমন হচ্ছে, তারপর না হয় যাওয়া যাবে সুবিধে বুঝে।"

বিস্মিত আই গালে হাত দেন।—"ওমা! সুলতানের দান নেবে তুমি!"

—"ক্ষতি কি আই? পতিত তো এমনিও হয়েছি, সুলতানের দান নিয়ে না হয় যজ্ঞসূত্রটা ত্যাগ করবো। তা ওটা রেখেই বা কি লাভ? পিতৃপুরুষ পতিতের পিণ্ডতে তো পূর্ণ তৃপ্ত নন?"

হতাশায় ঘরের নড়বড়ে খুঁটিটাতেই পিঠ ঠেসান দিয়ে আই জিজ্ঞাসা করেন—"বলো কি পণ্ডিত! যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করবে ধনের লোভে!"

—"ধনই তো তুমি চাইতে বলছো আই! ধনই যখন ক্রমে ক্রমে জীবনকে ক্রয় করে নিচ্ছে তখন যেভাবেই তা আসুক, পাপ সমানই। আর যজ্ঞসূত্র কি যবনরাজ্যে অধিক দিন থাকবে আই? রাজার জাতই প্রজার জাত। আজ ব্রাহ্মণরা যাদের অব্রাহ্মণ অপবাদে দূরে ঠেলে রেখেছেন, একদিন তাঁদের চরণ আশ্রয় করেই হয়তো তাঁরা জীবনরক্ষায় লালায়িত হবেন, এই তো নিয়ম।"

—"কি যে তুমি বল পণ্ডিত, অর্ধেকও বুঝি না, আমার কেমন ভয় করে তোমার কথাবার্তা শুনে।"

হরিশ্চন্দ্র হেসে বলেন।—"তা ভয় করে আর দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? যাও না একবার নগরে, দেখে এস সুলতানের নিকা-উৎসবের আড়ম্বরটা।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে আই বলেন—"আচ্ছা বাবা, তুমি না হয় ঘরেই থাক আজ, আমিই একবার গিয়ে দেখে আসি নগরের ঘটা-পটা কি রকম।"

দ্রুত পায়ে যেতে যেতে মনে মনে বলেন আই—'বাবা! বাঁচালে ঠাকুর! নবীন পণ্ডিতের যেমন মাথার গোল? আজই যেতো হয়তো পিতৃপুরুষের পিণ্ডের শেষ হয়ে? সেই পাপের ছোঁয়া এসে শেষে হরশঙ্করীর গায়েও লাগতো।

ছল করে আইকে বিদায় দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নব-নির্মিত মূর্তিটি তুলে নিয়ে আয়ত-চোখের কোণে নরুণ টেনে টেনে হতাশায় ঘাড় নাড়েন

হরিশ্চন্দ্র। না, এত মূর্তি গড়লাম, চোখের ভাষার সেই অব্যক্ত অফুরন্ত সুষমাময় ঢলঢল ভাব কিছুতেই ফোটাতে পারলাম না ক্রূর এই হস্তীদন্ত খণ্ডে!

বাঁদীমহলে আজ অবন্তীমালার সমাদর কিছু বেশি। বার বার ঘুরে ঘুরে সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে হামিদা, রাবেয়া, ফতেমা, সুফিয়া এবং আরো অনেকে। এমন কি রোশেনাও হাসিমুখে একাধিকবার ঘুরে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে, ভয়ে, আনন্দে, বুক দুলছে কিনা অবন্তীমালার? অবন্তীমালাও তো মনকে তাই-ই বার বার জিজ্ঞাসা করছে। মন, তুমি যে দুলে দুলে বুক অসাড় করে দিলে, সেকি ভয়ে, আনন্দে, না হতাশায়? মন কিন্তু সারা দেয় না, কালো বোরখা পরে অবোধ্যধ্বনিতে অবিরাম কেঁপেই চলেছে! এই সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই দিতে পারছে না তার কৃষ্ণ আবরণ খুলে! অদূরে ঘণ্টাঘরের সঙ্গে তাল রেখে মোরগও বেলা তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করলো! কিন্তু···তঘ্রোল কি এখনও নিদ্রাগত! নিকার প্রবঞ্চনা-বন্ধন সম্মুখে জেনেও কি তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না! উঃ! এই কালো বোরখার দোলা আর সয় না! যা হোক একটা কিছু এই মুহূর্তে ঘটে যাক। ছিঁড়ে পড়ুক মনের এই কালো অশান্ত আবরণ। ঘটনার সত্য-স্বরূপ দেখে নিশ্চিন্ত হোক অবন্তীমালা।

হাস্যোজ্জ্বল মুখে গীত গেয়ে গেয়ে ঢোকে রোশেনা:

"তরুণ অরুণি তবই ধরণি পবন বহুথরা
লগ নহি জল বড় মরুথল জনজীবন হরা।
দিনই বলই হিঅঅ দুলই হমি একলি বহু
ঘর নহি পিঅ সনহি পথিহ মন ইচ্ছই কহু।।"

গীত শেষ করে হেসে বলে রোশেনা—"আজকের সূর্য তো বিফলে ডুবলো বলেই মনে হচ্ছে। নিকা বোধহয় আজ আর হলো না সুলতানা। শুনছি সুলতান নিকা-দরবার বিসর্জন দিয়ে নাকি মন্ত্রণা-দরবার নিয়ে ব্যস্ত!"

—"সুলতান মন্ত্রণাগারে ব্যস্ত! কেন! তবে যে শুনলাম নিকার হুকুম বেরিয়ে গিয়েছে!"

—"আহা! বড় নিরাশ হয়েছ, না? নিরাশার কিছু নেই ভগ্নি। সুলতানদের হুকুম মুহুর্মুহু কত অমন রদবদল হয়! তাঁদের মনের খেয়ালও এমনি নিত্য নতুন কত পুতুল গড়ে, আর ভাঙে।" নিরুত্তর অবন্তীমালার ভাবহীন চোখের দৃষ্টিতে খুশি হয়ে রোশেনা বলে—"শুনলাম সংবাদ এসেছে, প্রচুর সৈন্য-সম্ভারে সজ্জিত হয়ে ক্রীতদাস তঘ্রোল-এর ঔদ্ধত্য দমনে আসছেন স্বয়ং সিংহবিক্রমী সুলতান গিয়াস্-উদ্-দীন্ বলবন। লখ্নৌতির সিংহাসন ক্রীতদাসের কবলমুক্ত করে নির্বিঘ্ন করতে এবার তিনি বদ্ধপরিকর।

আর ক্রুদ্ধ-কেশরী বলবন-এর পথ-প্রদর্শকরূপে আসছে পলাতক ধূর্ত শৃগাল কৃতঘ্ন কুলিশ খান।”

অবন্তীমালার বিস্মিত জড়িতকণ্ঠে অজানিতে উচ্চারিত হয়—“কুলিশ খান!”

—“হ্যাঁ, তোমার ভাগ্য মন্দ অবন্তীমালা, এমন ক্ষেত্রে নিকা যদি বা হয় যুদ্ধোদ্যমে ব্যস্ত উদ্বিগ্নমন নিয়ে সুলতান তোমার সুধা-নির্ঝরিণীতে সন্তরণের অবকাশ পাবেন কিনা সন্দেহ।”

রোশেনার কথা কানে গেলেও মনে প্রবেশ করে না অবন্তীমালার। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—“কুলিশ খান দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যোগ দিলেন কেন?”

কুটিল কটাক্ষে হেসে বলে রোশেনা—“কুলিশের উদ্দেশ্যের সূত্র টেনে বার করতে না পেরেই তো সুলতান ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আমার মতো তুচ্ছ বাঁদীও যে উদ্দেশ্য অনায়াসে অনুমান করতে পারে, কুলিশের সেই উদ্দেশ্য অনুমানের চেষ্টায় মন্ত্রণাগারে দরবার বসেছে! লখ্‌নৌতি রাজ্যের আমীর-ওমরাহ্ সহ মহাবিক্রমী মুঘীষ-উদ্-দীন্ মাথা ঘোলাচ্ছেন।”

বুদ্ধিহীনের মতো মুখ করে সহজ গলায় প্রশ্ন করে অবন্তীমালা—“তোমার কী অনুমান হয় রোশেনা?”

অবন্তীমালার বুদ্ধিদৃপ্ত চোখ এমন অসহায় অনুজ্জ্বল দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে রোশেনা উত্তর দিলে—“ধনের শোকে না হলেও প্রণয়িণী সম্পদ উদ্ধারের জন্যই কৃতসঙ্কল্প হয়ে কুলিশ হয়তো সুলতান বলবন-এর আশ্রয় ভিক্ষার জন্যই বীর-ধর্ম কলঙ্কিত করে পলাতক হয়েছেন।”

হঠাৎ বোরখা-পরা মনটা দ্রুততর তালে ধাক্কা দেয়, টন্‌টন করে ওঠে বুক। স্তিমিতকণ্ঠে আদেশ করে অবন্তীমালা—“আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম করগে রোশেনা। আমার মাথাটায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে।”

কুর্ণিশ করে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে আবার কি ভেবে চলে যায় রোশেনা। অবন্তীমালা উঠে কারাবা থেকে কেওড়া জল নিয়ে ছপ্ ছপ্ করে খানিকটা মাথায় দিয়ে পালঙ্কে এসে গা এলিয়ে দেয়। পাঙ্খা-বরদারণী প্রকাণ্ড তালপত্রের সুরভিত পাখা আরো এগিয়ে এনে দ্রুততর নাড়তে শুরু করে। পাশ ফিরে পালঙ্কের গদি তুলে অবন্তীমালা বার করে আনে কুলিশের মোহরাঙ্কিত জহর! ওড়নার গ্রন্থী খুলে অঙ্গুরীয় নিয়ে নিজের অঙ্গুলীতে পরে চোখ বোজে।

হামিদা এসে পাশে দাঁড়ায়। সহানুভূতিকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—“অসুখ করেছে নাকি সুলতানা?”

নিরুত্তর অবন্তীমালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকিয়ায় মুখ গুঁজে। হঠাৎ অবন্তীমালাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে হামিদা—“রোশনচৌকিদাররা

ঘরে গেল, মৌলানা, পীররা খসক্-মুখে ফিরে গেল। আজ আর নিকা হলো না সুলতানা।"

হামিদার হাতখানি চেপে ধরে নিস্পন্দ অসাড় হয়ে শুয়ে থাকে অবন্তীমালা।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব-নৃত্য এতক্ষণে শান্ত হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি এখনও চলেছে অবন্তীমালার বুকে! বাইরে এখনো সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসেনি, কিন্তু সুলতানা-মহলের জাফরি-ঘেরা সামান্য আলো ইতিমধ্যেই মুছে গিয়েছে। রোশনী-বরদারণী শিশমহলের রঙিন সেজগেলাশের মুখে রোশনীশিস্ ছোঁয়াতে শুরু করেছে একে একে।

অনেক বুঝিয়ে অবন্তীমালা এইমাত্র বিদায় করেছে ক্রন্দনরতা হামিদাকে। অসহায় সহানুভূতিতে দুঃখের জ্বালা যে কত মর্মান্তিক দীর্ঘস্থায়ী হয় তা তো সকলে বোঝে না! অবন্তীমালাও হয়তো এতদিন বুঝতো না, কিন্তু আজ বুঝেছে। এই সঙ্কীর্ণ শ্বাসরোধকারী কারাকক্ষ নির্জন হলে পর চোখ বুজে অনুভব করে মর্মান্তিক একাকীত্বের শ্রান্তি।

অতি সংযত পদক্ষেপে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল রোশেনা। বালিশে মুখ গুঁজে থেকেও অবন্তীমালা অনুভব করে রোশেনার আগমন। আজকাল সে চিনে ফেলেছে রোশেনার সহানুভূতিতে ঢাকা ঈর্ষাপূর্ণ পদক্ষেপ। রেশমী সালোয়ারের খস খস শব্দ পেয়েও মুখ তোলে না অবন্তীমালা। ভালো লাগছে না। এই মুহূর্তে অপরের নিঃশ্বাসের স্পর্শটুকুও যেন অসহ্য মনে হলো। একটু নড়ে-চড়ে নিদ্রিতের মতো পাশ ফিরে শুলো অবন্তীমালা।

অবন্তীমালার কপট নিদ্রাটুকু খানিক দাঁড়িয়ে উপভোগ করে মুখ খোলে রোশেনা।—"আর ঘুমিও না দিদি, সন্ধ্যা নেমে এল। যতই অসুখ মনে হোক, প্রতি সন্ধ্যায় প্রস্তুত তো থাকতেই হবে সুলতানের আগমনের অপেক্ষায়?"

রোশেনার কণ্ঠে সহানুভূতির কমনীয়তা! রোশেনার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মুখ মিলিয়ে দেখবার জন্যই হয়তো সন্দিগ্ধ চোখ দুটি মেলে ধরে অবন্তীমালা।

আবার তেমনই নরম স্বরে বলে রোশেনা—"ওঠো দিদি, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে!"

রোশেনাকে বিশ্বাস করতে আজকাল ভয় হয় অবন্তীমালার। তবু চোখ বুজে অলসকণ্ঠে বলে—"শুয়ে শুয়েও তো কথা শোনা যায়।"

অবন্তীমালার উপেক্ষা রোশেনার মনের ক্ষতস্থানে আবার আঘাত দেয়। বিরসকণ্ঠে বলে—"তা যায়, তবে কিনা কথাটা একটু বেশি গোপন, হয়তো বা ভয়েরও।"

শ্লেষ দিয়ে হাসে অবন্তীমালা—"ভয়? ভয় থাকলে কি আর নির্ভয়ে শিশমহলে থাকা যেত?"

অসহায়া অবন্তীমালার জন্যে রোশেনার মনে মাঝে মাঝে করুণা জাগলেও তা স্থায়ী হতে পারে না তার অনমনীয় অহঙ্কারে! জলে ওঠে রোশেনা। অবন্তীমালার সমস্ত শুভ-সম্ভাবনায় আগুন জালিয়ে দিতে চায় সে। হিন্দু-রমণীর নিরুপায় দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আজ সমস্তদিন সে তার মনকে নিদারুণ বিষন্ন করে রেখেছিল। সারাদিন ধরে মনে মনে অনেক কল্পনা অনেক স্বপ্ন গুছিয়ে রেখেছিল রোশেনা। ভেবেছিল সুলতানার পাঞ্জা সহায় করে আজ সে দেখিয়ে দেবে অবন্তীমালাকে মুক্তির পথ। নিঃসাড়ে নীরবে তাকে উত্তীর্ণ করে দেবে প্রাসাদের সহস্র প্রতিহারীর অবিনয়-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে। কিন্তু না, অবন্তীমালা সে অনুগ্রহের যোগ্য নয়। অবন্তীমালা দেখেও চিনতে চায় না 'রোশেনা-পাথরের' আড়ালে 'মনোমোহিনী-স্রোতস্বিনী'। মনের আগুন সংযত করে শান্তকণ্ঠে বলে রোশেনা—ভয়টা ঠিক তোমার জন্যে নয়, ভয় রুদ্রতাপ ভট্টের জন্যে।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসে অবন্তীমালা।

—"রুদ্রতাপ ভট্ট! কোথায় তিনি? কি করে পেলে তাঁর সংবাদ!"

না, আর কোনো মায়া রাখবে না রোশেনা অবন্তীমালার কচিমুখের জন্য।

নির্বিকার মুখে বলে রোশেনা—"তিনি এই দুর্গেই প্রাকাররক্ষী হয়ে আছেন বেশ কিছুদিন।"

অস্ফুটধ্বনি উচ্চারিত হয় নিস্পন্দ অবন্তীমালার কণ্ঠে—"এই দুর্গেই বেশ কিছুদিন!"

সকল ভয়, সকল সন্দেহ মুছে গিয়ে অবন্তীমালার হঠাৎ মনে হলো রোশেনা যেন তার বড় আপন। আকুল-ব্যগ্রতায় অধীর দু'বাহুতে রোশেনাকে জড়িয়ে ধরে অবন্তী বলে—"কৈ দিদি, আমায় এ সংবাদ বলনি তো এতদিন?"

নিষ্ঠুর কৌতুকে রোশেনা বলে—"জানলে তো বলবো? আজই সবে জেনেছি যে? তারপর থেকে কতবার এসে ঘুরে গিয়েছি বলবো বলে, কিন্তু যে উৎসব চলেছে আজ তোমার মহলে! লোকের ভিড়ে বলতে পারিনি।"

—"কিন্তু কি করে জানলে?"

—"বাইরের খবর অন্দরে আনবার লোক আছে আমার, তার কাছেই তো শুনলাম।"

অবন্তীমালা নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না। দু'চোখে অবিরল ধারা বয়ে চলেছে তার। বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রু এতদিনে পথ পেয়ে যেন উত্তাল অবাধ্য গতি নিয়েছে! উদ্দাম গতিতে ভেঙে নিয়ে চলেছে হৃদয়ের সব দিক! বার বার চোখ মুছলেও বাঁধ মানে না অবাধ্য ধারা।

অন্তরের 'মনোমোহিনীকে' সবলে আড়াল করে সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে রোশেনা বলে—"তোমার দুঃখ ঘুচেছে দিদি। সংবাদ পাঠিয়েছেন প্রতি

রাত্রে তিনি তোমার আশায় প্রাকারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করেন। তোমারই জন্যে গ্রামের শান্তিনীড় ছেড়ে প্রাকারের বিপদ-শিখর বেছে নিয়েছেন।”

পালঙ্ক ছেড়ে কাতর দৃষ্টি মেলে দু'হাতে রোশেনার হাত চেপে ধরে অবন্তীমালা। বলে—“কিন্তু…আমি, আমি কি করে তার দেখা পাব? তুমি দয়া করে শুধু একবারটি তাঁকে দেখাও! তাঁর দর্শন পেলে পর আমি মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শেও আর ভয় পাব না।”

ভ্রূ টেনে তুলে রোশেনা উত্তর দেয়—“আজ বাদে কাল সুলতানা হবে, মনের আবেগ সংযত করে ভালো করে বিচার-বিবেচনা করে দেখ। অধৈর্যে আত্মহারা হয়ে বাঁদীর করুণা ভিক্ষা করো না অবন্তী।”

চোখ মুছে দৃপ্তভঙ্গিতে সরে দাঁড়ায় অবন্তীমালা—“তাহলে এসবই তোমার প্রবঞ্চনা!”

—“প্রবঞ্চনা! এই দেখ তাঁর অভিজ্ঞান!” সাগ্রহে তালপত্রখানা টেনে নেয় অবন্তীমালা। রুদ্রতাপের কাছে প্রথম পাঠ শিখে আঁকাবাঁকা টানে লিখেছিল—রুদ্রতাপ ভট্ট। সেদিন শিষ্যার যত্নে-লেখা-পত্রটি নিয়ে হেসে বলেছিল রুদ্রতাপ—'দে, ও-পত্র আমার কাছে থাক। আর কোথাও তোর বিয়ের ঠিক হলে এই পত্র দেখিয়ে ভেঙে দেবো। বলবো, ও মেয়ে পুঁথি নিয়ে তর্কে বসে, ধান চাল চেনবার বিদ্যে নেই।' সে-পত্র আজও রেখেছে রুদ্রতাপ! কিন্তু আর কি তার প্রয়োজন নেই এতে? তাই কি অবন্তীমালার প্রথম অক্ষর-পরিচয়ের লেখা আবার তার কাছে ফিরে এসেছে?

অবন্তীমালার নিস্পন্দভাব লক্ষ্য করে ঠোঁট টিপে বলে রোশেনা—“এবার বিশ্বাস করেছো তো এ প্রবঞ্চিকাকে? আর এও আশা করি বুঝেছ যে, তোমার মঙ্গল না চাইলে এ নিদর্শন এনে তোমার হাতে দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করবার দায়িত্ব নিতো না রোশেনা?”

এবার আকুল হয়ে অবন্তীমালা রোশেনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। —“এ অযোগ্যার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর দিদি, তুমি আমার হাত ধরে পথ দেখাও, এ কারাজীবন থেকে মুক্তি দাও।”

—“সুলতানা-মহলের সর্পিল-পথ কেউ হাত ধরে দেখাতে পারে না অবন্তী। নিজের বুদ্ধির আলোয় তা চিনে নিতে হয়। তবে পথের সামান্য নিশানা দিয়ে হয়তো সাহায্য করতে পারি।”

সজলচোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে চায় অবন্তীমালা।

—“অবশ্য দুর্গের বাইরে যাওয়ার একটি নিশানা আমার কাছে আছে, কৌশলে সংগ্রহ করেছি। তা তোমায় দিতে পারি। কিন্তু সাবধান, কাকপ্রাণীও যেন জানতে না পারে!”

বিভ্রান্ত অবন্তীমালা অন্ধ আকুলতায় বলে—“তাই দাও দিদি, আমার প্রাণ থাকতে তোমায় বিপন্ন হতে দেব না আমি।”

সন্তর্পণে রোশেনা বুকের জেব থেকে স্থলতানের পাঞ্জা বার করে বলে—"এর নাম স্থলতান-পাঞ্জা। স্থলতানের আদেশ-স্বাক্ষর। এই পাঞ্জা হাতে থাকলে সর্বত্র অবাধ গতি, প্রচুর সম্মান।"

রোশেনার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তর সয় না অবন্তীমালার। তৃষ্ণার্তের পানপাত্রের মতো টেনে নেয় স্থলতানের পাঞ্জা। তারপরই কিন্তু চিন্তিত হয়ে ওঠে, বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পাঞ্জাখানা দেখে। জিজ্ঞাসা করে—"কিন্তু কোথায় যাব? কেমন করে যাব? প্রাকার কোন দিকে? কতদূর?"

রোশেনা হেসে ওঠে বলে—"অত চিন্তার কী আছে? তিনি তো বলেই পাঠিয়েছেন, রাত্রির প্রথম প্রহর থেকে দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রত্যহ প্রাকারের উত্তর-দক্ষিণ কোণে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন তিনি।"

—"কিন্তু প্রাকার কোথায়? কতদূরে?"

—"প্রাকার অবশ্য এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, তবে পথ সোজা। বাঁদীমহল পরিত্যাগ করে কিছুটা সোজা গিয়ে উত্তরদিকে চলতে থাকলেই যথাস্থানে পৌঁছবে। নিকটেই একটি হাজারী পনস-এর গাছ আছে শুনেছি।" তারপর অবন্তীমালার অসহায় চিন্তিতমুখের দিকে চেয়ে একটু থেমে বলে —"আচ্ছা আমি এখন যাই। তুমি বিষয়টা নির্জনে চিন্তা করে দেখো।"

রোশেনার অশান্ত উত্তেজিত চরণের নূপুরধ্বনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমূঢ় অবন্তীমালার কানে বাজতে থাকে। অনেক কথা অনেক জিজ্ঞাসা একত্রে কোলাহল করে মনে আসে। কোন কিছুই স্থির মনে বুঝতে পারে না অবন্তীমালা। কোথায় তুমি? আমি নারী, কেমন করে উত্তীর্ণ হবো এই বিপদসঙ্কুল-পথ? তুমি পুরুষ রুদ্রতাপ! বীর! তুমি কি আসতে পারলে না? কেন এলে না তুমি রক্ষীর তীক্ষ্ণ বল্লম নিয়ে প্রাসাদের প্রাচীর বিদ্ধ করতে? বিপদ? বিপদকে ভয় কেন? তোমার অবন্তীমালা যে দীর্ঘদিন দিবারাত্রি বিপদের আগুনে দাঁড়িয়ে জ্বলছে। কিন্তু না, আমিই যাব। তুমি যখন ডেকেছ তখন মৃত্যু এসে তার ক্রূর হাত বাড়ালেও সে-হাত দু'হাতে নিরস্ত করে অবন্তীমালা যাবে। দীর্ঘদিনের বদ্ধ অন্ধকারকক্ষের সমস্ত দুয়ার খুলে যেন প্রভাতের আলোতে ঝলমল করে উঠলো অবন্তীর সারা বুক। চোখ মুছে শুধু মনের আবেগে বার বার উচ্চারণ করতে লাগলো: "দেখবো, দেখবো, দেখবো, তোমাকে আবার দেখবো!"

বিষণ্ণ আনতমুখে এসে দাঁড়ায় হামিদা। হাতে জাফরাণী রঙ-এর মখমলের বেলদার সালোয়ার কামিজ, সলমাদার ফিরোজা রঙ-এ মশলিনের ওড়না। হামিদার বিষণ্ণমুখের দিকে চেয়ে প্রভাত-আলোর মতোই হেসে অবন্তীমালা বলে—"আজ আর ও-বেশ নয় মুসম্মৎ হামিদা, বড্ড গরম!"

—"কিন্তু বৃষ্টি নেমে তো কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। তবে আরো মেঘ রয়েছে আশমানে, হয়তো আবার বৃষ্টি আসবে।"

—"তা আসুক। তুই শাড়ি নিয়ে আয়। একখানা লাল জামদানী শাড়ি। আর কস্তুর-চন্দন। আজ লালশাড়ি পরে পুষ্প-চন্দন আঁকবো কপালে।"

হামিদার মুখের মেঘ সরে কৌতুকের আলো দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা করে—"হিঁদুর কনে সাজবে বল?"

—"হ্যাঁ, জ্বালাসনি আর, যা বললাম নিয়ে আয়।"

আবার মেঘ ঘনায় হামিদার মুখে। বলে—"কিন্তু মনে হয় আজ আর সুলতান আসবেন না অন্দরে। আমীর ওমরাহরা অনেকে এসেছেন, মন্ত্রণার পর তাদের সঙ্গে নিয়ে নাচ দেখবেন দরবার-মহলে।"

—"নাই আসুন সুলতান, তবু তো প্রস্তুত থাকতেই হয় তোদের সুলতানা-কারাগারে? খোদের মর্জি নাকি তোদের খোদারও অজ্ঞাত?"

—"তা যা বলেছ। কিন্তু তোমার যে আবার ব্যর্থসাজ গায়ে বেঁধে?"

বহুকাল পরে হাওয়ায় উড়ছে অবন্তীমালার মন, হেসে বলে—"আজ আর সাজ বিঁধবে নারে গায়ে, ক্রমে অভ্যাস হচ্ছে তো! যা, তুই নিয়ে আয় একখানা জরিজামদানী।"

কপালে পুষ্প-চন্দন এঁকে পদ্ম-কবরীর ওপর মোতির বরক্‌লহর ঝুলিয়ে দেয়। কানে মণির কর্ণপালী ঝুলিয়ে দিয়ে মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে আরশিতে মুখ দেখে বহু দিন পরে হাসে কুশীগ্রামের বনহরিণী। পায়ে আলতা টানতে টানতে বলে হামিদা.—"অলক্ত রেখায় চরণ যেন পদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছে! এ চরণে আর কিন্তু কোন আভরণের প্রয়োজন করে না। যাই বল সুলতানা, মেহেদীর রসে চরণের এমন শোভা কিন্তু খোলে না।"

অন্যমনে পা ঘুরিয়ে দেখে অবন্তীমালা বলে—"আচ্ছা হামিদা, তুই কি কিল্লার পথে বেরিয়েছিস কখনো?"

—"বেরিয়েছি বৈ কি সুলতানা, মাঝে মাঝে নগরেও তো যাই; তবে গোপনে। কিন্তু কেন বল তো?"

—"সে-কথা পরে বলবো। এখন বল, কিল্লার রক্ষীদের সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে নগর পর্যন্ত যাস কেমন করে?"

—"অনেক দিন আছি। কিল্লার মহল্লার বরকন্দাজ, খাসবরদাররা সব জানাশোনা। মিষ্টি কথা আর সুলতানা-মহল্লার খাস-মেঠাই কবুল করলে পথ ছেড়ে দেয় দয়া করে।"

—"আচ্ছা, কিল্লার উত্তর-দক্ষিণ কোণে প্রাকারের কাছে একটা হাজারী পনস-এর গাছ আছে দেখেছিস?"

—"হাজারী পনস! দেখেছি হয়তো, তবে মনে পড়ছে না ঠিক। কিন্তু কেন বল তো?"

সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে হামিদা অবন্তীমালার মুখের লেখা পড়তে চেষ্টা

করে। জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কি করে জানলে কিল্লার ভিতরে হাজারী গাছের খবর!"

হামিদার সন্দিগ্ধ স্বরে একটু থতমত খেয়ে অবন্তীমালা বলে—"না, এই শুনলাম কিনা রোশেনার কাছে। হাজারী পনস ভারী মিষ্টি। আবার তেমনি সুগন্ধ। ছিল ক'টা আমাদের গাঁয়ের বাড়ির সীমানায়, আমার দাদামশায় নিজ হাতে পুঁতেছিলেন।"

—"দেখ সুলতানা, যদি অভয় দাও, এ বাঁদীর গর্দান নামাবে না কথা দু'কান করে, তা হলে একটা কথা বলি।"

—"বল না বাপু, অত কথা কেন? এখনো পাকা সুলতানা হইনি তো! অত চটপট্ গর্দান-হারা মুণ্ডু দেখবার সাহস নেই। অতএব গর্দান হারাবার ভয় না রেখে নির্ভয়ে বল।"

হাওয়ায়-দোলা মনে আজ আর কোনো শঙ্কা দাঁড়াতে দিচ্ছে না। উচ্ছল হয়ে হেসে ওঠে অবন্তীমালা।

—"হাসির কথা নয় সুলতানা, আমার মন বলছে, তোমার ভারী বিপদ সামনে। সাবধান হওয়া ভালো।"

—"বিপদ কি আর শুধু সামনে? সুলতানী-কারায় বিপদ তো নিয়ত কালো বোরখা পরে সামনে-পেছনে সর্বত্র কিল্‌বিল্ করছে। তা সে পুরনো বিপদের কথা নিয়ে তোর মন আবার নতুন করে ভাবনা শুরু করেছে কেন?"

—"শুধু হেসে কথা উড়িয়ে দিও না সুলতানা। সুলতানা-রোশেনার সঙ্গে একটু হুঁশিয়ার হয়ে কথা কয়ো। হাজার হলেও সুলতানা রোশেনা এই দু'দিন আগেও শিশমহলে আদরের বিবি ছিলেন। সুলতানের সে-আদর তো আর এত শীঘ্র মন থেকে ধুয়ে ফেলতে পারেন না। তাই দেখ না, যখন তখন ঘুরে ফিরে নানা ছুতোয় এসে শিশমহল শুঁকে যান ছুঁক্ ছুঁক্ করে? তোমায় বলছি সুলতানা, সুলতানা-রোশেনার মতলব কিন্তু ভালো নয়।"

—"আহা! মতলব খারাপ হবে কেন? তবে শিশমহলের মায়া হয়তো একটু আছে। কিন্তু শিশমহলের সুলতানী যে শিশার মতোই ঠুন্‌কো সে তো সবাই জানে। রোশেনার পরেও তো শিশমহলের বেলোয়ারি-সুলতানা হয়েছিলেন ঝল্‌মলে জুবেদা?"

—"তা হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি শিশমহলে ছিলেন মাত্র দিন পনেরো। মায়াটা না বসতেই তুমি এলে কিনা? সুলতানের সাক্ষাৎ পাঁচ সাত দিনের বেশি তো আর ঘটে ওঠেনি।"

—"পাঁচ সাত দিনের দয়াতেই তিনিও শিশমহলের বাঁদী? আচ্ছা, জুবেদা শিশমহলে আসে না কেন রে হামিদা?"

—"সুলতানা-জুবেদার আত্মাভিমান হয়তো তাঁর ঈর্ষাকে সংযত রাখে। সুলতানা-জুবেদা এসেছেন কটাসিন দুর্গ থেকে। কটাসিন দুর্গ লুণ্ঠিত হয়ে আরো অনেকে এসেছিলেন। অপর সকলকে বিলি করা হয়েছে সৈন্য এবং আমীর-ওমরাহ মহলে। জুবেদা ছিলেন উড্রাধিপতি নরসিংহদেবের মালাচন্দন-বাহিনী, নাম বসন্তশ্রী। নৃত্য-গীত-কুশলা জুবেদার খানদানী স্মরণ করে সুলতান তাঁকে ভিন্ন মহল বরাদ্দ করেছেন। সুলতামা-জুবেদা নামে বাঁদী হলেও বাঁদী মহলে যেতে নারাজ। কিন্তু সুলতানা-রোশেনার ঈর্ষা সংযত করবার মতো অভিমান নেই, তাই মান খুইয়ে তিনি শিশমহলে আসেন। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন সুলতানের অন্দরে যাওয়া-আসার পথে। সে যাক্‌গে, সুলতানের আট কুড়ি সুলতানা, সতেরো কুড়ি বাঁদী, সকলেই সুলতানের মর্জি পাবার আশায় প্রতি সন্ধ্যায় ডালা সাজিয়ে পথ চেয়ে অপেক্ষা করে। সে জন্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু তুমি সাবধান থেকো ঐ সুলতানা-রোশেনার নজর থেকে। একে সুলতানা-রোশেনা, তায় আবার তাঁর সঙ্গে এসে জুটেছে বড় সুলতানার বাঁদী: জন্নাথ্‌ মামুদা!"

—"মামুদা! কি করেছে সে!"

—"করেছে কি জানিনে, তবে ওর অসাধ্যি কর্ম নেই! মহলের যত দুশমনি তার মূলে আছে জন্নাথ্‌ মামুদার শয়তানী মাথা। কাল থেকেই দেখছি সুলতানা-রোশেনার সঙ্গে মামুদা বাঁদীর ভারী পেয়ার! বিনা মতলবে জন্নাথ্‌ মামুদা পেয়ার করে না কারো সঙ্গে, সে কথা মহলের সবাই জানে। সুলতানা-রোশেনাও যে না জানেন এমন নয়। তাই মনে হয় মামুদার সখীত্ব আদরে গ্রহণ করার মধ্যে সুলতানা-রোশেনারও কোনো মতলব আছে।"

—"এমনও তো হতে পারে, রোশেনার কাছে বড-সুলতানা কোনো সংবাদ পাঠিয়েছিলেন?"

—"সে তো নিশ্চয়ই, খবর একটা তো আছেই, কিন্তু সে খবরটা যে শুভ নয় তাও নিশ্চিত। জন্নাথ্‌ মামুদা শুভ সংবাদ বয়ে পরিশ্রম করে না। অথচ কাল নিশারাত্রে সে দু'বার এসেছে সুলতানা-রোশেনার ঘরে। আজ সারাদিনে নাহোক দশবার তাকে আসতে দেখেছি। সুলতানা-রোশেনাও কাল রাত্রে গিয়েছিলেন বড়-খাসমহলে। আজ সকালেও দেখলাম বড়-খাসমহলের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে তিনি চিন্তিতমুখে ফিরছেন। কাজেই মন বলছে: ভারী রকম কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটবে।"

—"তা হয়তো, কিন্তু তাতে আমার কি?"

—"তোমার জন্যই তো এতো ফিস্‌ ফিস্‌ গুজ্‌ গুজ্‌। সুলতানা-রোশেনার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মামুদা বাঁদীকে বলতে শুনলাম—'শিশমহলের দুশমনি টিয়া'…। আজ আবার এখুনি বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে এলাম মামুদা বাঁদী এসে বসেছে। সুলতানা-রোশেনা খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে

বলছে—'লোভে টিয়া বুক চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে!' কাজেই নিশ্চিত তোমার বিরুদ্ধেই ওরা একটা দুশমনি মতলব করেছে। তুমি সাবধান থেকো।"

বিবর্ণমুখে অবন্তীমালা বলে—"আচ্ছা, তুই এখন যা হামিদা, আমি একটু ভেবে দেখি।" দীর্ঘ নিদ্রার পর সদ্য-জেগে-ওঠা কুশীগ্রামের অবন্তীমালা আবার হারিয়ে যায়, রঙীন সোনালী স্বপ্নে ছেদ পড়ে। কেমন করে এই আড়ম্বরের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত সন্দেহ-নিঃশ্বাস নিয়ে এরা বেঁচে থাকে? আধিপত্যের অধিকার লোভে অবিরাম কুমন্ত্রণার অজগরের সর্পিল বেষ্টনে এরা যেন অনন্ত বিষবৃক্ষ! এ-নাগপাশ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা বৃথা।

গুন্‌গুন্ স্বরে ফার্শী 'শের' আবৃত্তি করতে করতে আবার দেখা দেয় রোশেনা।

—"কি দিদি? এ যে দেখছি একেবারে নববধূ বেশ!"

বিষের জ্বালায় জ্বলে ওঠে অবন্তীমালা। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নেয়। নিয়ত সাপের সঙ্গে বাস করতে হলে, ওষুধ ও সাপ খেলানো, দুই-ই আয়ত্ত করতে হয়। এই ভেবেই মনের উত্তাপ সংযত করে চৌকি ছেড়ে উঠে আসে অবন্তীমালা। বলে—"এসো দিদি, বস।"

—"উঃ, আজ যে বড় আদর! খুশীতে মন উড়ছে বুঝি?"

—"তা উড়ছে বৈকি! আর তোমায় আদর করবো না? তোমার মতো আমার শুভ বুঝবার আর কে আছে বলো?"

খুশীমুখে মসলন্দপোষে বসে রোশেনা জিজ্ঞাসা করে—"তারপর? বেশভূষা দেখে তো মনে হচ্ছে আজই চলেছো অভিসারে?"

কৃত্রিম লজ্জায় হেসে চোখ নত করে অবন্তীমালা।

—"হুঁ...তা মনকে এখনও ঠিক করতে পারিনি, ভয়ও তো করে সুরক্ষিত এই প্রাসাদ উত্তীর্ণ হতে?"

—"শোন কথা! জানো তো, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়? ভয় কি? হামিদার বোরখা চেয়ে নিয়ে সুন্দর মুখ ঢেকে বেরিয়ে পড। সুলতানের পাঞ্জা হাতে দেখলে ভয়ে কেউ কেশ স্পর্শ করতে সাহস করবে না। চাও তো আমার ঝাড়ুবরদারণী একটা বোরখা ফেলে রেখেছে আমার ঘরে, সেটাও এনে দিতে পারি।"

—"থাক দিদি, আজ থাক। আর একটা দিন ভেবে দেখি।"

—"কিন্তু এই মেঘে-ধোয়া সিক্ত-জ্যোৎস্নায় প্রাসাদ-গবাক্ষের আশা-আলোর ইশারা দেখে দেখে ক্লান্ত চোখ হতাশায় সজল করে আজও কি তিনি ফিরে যাবেন?"

সজলচোখে নিরুত্তর বসে থাকে অবন্তীমালা। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে উঠে পড়ে রোশেনা।—"যা ভালো বোঝ করো। আজ তো শুনছি সুলতান সুরায় বেহুঁশ হয়ে দরবার মজলিস ত্যাগ করে সন্ধ্যার পরই

নিদ্‌মহলে প্রবেশ করেছেন। কাজেই অন্দরমহলের সুড়ঙ্গপথগুলির আলোও আজ সকাল সকাল নিববে। নইলে তো অন্দরের উৎসব জমবে না।”

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আবার মধুর হাসে রোশেনা। বলে—“তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে দিদি, এবারে বিশ্রাম কর, আর ভাবো আরো দুটি চোখ তোমার অলিন্দের দিকে চেয়ে চেয়ে হয়তো তোমার মতোই ক্লান্ত!”

রোশেনার গতিপথের ’পরে চোখের আগুন ছড়িয়ে দেয় অবন্তীমালা। কিন্তু কি করবে? কি করে ছাড়াবে এই সর্পিল বিষবন্ধন! তাকিয়ার নীচ থেকে বহুবার দেখা তালপত্রটি আর একবার বার করে আনে। কানের কাছে গুন্ গুন্ করে ওঠে রোশেনার একটি কথা—‘ক্লান্ত চোখে হতাশায় সজল করে ফিরে চলে যাবেন!’ আর অবন্তীমালা সে চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে দেবার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই বিষের জ্বালা সহ্য করে তিলে তিলে মরবে? না, মরবে না অবন্তীমালা। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় সঞ্চিত সে দু’ফোঁটা চোখের জল সযত্নে আঁচলে সঞ্চয় করবার সুখ—জীবনের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হলেও পেছপাও হবে না অবন্তীমালা। আসুক সহস্র প্রহরী! আসুক মৃত্যুর দূত স্বয়ং তভ্রোল! সকল বাধা অতিক্রম করে অবন্তীমালা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে শিশমহলের শেষের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে আবার নিরাশ হয়ে ফিরে আসে অবন্তীমালা। না, এখনও দ্বারে সতর্ক রয়েছে প্রহরী। বাইরের সুড়ঙ্গপথ বেলোয়ারিসেজের সহস্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এখনও ঝল্‌মল্ করছে! সবে তো রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর! কিন্তু এরপরও কি থাকবেন তিনি? ক্লান্ত চোখে আরও কি করবেন প্রতীক্ষা?

হঠাৎ হোঁশদারের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে অবন্তীমালা! তভ্রোল আসছেন অন্দরে! তবে যে রোশেনা সংবাদ দিয়ে গেল তভ্রোল সুস্থ নয়! সেও কি প্রবঞ্চনা! কুমতলব! দ্বিতীয়বার শোনা যায় হোঁশদারের কণ্ঠস্বর! কোথায় আসছেন তভ্রোল! এখানে নাকি? সর্বনাশ, তা হলে? অবন্তীমালা বাঁচবে কোন তৃণ আশ্রয় করে!

হামিদার সস্নেহ স্পর্শে চমকে চোখ মেলে ত্রস্তে উঠে বসে অবন্তীমালা। বিস্ময়-বিস্তৃত চোখ সংযত হয়। অপ্রস্তুতের হাসি ফুটে ওঠে মুখে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে—“ওঃ, হামিদা তুই! উঃ! স্বপ্ন দেখছিলাম তাহলে? কাল কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হোঁশদারের ডাক শোনবার পর বসে থেকে থেকে।”

হামিদা হাসে। বলে—“সুলতান কাল বিনা এত্তেলায় এসেছিলেন অন্দরের হুঁশিয়ারি দেখতে। মেজাজ খোশ থাকলে এমন আসেন মাঝে মাঝে বড় সুলতানার দরবারে। তবে বিনা এত্তেলায় অন্দরে এলেন হয়তো এই প্রথম।”

ভ্রূভঙ্গি করে অবন্তীমালা—"হঠাৎ সুলতানের নাখোশ মেজাজ এত খোশ হলো কি করে?"

—"শুনছি, কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে নাকি খবর এসেছে : সুলতান বলবন বর্ষা ক্ষান্ত না হওয়া পর্যন্ত আর আসছেন না বাঙলা জয় করতে। শরতের আলো চমক দিলে তবে নাকি তিনি দিল্লী ত্যাগ করবেন। ততদিন দীর্ঘ প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে। তাই সুলতানের মেজাজ কিছু খোশ আছে। আর সেই জন্যই তো কাল একেবারে বড়-সুলতানার খাসে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিনা এত্তেলায়!"

—"বড়-সুলতানার খাসে সুলতানকে বিশেষ খোশ মেজাজ নিয়ে আসতে হয় বুঝি?"

—"তা হয়তো নয়। হয়তো বা বহুদিন আসেননি বলেই এসেছিলেন। জানিনে সুলতানা। আমরা বাঁদী, সুলতানী হালচাল জন্ম থেকে দেখেও সব বুঝিনে। লড়াই, হামলা সম্বন্ধে বড়-সুলতানার মগজ নাকি খুব সাফ্‌সফা। তাই লড়াই বা লুণ্ঠনে যাবার পূর্বে বড়-সুলতানার কাছে সুলতান এমন আসেন মাঝে মাঝে। হয়তো পরামর্শের জন্যই আসেন। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি মেজাজ খোশ থাকে হয়তো আবার আসবেন অন্দরে। আর যদি আসেন, আসবেন নিশ্চিত শিশমহলেই। তুমি প্রস্তুত থেকো।"

না, অবন্তীমালার আর সুলতানের প্রসাদের অপেক্ষায় বসে থাকবার সময় নেই। আজই যেতে হবে। যেমন করেই হোক যেতেই হবে। আর তাঁকে প্রতীক্ষায় নিরাশ করে রাখতে পারবে না অবন্তীমালা। আসুক তন্দ্রোল। শূন্যকক্ষ দেখে যদি তার কঠিনতম শাস্তির নির্দেশ হয় তো হোক। রুদ্রতাপকে অসহ্য এই প্রতীক্ষার দুঃখের মধ্যে রেখে অবন্তীমালার বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই।

—"কি ভাবছো সুলতানা?" সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে হামিদা।

—"ভাবছি, আজ যদি সুলতান আসেন তাহলে কি হবে? আজ আমার শরীর বড় অসুস্থ।"

উদ্বিগ্নমুখে হামিদা জিজ্ঞাসা করে—"তাহলে জনাব সরিফ হকিম আহমদ শেরানকে খবর দিতে বলি?"

—"না। হকিমি ওষুধ আমি খাব না হামিদা, আমার যে ব্রত আছে? তাছাড়া অত গরম ওষুধ আমার সহ্যও হয় না। রোশেনা বলেছে এখানে নগরে নাকি ভালো হিন্দু বৈদ্য আছে, তার কাছে আমায় নিয়ে যেতে পারিস হামিদা? রোশেনার কাছে বৈদ্যের ঠিকানা না হয় কৌশলে জেনে নেবো। রোশেনা নাকি সেখানে মাঝে মাঝে যায়। ওকেই বলতাম, কিন্তু ওর সঙ্গে দুশমনি, কি জানি যদি ওষুধ বলে বিষ দিয়ে দেয়? তুই আমায় নিয়ে চল না হামিদা?"

—"সে হয় না সুলতানা। হকিম ছেড়ে যদি বৈছকে দেখাতে চাও সে-ব্যবস্থাও প্রাসাদে আছে। হকিমের বাড়ি রোগ দেখাতে যাওয়ার হুকুম নেই মহলবাসিনীদের। রোশেনা তোমায় সত্য কথা বলেনি। রোশেনার ফাঁদে তুমি পা দিও না সুলতানা। তোমায় বারবার হুঁশিয়ারি জানাচ্ছি বলে গোস্তাগী মাপ কর। তাছাড়া সুলতানের এখন মেজাজ খোশ। ফলে অন্দরের দিকে এখন তাঁর নজর বড় কড়া। বরকন্দাজ খাসবরদাররা খুব হুঁশিয়ার। এখন অন্দর থেকে বেরোনোর বিপদ আরো বেশি। চল তুমি, হম্মাম-তসবীর সেরে নাও আগে। আমি বৈছ ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি নগরে।"

—"হম্মাম আজ আর দরকার নেই হামিদা, বলেছি তো দেহ ভালো নেই। বৈছকেও আর ডাকতে হবে না তোর।"

অবন্তীমালার উষ্ণ স্বর লক্ষ্য করে উত্তর দেয় হামিদা—"মিছে আমার ওপর নাখোশ হচ্ছো সুলতানা! হামিদা বাঁদী নিমকহারাম নয়। আবার বলছি, সাবধান! রোশেনার ছলনায় ভুলে কিল্লার পথে পা দিও না।"

সস্নেহে অবন্তীমালার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—"চল হম্মাম সেরে নাস্তা করে নাও, শরীর ভালো লাগবে। প্রাসাদে এসে নিত্যি রাত জেগে জেগে সকলেরই অমন হয় প্রথম প্রথম।"

স্নান সেরে অঙ্গসজ্জার পর আবার তালপত্রখানি হাতে নিয়ে বসে অবন্তীমালা। আজকের রাত্রিও কি তবে প্রতীক্ষায় আশাহত ক্লান্ত চোখ জলে ভরে নিয়ে সে ফিরে যাবে? কিন্তু না, এভাবে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে সে আর মরতে রাজী নয়। হামিদা যাই বলুক আর রোশেনা যত বড় শক্রই হোক তবু সে-ই আজ আমার পরম মিত্র। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে ত্বড়িতপদে কক্ষ ত্যাগ করে অবন্তীমালা।

রাত্রি দ্বিপ্রহর প্রায়। মদিরামত্ত অর্ধশায়িত তত্রোল একে একে ওমরাহ ও নর্তকীদের বিদায় জানান। শেষ পানপাত্র নিঃশেষ করে উঠে বসে জড়িত কণ্ঠে হাঁক দেন তত্রোল—"কৈ হ্যায়?"

সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ করে যে প্রবেশ করে সে খিদমদগার বা হামেহালহাজিরা নয়। কালো কাশ্মীরী বোরখা উন্মুক্ত হলে পর বিস্ময়-বিজড়িত চোখ মেলে তত্রোল দেখেন—সে রোশেনা! সুরার আবেশে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করেন—"তুমি! সুলতানা-রোশেনা! এত রাত্রে! এ দুর্যোগে দরবার-মহলে!"

উত্তেজিত দীর্ঘশ্বাস বহু চেষ্টায় দমন করে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে রোশেনা উত্তর দেয়—"প্রয়োজন অপেক্ষা করতে পারবে না বলেই এত রাত্রে এ-দুর্যোগে হেরেমের মর্যাদা উপেক্ষা করে হুজুরের বিশ্রামের শান্তি নষ্ট করবার বে-আদবী বরণ করে দরবার-মহলে হাজির হবার ধৃষ্টতা হয়েছে এ বাঁদীর।"

—"কিন্তু দরবার-মহল তো সমাদর করবার বা প্রয়োজন পরিপুরণের যোগ্য স্থান নয়, সুলতানা-রোশেনা। হেরেমের মান ভাসিয়ে এতরাত্রে এ স্থানে উপস্থিত হয়ে সুলতানকে তুমি আদৌ খোশ করনি সুন্দরী। সবুর করে তলব দিলে এ বান্দা জান তুচ্ছ করেও সুলতানা-রোশেনার পঁয়জরে হাজির হয়ে খাসজুলুম রক্ষা করে ধন্য হতো।"

আভূমি কুর্ণিশ করে সুবঙ্কিম হাসে রোশেনা। বলে—"জাহাঁপনার পবিত্র মুখের অনুগ্রহ-ভাষণে ধন্য হলো বাঁদী। সময়ান্তরে সে সৌভাগ্যের সুযোগ এলে জাহাঁপনার পঁয়জর স্মরণ করবে। কিন্তু আজকের প্রয়োজন এ বাঁদীর নয়, হয়তো তা সুলতানেরই।"

—"আমার প্রয়োজন—তা আছে বৈ কি? রসিক মুঘীষ-এর চোখে তোমার খুবরু কখনই উপেক্ষার নয়।"

ব্যথিত হেসে কুর্ণিশ করে রোশেনা—"বাঁদীর সৌভাগ্য। কিন্তু সময় খুবই অল্প, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সুলতান এখনই এ-মহল ত্যাগ করুন।"

চমকে ওঠেন তব্রোল।—"মহল ত্যাগ করবো! কেন!"

জবাবে রোশেনা বলে—"শক্রভয়ে নয় জাহাঁপনা। তবে অনেক কথায় সময় হরণ করলে কার্য নষ্ট হতে পারে। জাহাঁপনা ছদ্মবেশে সুরক্ষিত হয়ে আত্মগোপন করে কিল্লার পথে অগ্রসর হোন। সংবাদ পেয়েছি, প্রাকারের উত্তর-দক্ষিণ কোণে একটি হাজারী পনসের গাছ আছে। সেই বৃক্ষের আড়ালে সুলতান যদি আত্মগোপন করে আজকের রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তবে সবিশেষ জানতে পারবেন।"

আর দাঁড়ায় না রোশেনা। আভূমি কুর্ণিশ করে দ্রুত পিছু হটে চলে কক্ষ পরিত্যাগ করে।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তব্রোল সজ্জাগার অভিমুখে গম্ভীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন।

সমস্তদিন দুযোগের পর এতক্ষণে শান্ত হয়ে এসেছে রুদ্রের রোষ। তবু এখনো যেন টিপ টিপ করে ঝড়ে পড়ছে রুদ্রের পরিশ্রান্তির স্বেদ। দীর্ঘপথ চলায় সে-স্বেদবিন্দু পড়ে পড়ে মোটা বোরখাটাও ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। সিক্ত কালো বোরখা দু'হাতে চেপে ধরে শঙ্কা-জড়িত মনে বুকের অস্থির ধ্বনি শুনতে শুনতে ভারী দেহ টেনে নিয়ে চলেছে অবন্তীমালা। সিক্ত পথের কাদা ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে ধিক্কারের মতো ছিটকে উঠে যেন কলঙ্ক এঁকে দিচ্ছে অঙ্গাবরণে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই অবন্তীমালার। বোরখার আঁখ-রোশনাইয়ের ভেতর দিয়ে কৃষ্ণা-দ্বাদশীর দ্বিতীয় প্রহরের ঘনতর অন্ধকারে সতৃষ্ণ নয়নের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতম করে দেখতে চেষ্টা করে কোথায় প্রাকার! সে আর কত দূর? তবে কি এ সমস্ত আয়োজনই রোশেনার প্রবঞ্চনা! কিন্তু না, বুকের কাছে হাত এনে এখনও অনুভব করছে তালপত্রখানা।

হ্যাঁ, এই তালপত্রই তো প্রথম আশ্বাস! তারপর আঙুলে কুলিশ-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি স্পর্শ করে দ্বিতীয় আশ্বাস লাভ করে অবন্তীমালা! বন্ধু কুলিশের পরমদান —পরশমণি।

পথের দু'ধারের রাজপুরুষদের মহল্লায় তখনও চলেছে নৃত্যগীত। মাঝে মাঝে চিন্তার সূত্র কেটে গিয়ে চমকে ওঠে অবন্তীমালা। কেউ দেখছে না তো? না, দুর্যোগে অবিন্যস্ত পথ একেবারে নির্জন। আঁধার পথের জন্য কৌতূহল নেই হয়তো উৎসবমত্ত প্রাসাদবাসীদের। এখন পথ শেষ হলে হয়! দ্রুততর চলতে চেষ্টা করে অবন্তীমালা। আর কত দূর? পথের নিশানা কি হারিয়ে ফেলেছে অবন্তীমালা? নাকি রোশেনাই ভুল পথ দেখালো? না, প্রতারিকা নয় রোশেনা। হামিদারই ভুল। ঈর্ষা হয়তো আছে রোশেনার, কিন্তু স্নেহও আছে অবন্তীমালার 'পরে। নইলে নিজের ঝাড়ুদারণীর বোরখা কেন তাকে দিতে যাবে? রোশেনাই তো আজ পরম সহানুভূতি দেখিয়ে সাহায্য করেছে। মন খুলে হেসে শুভকামনা জানিয়েছে আর হাত ধরে প্রাসাদের শেষ দ্বার পর্যন্ত এনে নিরাপদে পথে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। করুণাময়ী রোশেনার এ উপকার জীবনে ভুলবে না সে।

অবন্তীমালার বুক দ্রুততর কাঁপতে থাকে। জীবনে আবার তাঁকে ফিরে পাবে তো! কিন্তু এখনো দেখা যায় না কেন প্রাকার! দুর্যোগের রোষ এখন প্রশমিত। পথের এদিকে ওদিকে দু'চারটে খাসগেলাশ তেলে-জলে মিশে স্তিমিত চোখে মিট মিট করে জ্বলছে। নিকা উৎসবে সুসজ্জিত দুর্গপথে দেবদারু নিশানের মালা ছিন্ন ভূলুণ্ঠিত হয়ে নিকা ভঙ্গের দুঃখে যেন কেঁদে গড়াচ্ছে! উঃ ভাগ্যে কাল এসেছিল যুদ্ধ-সংবাদ! কিন্তু এই দীর্ঘ সুরক্ষিত কিল্লার পথে তো কৈ একটিও রক্ষী চোখে পড়লো না! কে জানে, হয়তো এ দুর্যোগে গৃহাশ্রয় ছেড়ে আসেনি কেউ। কিন্তু তিনি? তিনি এসেছেন তো? যদি না এসে থাকেন! না, আজ না এলেই হয়তো ছিল ভালো। কিন্তু অধীর প্রতীক্ষা-দগ্ধ প্রতি মুহূর্তের জ্বালা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে! ঐ তো বুঝি দেখা যায় সুউচ্চ ঘন কালো ছায়া! ওটাই হয়তো প্রাকার সীমা! আর দূরে···ঐ বুঝি হাজারী পনসের গাছ! দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মুণ্ডু নিয়ে নিকষ কালো মৃত্যুদূতের মতো! অস্থির বুক দু'হাতে চেপে ধরে বিবশ পায়ে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে দ্রুততর চলতে চেষ্টা করে অবন্তীমালা। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু যদি একান্তই আসে, তার পূর্বক্ষণে প্রাকারের উত্তর-দক্ষিণ কোণ স্থির রেখে সঠিক স্থানে পৌছতে পারবে তো?

যাক! এত দুঃখের পর—শেষ পর্যন্ত সে-প্রাণ নিয়ে এসে পৌছতে পেরেছে। ঠিক এইটেই তো প্রাকারের উত্তর-দক্ষিণ কোণ? হ্যাঁ, ঐ তো দেখা যায় উত্তরের তারা! মেঘের আড়াল থেকে হাসছে মিটি মিটি অবন্তীমালাকে আশ্বাস

দিয়ে। দূরে থেকে তাকে দেখতে পেয়েই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে প্রাকাররক্ষী নিচে নেমে এসে অদূরে দাঁড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ ছায়া দেখে দ্রুততর কাঁপে অবন্তীমালার বুক। হে ভগবান! এ ছায়া যদি অপর কারো হয়!

গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করে প্রাকাররক্ষী—"আপনার পরিচয়?"

রক্ষীর কণ্ঠ অর্ধস্ফুট কম্পিত মনে হয়। হয়তো রক্ষীর বুকেও তার মতোই গুরু গুরু করে উঠেছে আশার সম্ভাবনা। টন্ টন্ করে ছিঁড়ে পড়তে চায় অবন্তীমালার বুক—কত দুঃখের পরে এত সুখ! ক···ত যুগ শোনেনি কানে, অন্তরে নিয়ত শ্রুত এই প্রিয় কণ্ঠস্বর!

দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করে রক্ষী—"আপনার পরিচয় দিয়ে অনুগ্রহপূর্বক রক্ষীর কর্তব্য পালনে সহায়তা করুন।" শেষের দিকে বুঝি ঈষৎ কেঁপে ওঠে রক্ষীর কণ্ঠ।

হায় ভাগ্য! অবন্তীমালারও আজ পরিচয় প্রয়োজন! উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে অবন্তী। বহুকষ্টে বুক চেপে ধরে অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে—"আ···মি···অবন্তীমালা"।

নিঃশব্দে কেটে যায় কিছুক্ষণ। থম্ থম্ করে প্রাকারের ছায়ায় ঢাকা ঘন মেঘের অন্ধকার। অবশেষে রক্ষীর কণ্ঠস্বর আবার পরিষ্কার শ্রুত হয়—"সুলতান-প্রাসাদের সুন্দরীদের পক্ষে এ-স্থান মোটেই নিরাপদ নয়।"

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে অবন্তীমালা। বুকের স্পন্দন রুদ্ধ হয়ে দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন মৃত্যুর চেয়েও স্থির হিমশীতল হয়ে গিয়েছে তার। মনে হলো একটি অঙ্গুলি চালনার শক্তিও বুঝি নেই আর মৃতপ্রায় অবন্তীমালার। কেবল কোথা থেকে যেন একটা অস্পষ্ট ধ্বনি ঝিম্ ঝিম্ করে বলছে—'হারিয়ে গিয়েছে—কুশীগ্রামের রুদ্রতাপ। হারিয়ে গিয়েছে অবন্তীমালার অনির্বাপিত আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর বহু সাধনার ধন!' গুরু-গুরু মৃদু গম্ভীরস্বরে হয়তো সেই কথারই সায় দিয়ে যায় আকাশের কালো মেঘ। বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় বোরখা-ঢাকা অবন্তীমালাকে দেখে অজানিতে এগিয়ে এসে চমকে থেমে যায় রক্ষী। আশার আলোকে উদ্ভাসিত অবন্তীমালার প্রাণে সাড়া জাগে। মাথা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হঠাৎ রক্ষীর কণ্ঠে এ কী শুনছে সে! পরিষ্কার স্বর—"এমন দুর্যোগে মহল ত্যাগ করে আসা উচিত হয়নি সুলতানা।"

সুলতানা! ঐ একটি শব্দেই যেন আবার নিজেকে ফিরে পায় অবন্তীমালা! বোরখা ফেলে স্বকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গ্রীবা হেলিয়ে সম্রাজ্ঞীর গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দেয়—"সুলতানার শুভাশুভ তাঁর অপরিচিত নয়, সেটা সামান্য প্রাকাররক্ষীর বিচারাধীন নয়।"

আভূমি কুর্নিশ করে দু'পা পিছিয়ে যায় রুদ্রতাপ। নিজেকে আর সংযত করতে পারেনা অবন্তীমালা। অবিরল ধারা নেমে আসে চোখে।

বুকের ভিতরের প্রচণ্ড ঝড়ের আলোড়নে হেলে পড়ে উন্নত গ্রীবা। মূককণ্ঠ যেন চিৎকার করে বলতে চায়—"বজ্র! তুমিও মিথ্যা!" উত্তরে ক্ষণিক ঝলকে সাড়া দেয় বিদ্যুৎ। গুরু-গুরু গম্ভীর গর্জনে আকাশের মেঘ যেন কোনো সান্ত্বনার বাণী শোনায়! মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তম্ভিত বিস্মিত চোখে ধীর পায়ে আবার এগিয়ে আসে রক্ষী। এত সুন্দর! এত রূপে ভরেছে গুল্মাবনে ঘেরা কুশীর অস্থির তরঙ্গিণী! আবার ক্ষণিক ঝলকে হেসে ওঠে বিদ্যুৎ! মূঢ় দৃষ্টি মেলে রক্ষী পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে নিকটে, আরো নিকটে। অশ্রুসিক্ত ঐ করুণ মুখ দেখে হয়তো মনে পড়েছে আর একদিনের মেঘে-ধোয়া সলজ্জ মুখ! সজল চোখে রক্ষীর দিকে চেয়ে অবন্তীমালার পৃথিবী হারিয়ে যায়। বুকের অস্থির তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিস্ময় বিমূঢ় রক্ষীর বুকে।—"আর পারি না। পারি না আমি আর নিয়ত অজগরের বিষ-নিঃশ্বাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। পারি না আর পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা সয়ে বেঁচে থাকতে।"

নিভে গিয়েছে বিদ্যুতের ক্ষণিক হাসি। প্রাকারের ছায়ায় ঘেরা অন্ধকার আরো ঘন নিবিড় হয়ে এসেছে। বক্ষসংলগ্ন অবন্তীমালার অশ্রু-ধোয়া মুখ আর দেখা যায় না। রক্ষীর বলিষ্ঠ বাহু তাকে আবদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে নেমে পড়ে। তার বুকের রক্তের অস্থির সংগ্রামের আর্তনাদ হয়তো নিজের অন্তরের উদ্বেল আকুলতায় অবন্তীমালা শুনতে পায় না। রুক্ষ পেশী-আবরিত বুকে অসহায় উন্মত্তের মতো মাথা ঘষে কান্না-জড়িত কণ্ঠে অবন্তীমালা জিজ্ঞাসা করে—"কিন্তু তুমি! তুমি কেমন করে ভুলে রয়েছো তোমার বজ্রসাক্ষী-করা পরিণীতাকে?"

শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস চতুর্দিকের ঘন তমিস্রা ভেদ করে নিরুপায় করুণ আক্ষেপের সুরে কি যেন বলে গেল!

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবন্তীমালার ব্যাকুল বন্ধন সন্তর্পণে ছাড়িয়ে নেয় রুদ্রতাপ। বিষাদ-গম্ভীরকণ্ঠে বলে—"ভুলে যাইনি বজ্রসাক্ষী-করে-রাখা সেই প্রতিজ্ঞা। অক্ষম হতভাগ্য আমি, তাই সেদিন রক্ষা করতে পারিনি আপন পরিণীতাকে। কিন্তু এতদিন পরে আজও তো মুক্তিলাভের কোনো উপায় দেখছি না।"

অশ্রুসিক্ত মুখে অপরূপ হাসে অবন্তীমালা। মেঘের ফাঁকে কৃষ্ণা দ্বাদশীর ভাঙা চাঁদ উঁকি দিয়ে ডুবে যায়। কান্না-জড়িত রুদ্ধকণ্ঠে অবন্তীমালা উচ্চারণ করে—"ছলনাভরে অজগরের ক্ষুধার্ত চোখে আচ্ছাদন দিয়ে দু'হাত মৃত্যুর শীতল হাতের ওপর রেখে নিজেকে তোমার বুকের কাছ পর্যন্ত টেনে এনেও কি শুনবো সেই অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস যা কেবল অক্ষম নিরুপায়েরই সম্বল?"

—"সামান্য প্রাকাররক্ষীর বুকে অনুতাপানলের ধূম ভিন্ন বুদ্ধি দিয়ে কি আর কিছু পাওয়া যায় সুলতানা? না, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

রক্ষীর করুণকণ্ঠের অস্থির আবেদন বুঝি আপন অন্তরের আর্তনাদে শুনতে পায় না অবন্তীমালা। শুষ্ক কণ্ঠে বলে—"বুদ্ধি! জানি বুদ্ধির রূপ সকলের এক নয়। অবন্তীমালার বুদ্ধি প্রাসাদের অস্ত্র ঝন্ঝনির ভয়ে বিভ্রান্ত হয়নি। অপর কেউ হলে হয়তো নিরুপায় দীর্ঘশ্বাসে জীবন ক্ষয় করতো। কিন্তু সে কথা থাক। আজ সুলতানার বুদ্ধি যদি চায় ভিক্ষান্নে জীবন যাপন? যদি চায়—রক্ষী সুলতানের প্রাকাররক্ষীর দায় পরিত্যাগ করে রুদ্রতাপ রূপে ভিক্ষান্নে অবন্তীমালার জীবনরক্ষার দায় গ্রহণ করুক? রক্ষা করুক ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা?"

চমকে ওঠে রুদ্রতাপ।—"ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা!···কিন্তু না···সে তো আর হয় না। একবার সুলতানের প্রাসাদে সুলতানা হলে পর আর রুদ্রতাপের ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করা যায় না। ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞারও তখন অপমৃত্যু ঘটে।"

মনের অস্থির ব্যাকুলতায় অবন্তীমালা এগিয়ে আসে অজানিতে। রক্ষীর অতি নিকটে এসে বর্শাধৃত হাতখানি চেপে ধরে। আকুলকণ্ঠে বলে—"যায়, রুদ্রতাপ যায়। প্রয়োজন হলে ভিক্ষান্নেও জীবন যাপন করা যায়। কিন্তু অত কথা আর যুক্তি-তর্কের অবতারণা এখন নিরর্থক। তোমার পায়ে আমার শেষ প্রার্থনা: তোমার অবন্তীমালাকে সুলতানা-রূপে মরতে দিও না রুদ্রতাপ। বিশ্বাস করো, তোমার ভিক্ষান্নেই অবন্তী সত্যিকারের বাঁচতে চায়।"

অবন্তীমালার হাতখানি ধীরে সরিয়ে দিয়ে রুদ্রতাপ ব্যথিত গভীরকণ্ঠে বলে—"এ তর্কের শেষ সহজ নয়। সেজন্য সময় এবং স্থান কোনটাই অনুকূল নয়। তর্কে বিলম্ব হলে সুলতানার বিপদ আসন্ন হতে পারে। সুতরাং এখন প্রাসাদে ফিরে যাওয়াই শুভ।"

পা দুটো যেন আর বহন করতে পারে না অবন্তীমালার বিবশ কম্পিত দেহ! মরণোন্মুখ ওষ্ঠের মতো হিমশীতল অসাড়তায় সে কাঁপতে থাকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে কিছুটা সংযত করে বলে—"শুভ! শুভাশুভের রূপ কি কখনো প্রত্যক্ষ করেছো? অনুভব করেছো কি কখনো কালান্তক অজগর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কেমন করে তীক্ষ্ণ অগ্নিচোখে চেয়ে মুখ ব্যাদানের পূর্বে তার উত্তপ্ত বিষনিঃশ্বাস ফেলে সর্বশরীর জর্জরিত করে!" উত্তেজনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে অবন্তীমালার। সজোরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলে—"ভাবী সুলতানাকে নিঃশেষে হত্যা করে আজ মুক্তিস্নান করেছে অবন্তীমালা। জীবনের শেষ জিজ্ঞাসা করে সে চিরতরে বিদায় নেবে।" নীরব নিস্তব্ধতায় চতুর্দিকের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে আসে। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে অবন্তীমালা। ঘুরে-ফিরে একই জিজ্ঞাসা মনে জাগে। আবার আকুতি জানায়—"চল, চল রুদ্রতাপ, এই দুর্যোগই শুভ-সংকেত জানাচ্ছে

আগামী দিনের। মেঘে মেঘে তারারও চোখ ঢাকা। চল, অতি গোপনে চলে যাই দু'জনে ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বেশে—দূরে···বহু দূরে। দেশান্তরে গিয়ে সুখের গান গেয়ে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করব।"

অন্যমনে প্রশ্ন করে রুদ্রতাপ—"কিন্তু···কোন পরিচয়ে?"

—"পরিচয়? ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরিচয়ের কিবা প্রয়োজন রুদ্রতাপ?" অবন্তীমালার কণ্ঠ হতাশক্ষুব্ধ।

—"সে হয় না, সে হয় না সুলতানা। অনেক ভেবেছি। বিগত দীর্ঘ রাত্রিদিন ভেবেছি। ব্রাহ্মণকুমার রুদ্রতাপ সুলতানা-ভর্তা হতে পারে না। আর সুলতানাও মরে অবন্তীমালায় ফিরে যেতে পারে না।"

—"কেন, কেন পারে না রুদ্রতাপ? কোন্ পাপের বাধা রুদ্ধ করেছে ব্রাহ্মণ-কন্যা অবন্তীমালার জীবনের পথ?"

—"পাপ? পাপ, ধর্মান্তরে।"

আবার নিস্পন্দ হয়ে যায় অবন্তীমালা। হাহাকার জাগে বুকে। চীৎকার করে যেন বলতে ইচ্ছা করে—কোথায় তুমি বজ্র! সে-দিনের সেই প্রতিশ্রুতির সাক্ষী! বল এখন আমি কী করি?

নিস্তব্ধতা ভেঙে রুদ্রতাপ উক্তি করে—"আর বাধা আমার পূর্বপুরুষ। আমার পিতৃপুরুষ আজও বেঁচে রয়েছেন আমার মধ্যে নিত্য-পিণ্ডের আশায়। আমার পরেও তাঁরা থাকবেন আমার সন্তানের মধ্যে কুশীভট্ট নামে নিত্য-পিণ্ডের আশায়। মরজীবনের সুখের স্রোতে পিতৃপুরুষের সেই জন্মজন্মান্তরের অমরত্ব ও অর্জিত পুণ্য বিসর্জন দেওয়াকে রুদ্রতাপ স্বার্থান্বেষীর অসংযমী-দৃষ্টির পরিচয় এবং মহা পাপ-কর্ম বলেই মনে করে।"

আগুনের শিখা ছুটে বেড়ায় অবন্তীমালার ধমনীতে ধমনীতে। উত্তপ্ত উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

নিম্নকণ্ঠে শঙ্কিত রুদ্রতাপ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে—"সংযত হও। নিকটেই তৃতীয় ব্যক্তির নিশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে।"

রুদ্রতাপের সাবধানতায় কর্ণপাত করে না উত্তেজিত অবন্তীমালা। কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ঢেলে জিজ্ঞাসা করে—"পাপ? নিষ্পাপ বালিকাকে ধর্মচ্যুতা বলে বিধর্মী-কর্দমে নিমজ্জিত হতে বাধ্য করায় পাপ নেই? পাপ নেই নিরপরাধ প্রাণকে বিনষ্ট করায়? পাপ নেই কি পূজার নৈবেদ্য শৃগালের ভোগে নিক্ষিপ্ত করায়?"

—"ধর্মের মন্দির মার্জনায় অমন কত বালুকণার প্রাণ জলে ধুয়ে যায়, কত বালুকণা নষ্ট হয় মন্দির রচনায়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে শুধু তাদের জীবনের বিনিময়ে-গড়া ধর্মের নির্মল সৌধ!" রুদ্রতাপের কণ্ঠ কিন্তু বড় করুণ ও নির্জীব শোনায়।

—"তোমাদের ধর্মসৌধের ইতিবৃত্ত জন্ম থেকেই শুনে আসছি, কিন্তু আজ

নিজের জীবন দিয়ে সে-সৌধের রূপ ও মাহাত্ম্য চিনে ফেলেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার প্রাণের মূল্যে যে-সৌধ গড়ে ওঠে, সে-সৌধ থেকে একটি করে কণা চ্যুত হয়ে আবার তা ভেঙেও পড়ে। তখন সে জীর্ণ-সৌধের নির্মলতা আর অস্তিত্ব গঙ্গোদক দিয়ে কিংবা শত বাধা নিষেধের প্রাচীরে তুলেও রক্ষা করা সম্ভব হয় না রুদ্রতাপ। কিন্তু থাক ও-সব কথা, থাকুন তোমার অমর পিতৃপুরুষ, থাকুন তোমার ধর্ম-সৌধ তোমার মনের রুদ্ধ মণিকোঠায়। শুধু তোমার একটি কথা শুনে আমায় বিদায় নিতে দাও। তুমি···তুমি আজ এখানে এসেছো কেন? কেন প্রত্যহ রাত্রির পর রাত্রি ঐ প্রাসাদের গবাক্ষপথে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে থাক? শুধু কি অবন্তীমালার সুলতানা-রূপ দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসবার জন্য?"

রুদ্রতাপের বিস্মিত ব্যথিতকণ্ঠ অস্ফুট উচ্চারণ করে—"বিদ্রূপের হাসি!"

—"হ্যাঁ, এ ম্লেচ্ছ পুরবাসিনী যদি গ্রহণযোগ্যই না হতো তবে কেন পাঠিয়েছিলে সেই স্মৃতিলাঞ্ছিত তালপত্র? সুলতানা সাক্ষাতের আশায় নয় কি?"

উদ্বেলিত অশ্রু সবলে রোধ করে রুদ্ধকণ্ঠে রুদ্রতাপ বলে—"সুলতানার এখন মহলে ফিরে যাওয়াই কর্তব্য। বৃষ্টি আবার মহা আড়ম্বরে এল বলে।"

—"না, না, আমার প্রশ্নের উত্তর চাই। শেষ উত্তর না শুনে যাব না আমি। প্রাসাদের পথ আর আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, সুলতানা ও অবন্তীমালা দু'জনেই একসঙ্গে যাবে। কি···স্তু বল, কেন পাঠিয়েছিলে সেই কলঙ্কিত অভিজ্ঞান?" পা আর স্থির রাখতে পারে না অবন্তীমালার হতাশগ্রস্ত দেহভার। রুদ্রতাপের জানু ধরে লুটিয়ে পড়ে।

হঠাৎ মেঘের সংঘর্ষে বজ্র নির্ঘোষিত হলো। আকাশের বুক চিরে সহস্র ফণা মেলে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে জড়িতকণ্ঠে রুদ্রতাপ বললে—"তালপত্রের মন্ত্রে সুলতানার সিংহাসন পরিবর্তন সম্ভব নয় বলেই।"

অকস্মাৎ কে যেন চীৎকার করে উঠলো—'ছলনাময়ী! পিশাচী!'

আর সঙ্গে সঙ্গে হাজারী গাছের আড়াল থেকে তরবারি-ঝনৎকারে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল কৃষ্ণ বোরখাবৃত এক দীর্ঘ দেহ! চমকে উঠে দাঁড়ালো অবন্তীমালা।

বিমূঢ় রুদ্রতাপ সরে গিয়ে ভীতকণ্ঠে উচ্চারণ করে—"সুলতানের কণ্ঠস্বর! স্বয়ং সুলতান!"

স্থির নিশ্চল হয়ে মৃত্যুদূতের দিকে অপলক চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অবন্তীমালা। ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে রুদ্রতাপ। বলে—"এস অন্তি, এস আমরা পালাই।"

এক হাতে বর্শা অপর বাহুতে অবন্তীমালাকে দৃঢ় বক্ষ-সংলগ্ন করে

ব্যগ্র আকুলকণ্ঠে বিভ্রান্ত রুদ্রতাপ উচ্চারণ করে—"সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু। আর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না অন্তি। এস আমরা পালাই, চলে যাই ভিক্ষু ভিক্ষুণী হয়ে। আমার বুক দিয়ে তোমাকে রক্ষা করবো, আর কেউ লুটে নিতে পারবে না।"

সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে কৃষ্ণ বোরখাবৃত মূর্তি! সেদিকে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে চীৎকার করে ওঠে অবন্তীমালা—"তুমি পালাও রুদ্রতাপ। পালিয়ে যাও। আর দেরী করো না। তোমার পায়ে পড়ি।"

—"সে হয় না অন্তি, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না। এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়। অনেক সহ্য করেছি, আর পারি না।"

আরো এগিয়ে আসছে কৃষ্ণছায়া। তবু নড়ে না অবন্তীমালা! পূর্বের মতোই চক্ষু স্থির রেখে বলে—"পারবে রুদ্রতাপ, পারবে। পালাও, পেছনে ডাকছে তোমার ধর্ম! তোমার পিতৃপুরুষ! পালাও, পালিয়ে তোমার ধর্মপ্রাণ রক্ষা করো। আমার নিজের রক্ষাকবচ—আমার ধর্ম, আমার অন্তরে।"

এতক্ষণে রুদ্রতাপের চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে। অবন্তীমালার কাঁধে উন্মত্তের মতো মাথা ঘষতে ঘষতে বলে—"না, না, তা হয় না অবন্তী, আর তোমাকে ছেড়ে যাব না আমি। নিঃশেষে তোমাকে যে হারাতে পারি না তা কি তুমি জান না? মিছে অভিমান করো না অন্তি। যা বলেছি ভুলে যাও লক্ষ্মীটি। ওসব মিছে, শুধু মিছে, আমার অন্তরের কথা নয়। এখনও সময় আছে, এস, এস পালাই।" কথা শেষ করেই চলবার উদ্দেশ্যে রুদ্রতাপ অবন্তীমালাকে হাত ধরে আকর্ষণ করলো।

আচম্বিতে আকাশে ভয়ঙ্কর বজ্র নির্ঘোষ হলো। চোখের পলকে কী যে ঘটলো বোঝা গেল না। রুদ্রতাপ স্তম্ভিত ও নিশ্চল হয়ে গেল। অবন্তীমালা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো।

অকস্মাৎ কর্ণবিদারী সেই বজ্রনিপাতে সুলতান হতচকিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিভ্রান্ত সুলতানের আত্মস্থ হয়ে ব্যাপারটা বুঝতে কিছু সময় কেটে গেল। তারপর সমস্ত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে তিনি অগ্রসর হলেন। আবার কড় কড় শব্দে এঁকে-বেঁকে মেঘ কেটে নেমে এল বিদ্যুৎ! ক্ষণিকের সেই স্বল্পালোকে অদূরবর্তী হতচৈতন্য মূর্তিদ্বয়ের দিকে মূঢ়দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তব্রোল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁক দিলেন—"কৈ হ্যায়!"

মশাল হাতে রক্ষীদল ছুটে এসে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো—"হুকুমদার হুঁশিয়ার, সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ ওয়া-স্-সালাতীন আবুল ফতে তব্রোল।"

অগ্রসরমান অনুচরদের সম্বোধন করে সুলতান কি যেন বলতে চাইলেন,

কিন্তু পারলেন না। তৎপর অদূরবর্তী মূর্তিদ্বয়কে অঙ্গুলি নির্দেশে বন্দী করবার আদেশ দিয়ে বিষণ্ণমুখে স্থান ত্যাগ করলেন তন্দ্রোল।

সূর্যোদয় না হতেই ঘা পড়েছে হরশঙ্করীর দরজায়।

—"এত রাত্রে আবার কোন মুখপোড়া!"—কাঁঠাল কাঠের জীর্ণ দুয়ারের অর্গল খুলতে খুলতে ঝঙ্কার দিয়ে বলেন হরশঙ্করী। তারপর দুয়ার খুলে মৃৎপ্রদীপ তুলে ক্ষীণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে চেষ্টা করেন আগন্তুকের মুখ।

আগন্তুক নগরপ্রান্তের চতুষ্পাঠীর আচার্য গোপীবল্লভ সাহিত্যরত্ন। নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"বৈদ্যরত্ন জেগে আছেন কি আই?"

মুখ ঘুরিয়ে উচ্চকণ্ঠে আই জবাব দেয়—"বদ্যি না, বদ্যি! শালিক চিনেছেন গোপালঠাকুর! দিন-রাত্তির তো পুতলা সাজ নিয়ে খেলে, বদ্যির বিদ্যে তার কোন পেটে বাপু? বদ্যির মানই বা তাকে দেয় কে? আর কেনই বা দেবে? কারু কাছে যায়? না বসে? তা বলি, বদ্যির খবর করছ কেন? শরীরের গতিক ভালো তো?"

—"তা গোপীনাথের কৃপায় এক রকম চলেছে। বৈদ্যরত্নকে একবারটি খবর দাও আই, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

—"বৈদ্যের সঙ্গে অত কথার প্রয়োজন কি বাপু? নজর এনেছো কিছু?"

—"আহা বৈদ্যরত্ন আমাদের তেমন নয়, নজরানার প্রয়োজন হয় না। হকিমি চাল ধরেননি তো এখনো?"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর অতি নিচুতে এনে হরশঙ্করী বলেন।—"তা যা বলেছো বাবা, ব্যাভারটি কিন্তু বড় ভালো। মুখের কথায় চন্দর-সূয্যি বশ হয়। আহা, আই বলে যখন ডাকে, এ বুড়ীরও শোক শীতল হয়। তবে ওষুধ, শেকড় টেকড়ের বিষয়ে তেমন যে কিছু জানে মনে তো হয় না, তা তোমরা যাই বল। আমার এই চোখটি এই বয়সে একেবারে জ্যোতিহীন। এতদিনেও তার কিছু কিনারা করতে পারলে না। কেবল—কথা দিয়ে কথা ঢাকে। বলে, হবে আই হবে। বলি, আর হবে কবে? দেখতে দেখতে যে ছয় চাঁদ পার হলো।"

আই কথা আরম্ভ করলে তাকে চুপ করানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। গোপীবল্লভের তা অজ্ঞাত নয়। তাই হেসে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে গোপীবল্লভ বলেন—"আহা, তোমার চক্ষুর জন্যই তো এত রাত্রে আসা। একটি বৃদ্ধমূল আর পদ্মমধু খোঁজ করে আনতে বলেছিলেন বৈদ্যরত্ন রাত্রি প্রভাতের পূর্বে। তাই তো এত রাত্রে এলাম এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে। বৈদ্যরত্নকে একবার ডাক। হাতে হাতে মূল ও মধু বুঝিয়ে দিয়ে যাই।"

ঘরের চৌকাঠ ছেড়ে এগিয়ে আসেন বৃদ্ধা।—"ওমা! তাই নাকি? আহা বাবাঠাকুর উঠে এস, দাওয়ায় উঠে বসো। যে কাদা হয়েছে উঠনে! এস

বাবা, আমি ততক্ষণ বৈদ্যঠাকুরকে ডাকি। তার আবার যা ঘুম। এখন তাড়া করে উঠলে হয়।"

প্রদীপ হাতে পিছন ফিরতেই দেখেন যাঁর উদ্দেশ্যে এত কথা, তিনিই পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। অপ্রতিভ ভাবটুকু অস্বীকার করবার জন্যই যেন গলায় জোর দেন আই—"ওমা। তুমি এসে আবার দাঁড়ালে কখন? সারারাত ভাঙা ঘরের জল ছেঁচে এই তো শুতে গেলে!"

বৈদ্যরত্ন বৃদ্ধার কথার উত্তর না দিয়ে দাওয়ায় নেমে একখানি কুশাসন হাতে অভ্যর্থনা জানান গোপীবল্লভকে।—"আসুন মহামান্য আচার্য, আসন গ্রহণ করে এ ভাগ্যবানকে কৃতার্থ করুন। কিন্তু এত রাত্রে? সংবাদ সব ভালো তো? মহাতাশ্রয় আচার্যের সর্বাঙ্গীণ কুশল তো?"

দাওয়ার নিচে কাষ্ঠপাদুকা ও অভ্রছত্র রেখে উঠে এসে নিম্নকণ্ঠে বলেন গোপীবল্লভ—"গোপীনাথের ইচ্ছায় চতুষ্পাঠী ও আশ্রমের কুশল বটে, কিন্তু অপর এক বিপদ উপস্থিত।"

—"বিপদ। কার বিপদ! শীঘ্র প্রকাশ করে নিরুদ্বেগ করুন।"

হরশঙ্করী প্রদীপ হাতে ঘরের কর্দমাক্ত জল মৃৎভাণ্ডে তুলে এনে দাওয়ার নিচে ফেলতে লাগলেন। বৈদ্যরত্নের কথায় কান রেখে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে গোপীবল্লভ বলেন—"বৃদ্ধার দুঃখ নির্মম! বৈদ্যরত্ন, তুমি এখন এ বৃদ্ধার আশ্রয় ত্যাগ কর। ইতিমধ্যেই তোমার হাতযশ নগরবাসীর মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। তুমি সহজেই নগরবাসের উপযোগী উপার্জন করতে সক্ষম হবে।"

মৃদু হেসে হরিশ্চন্দ্র উত্তর দেন—

"চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।
গণ্ডূপদার্থি মণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।

একে একে নগরে গিয়ে বাসা বাঁধলেই তো আর গৌড়বাসী উন্নত হবে না। নগর উন্নত হবে মাত্র। আমার এতে কোনো অসুখ বোধ হয় না। মমতাময়ী বৃদ্ধার সরল ব্যবহারে আমি প্রকৃতই শান্তিতে আছি। আমার গ্রামের নিজ গৃহও তো প্রায় অনুরূপ। এখন আপনার আগমন কারণ জানতে আমি উদ্বিগ্ন।"

নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়েন গোপীবল্লভ।—"বিষম বিপদে পড়েই এসেছি। বল্গকপুর দুর্গ মধ্যে এক ব্রাহ্মণ প্রাকাররক্ষীর বজ্রাঘাত হয়েছে। সুলতানের আদেশে যবন জহ্লাদরা তার দেহ খণ্ডিত করে কণ্টকিত কবরের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু আমরা নগরে এত হিন্দু থাকতে এ অধর্মের কি একটা প্রতিকার হবে না?"

—"কিন্তু সুলতানের এরূপ নিষ্ঠুর আদেশের কারণ কি?"

—"কারণ অবশ্য ঘটেছে এবং তা গুরুতরও বটে। কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি এরূপ শাস্তির বিধান একান্তই নিষ্ঠুর!"

—"জীবিতদের শিক্ষার জন্যই কঠোর শাস্তির প্রয়োজন, এ তো আপনাদের শাস্ত্রেও বিহিত আছে।"

—"তা বটে, কিন্তু···যুবক রুদ্রতাপ ভট্ট এই পুত্রহীন হতভাগ্য ব্রাহ্মণের একমাত্র পিণ্ডদাতা ভাগিনেয়।" ব্যগ্র হয়ে বৈদ্যরত্নের হাত চেপে ধরেন গোপীবল্লভ।—"এর একটি উপায় তোমায় করতেই হবে বৈদ্যরত্ন।"

বৈদ্যরত্নের বিস্মিত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়—"রুদ্রতাপ ভট্ট আপনার ভাগিনেয়! কুশীগ্রামের রুদ্রতাপ ভট্ট?"

—"হ্যাঁ বাবা। তোমার কি তার সঙ্গে পরিচয় আছে?"

—"ছিল বালক বয়সে। কিন্তু তার এ-দুর্ঘটনা দুর্গ মধ্যে ঘটলো কেমন করে?"

—"আর কি করে বলি আক্ষেপের কথা! আজকালের গতি প্রকৃতি! যবনেরা দেশ ছেয়ে ফেলেছে! যুবা-সমাজের মতিগতিও তাই যবন প্রকৃতির। একমাত্র বংশধর ব্রাহ্মণকুমার পিতৃপুরুষের যজন-যাজন অধ্যাপনা বৃত্তি পরিত্যাগ করে বংশে কালি দিয়ে যবনের অধীনে বৃত্তি গ্রহণ করে প্রাকাররক্ষী হয়েছিল। বহুদিন গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশ। পিতা চোখের জল ফেলে ফেলে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। এতদিন পর সংবাদ পেলাম সে পতিত হয়েছে। তা থাক, তবু প্রাণে বেঁচে আছে জেনেই আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। কিন্তু এইমাত্র সংবাদ পেলাম প্রাকাররক্ষী রুদ্রতাপকে ও তার কণ্ঠলগ্না সুলতান প্রাসাদের এক বাঁদীকে বজ্রাহত অবস্থায় প্রাকারের নিচে দুর্গ মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এবং সে-দৃশ্য নাকি প্রথম দেখেছেন ছদ্মবেশী সুলতান! সুলতানের ক্রোধ মৃতকেও করুণা করে না তা তো জানো?" বৈদ্যরত্নকে অন্যমনা ও নিরুত্তর দেখে গোপীবল্লভ আবার বলেন—"সম্প্রতি ইরাণ থেকে আগত এক ম্লেচ্ছ নাকি সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, মুমূর্ষুদের সে সুস্থ করে তুলবে! কারণ রাজবৈদ্য এসেও তাদের এ-যাবৎ জ্ঞানসঞ্চার করতে পারেননি। সুলতান প্রথম ঐ বাঁদীকে দিয়েই নাকি ইরাণীর বিদ্যা পরীক্ষা করবেন। আর রুদ্রতাপের অপরাধের জন্য শাস্তির নির্দেশ হয়েছে—দেহ বিখণ্ডিত করে কাঁটার কবর!"

—"কিন্তু এ-বিপদে এ অধমের দ্বারা কোন কার্য সাধিত হতে পারে?"

—"ইতিপূর্বে একদিন তর্কস্থলে তুমি প্রচার করেছিলে—বজ্রাহত হলেও আরোগ্যলাভের উপায় বৈদ্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এখন তোমার সেই বাক্যের সত্যতা প্রমাণের সুযোগ উপস্থিত। তোমার সেই ঔষধের গুণপরীক্ষা চাই। শুনেছি, সুলতানও নাকি তাঁর ভাবী-পত্নীর জন্য সাতিশয় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন···"

—"সেকি! এই যে বললেন বাঁদী?"

গোপীবল্লভ মৃদু হাসেন।—"সত্য সংবাদ কি আর গোপন থাকে? প্রকৃত

সংবাদ ইতিমধ্যেই নগরে গুঞ্জরিত হচ্ছে। সেই নারী নাকি এক ব্রাহ্মণ-কুমারী। এবং তার সঙ্গেই সুলতানের গতকাল নিকার কথা ছিল।"

—"তাহলে সেই ব্রাহ্মণকুমারী ভাবী-সুলতানাও এখন যবন-কবলিত ?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু ব্রাহ্মণকুমারী আর এখন ব্রাহ্মণী নয়, যবনী। কিন্তু রুদ্রতাপের যজ্ঞসূত্র বর্তমান।"

বৈদ্যরত্ন মৃদু হেসে বলেন—"তা বটে! কিন্তু এ স্থলে সামান্য এই পতিত ব্রাহ্মণের কি কর্তব্য ? আর ঔষধের প্রমাণ দেওয়ার সুযোগই বা কি ভাবে পাওয়া যাবে ?"

—"যাবে। তুমি যদি ভাবী-সুলতানাকে আরোগ্য করতে পার তাহলে তার বিনিময়ে রুদ্রতাপকে ফিরে পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কার্যে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ভালো করে নিজের মধ্যে বিচার করে দেখ সে-বিদ্যা প্রকৃতই তোমার আয়ত্ত কি না!"

—"শাস্ত্র যদি মিথ্যা না হয় তবে বিদ্যাও অনায়ত্ত হওয়ার কারণ নেই।"

—"তবে চল, এখনই কার্যে অগ্রসর হই। প্রভাতের পূর্বেই প্রাসাদে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, শুনেছি সূর্যোদয়ের পরই নাকি সুলতানের আদেশ কার্যকরী হবে।"

চিন্তিতমুখে বৈদ্যরত্ন বলেন—"কিন্তু কিছু ভেষজ সংগ্রহের প্রয়োজন।"

—"সেজন্য চিন্তা করো না। যা প্রয়োজন এই রাত্রেই আমি যে প্রকারে পারি যোগাড় করবো! তা ছাড়া চলেছো সুলতান প্রাসাদে, সুলতানের মেজাজ তুষ্ট করতে পারলে পরশপাথর প্রয়োজন হলেও চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু স্মরণ রেখো সুলতানের কাছে যে কোনো কার্যের প্রতিশ্রুতি অর্থই স্বীয় মুণ্ডের প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতির সফলতায় যেমন বহু মুণ্ডের অধিপতি হতে পারবে, বিফলতায় তেমনই নিজের মুণ্ড হারাবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। আর একবার বলি, নিজের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস না থাকলে এ কার্যে অগ্রসর হয়ো না।"

বৈদ্যরত্ন হাসেন।—"প্রতিশ্রুতিই যদি না থাকে, তবে কেবলমাত্র শ্রুতি-যুগল-ধৃত মুণ্ডের স্বার্থকতা কি ?"

—"উত্তম, এমন সাহসী যুবাই আজ এই অধঃপতিত দেশের প্রয়োজন। তাহলে আর বিলম্ব নয়, প্রস্তুত হয়ে নাও!"

—"আমি প্রস্তুত।"

—"প্রথমতঃ সুলতানার আরোগ্যের আশ্বাস দিয়ে সুলতানা আর রুদ্রতাপ, দু'জনকেই গ্রহণ করা যাক, কি বল ?"

—"হ্যাঁ ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক, চলুন।"

উত্তরীয়খানি কাঁধে ফেলে গোপীবল্লভের সঙ্গে পথে যেতে যেতে ভাবেন হরিশ্চন্দ্র, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! জীবনে যাকে নিকটে পেলাম না, তার

জীবন নিয়েই খেলতে চলেছি! একদিন এই রুদ্রতাপই হরিশ্চন্দ্রের জীবন নিয়ে খেলেছিল। আর আজ রুদ্রতাপের জীবন নিয়েই খেলা করবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে হরিশ্চন্দ্রের! অদৃষ্টের কি নিদারুণ বিধান!

ইতিপূর্বে নগরে আরো ক'বার এসেছেন হরিশ্চন্দ্র। আজও প্রতিবারের মতোই থমকে দাঁড়ালেন নগরের তোরণ-দ্বারে। গৌড়ের গৌরব, লক্ষ্মণাবতীর বিরাট তাম্র-কপাট তুরস্ক দস্যুকে প্রবেশ অধিকার দিয়ে নবীন সূর্যের আভায় লজ্জায় রাঙা হয়ে যেন বিনম্র নয়নে দাঁড়িয়ে আছে! মর্মর সোপানশ্রেণীর দুই ধারে কৃষ্ণবর্ণের পাথরের বিরাট সিংহমূর্তি তেমনই সাহঙ্কারে মুখব্যাদান করে রয়েছে!

গোপীবল্লভ তাড়া দেন।—"চল হে, নগরদ্বারে এসেই যে থমকে দাঁড়ালে। তোরণ-দ্বারের উচ্চতা দেখেই যদি ভীত হও, তাহলে প্রাসাদ পর্যন্ত কি আর পৌঁছতে পারবে? তার ওপরে আছেন ফণিধর সুলতান!"

আত্মস্থ হয়ে মৃদু হেসে তোরণ পার হয়ে গোপীবল্লভকে অনুসরণ করে নগরের পথে দ্রুত চলতে চেষ্টা করেন হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু অবাধ্য মনকে সতর্কতার বন্ধনে রাখতে পারেন না বেশিক্ষণ। নগরের রাজপথ আবার টেনে নিয়ে যায় বহুদূর। এই তো সেই প্রশস্ত পথের দুই ধারে সমান্তরালবর্তী সুউচ্চ সুরম্য সৌধশ্রেণী। প্রত্যেক সৌধের চূড়ায় সুবর্ণ কলস লক্ষ্মণসেনের গৌড়ের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিচ্ছে! সারি সারি তালবৃক্ষ বেষ্টিত মর্মরে বাঁধা দীঘির স্ফটিক জলে প্রস্ফুটিত অসংখ্য পদ্মফুল বিগত সেনরাজ-ললনাদের নৃত্য-গীত-মুখরিত আননের স্মৃতি উদ্বেলিত করে! তুরস্ক অধিকারের পর নিয়ত হস্তান্তরিত হওয়ায় লুণ্ঠনের আঘাতে স্থানে স্থানে ধ্বংসের চিহ্ন দেখা গেলেও তার পাশেই নবরূপ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নবাগত তুরস্কদের মিনার-শোভিত বালাখানা। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেনরাজ্য-নিয়ন্তা বিষ্ণুর মন্দির! সেই ধ্বংসস্তূপের অনতিদূরে গড়ে উঠেছে তুরস্ক সুলতানের মঙ্গল প্রার্থনাগার পীরের দরগা এক মসজিদ। একে একে খুলছে পথের দু'ধারে সারি সারি বিপণির দ্বার। সেদিনের উত্তরীয়, পট্টবস্ত্র আর শাটীর পরিবর্তে আজ এতে সাজান রয়েছে জোব্বা, ফেজ, মেরজাই, সালোয়ার ও কুর্তা!

মস্‌মস্‌ শব্দে চতুশ্চক্র পথের বাঁদিকের পথ দিয়ে এগিয়ে আসেন কোনো সম্ভ্রান্ত এক পথিক চর্ম-পাদুকার আর্তনাদ তুলে। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন হরিশ্চন্দ্র। সুলতানের কৃপাদৃষ্টিলব্ধ হয়তো কোনো সম্পদশালী হিন্দু। উপর অঙ্গের বেশভূষায় খাঁটী তুরস্ক বলে মনে হলেও নিম্নাঙ্গের পট্টবস্ত্রখানি কিন্তু হিন্দুত্বের সাক্ষ্য দেয়! তার সঙ্গে হাত ধরে নেচে চলেছে এক বালক—সম্ভবতঃ পুত্র। একখণ্ড পীত পট্টবস্ত্র বালকের কটি থেকে জানুর নিচ পর্যন্ত চোগা অনুকৃতিতে আঁট করে বাঁধা! অঙ্গে রক্তবর্ণের রেশমী পিরহান্‌,

কোমরে স্বর্ণ কটিবন্ধ, কানে স্বর্ণ কুণ্ডল, মাথায় বাবরী চুলের 'পরে তুর্কী ফেজ। অদূরে বাবরী চুলের গুচ্ছ নাচিয়ে অপর এক বালক গেয়ে চলেছে—

"ধর্ম হইলা যবন রূপী, শিরে পীর কালা টুপী,
হাতে ত্রিকচ কামান।
ব্রহ্মা হইলা মহম্মদ, বিষ্ণু হইলা পেগম্বর
মহেশ হইলা বাবা আদম
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী, তেঁহ হইলা হায়া বিবি···ই···ই।"

সর্বনাশ! কোন তুর্কীর কানে গেলে কি আর রক্ষা আছে! চোখের ইশারায় তাকে নিরস্ত করতে না পেরে পথিক দৌড়ে গিয়ে বালকের মুখ চেপে ধরেন। সে-দৃশ্য দেখে হরিশ্চন্দ্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গৌড়বাসী অঙ্গে তুরস্ক পরিচ্ছদ নিলেও হৃদয় থেকে গৌড়জনোচিত মায়া-মমতা এখনও বিদায় দিতে পারেনি!

গোপীবল্লভ বালকের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে এনে বিরূপভাব প্রকাশ করেন। বলেন—"নগরের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে চিত্ত দুর্বল করো না। স্থলতানের সম্মুখীন হবার জন্য মন দৃঢ়তর করে প্রস্তুত হও। প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালন করতে না পারলে স্থলতানের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ কর।"

—"শাস্তির চরম তো মৃত্যুদণ্ড? মৃত্যুকে ভয় না করলে আর শাস্তিতে ভয় কি?"

শ্লেষে হাসেন গোপীবল্লভ। বলেন—"যুবা-বয়সে মৃত্যু সুদূর মনে করা যায় বলেই মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর মনে হয় না। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ভয়ে অন্ধকার দেখে, যদিও তখন আর কোনো উপায় থাকে না। ঐ দেখা যায় দুর্গ প্রাকার! এইবার দুর্গে প্রবেশ করতে হবে। উত্তরীয়খানি ভালো ভাবে বিস্তৃত করে অঙ্গ আবৃত করে নাও। প্রথম দর্শনেই স্থলতানের সম্ভ্রম আকর্ষণ না করতে পারলে সম্মান পাবে না।"

গোপীবল্লভকে নিরস্ত করবার জন্যই হয়তো হরিশ্চন্দ্র যথাসাধ্য যত্নে উত্তরীয়খানি দিয়ে অঙ্গ ঢেকে নেন।

দরবারমহলের বিশ্রামকক্ষের মসলন্দপোষে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হরিশ্চন্দ্রের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে জলদ-গম্ভীরকণ্ঠে তব্রোল বললেন—"সত্য বলছো ব্রাহ্মণ?"

মৃদুহেসে কুর্নিশে অনভ্যস্ত হরিশ্চন্দ্র অপটু ভঙ্গিমায় কুর্নিশ করে বলেন—"জাহাঁপানার পবিত্র শরীরের সম্মুখে মিথ্যা বলবার দুঃসাহস কে রাখে? সত্য মিথ্যা ফলাফল দেখেই বিশ্বাস করবেন।"

—"আচ্ছা বেশ, যা বলছো তাই হবে। বাঁদীকে আগে সারিয়ে তোল তারপর মুস্তাফিজকে ইনাম পাবে।"

হরিশ্চন্দ্রকে নিরুত্তর দেখে আর ধৈর্য রাখতে পারেন না গোপীবল্লভ। ব্যগ্র হয়ে বলে ওঠেন—"কিন্তু মুস্তাফিজকে প্রাপ্তির সর্তেই তো বাঁদীকে সারিয়ে তুলতে স্বীকৃত হয়েছেন বৈদ্য ?"

একখানি হাত তুলে ভ্রূকুঞ্চিত বিরক্তমুখে শান্ত গম্ভীরকণ্ঠে তভ্রোল জিজ্ঞাসা করেন —"সর্ত! সুলতানের সঙ্গে সর্ত করবার যোগ্যতা অর্জন করেছ কি ব্রাহ্মণ! সুলতানের দরবারে অজিজ্ঞাসিত হয়ে বাক্যব্যয়ে বে-আদতী করো না বেয়াকুফ্! বৈদ্যকে বলতে দাও।"

হরিশ্চন্দ্রকে বার বার অধৈর্য চোখে ইশারা করেন গোপীবল্লভ।

দ্বিতীয়বার অপটু কুর্ণিশ করে হরিশ্চন্দ্র জবাব দেয়—"জাহাঁপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু ঔষধ যখন এক যোগে প্রস্তুত করতে হবে, তখন দু'জনকে একইসঙ্গে তা প্রয়োগ করাই সুবিধা। তা ছাড়া অধিক বিলম্বে ঔষধের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হওয়া সম্ভব।"

—"কিন্তু ও কুত্তাটাকে আমি চাই না! তবে বাঁদীকে ফিরে পেলে তার পরিবর্তে কুত্তাটাকে তোমাদের দিয়ে দেবার ব্যবস্থায় রাজী হতে পারি, এই মাত্র!"

অনেক চেষ্টা করেও নিজের আকুলতা সংযত করে রাখতে পারে না গোপীবল্লভ। আবার সুলতানের নিষেধ ভুলে বলে ওঠেন—"জাহাঁপনা ভেবে দেখুন, যুবকের চৈতন্য ফিরে এলে পর তার অমার্জনীয় অপরাধের জন্য হয়তো আরও কোন কঠিনতম শাস্তি বিধান করতে পারবেন?"

সোজা হয়ে বসেন উত্তেজিত তভ্রোল। বলেন—"ঠিক, ঠিক বলেছো পণ্ডিত! তোমাদের হিন্দু পণ্ডিতের মগজ খুবই সাফ!"

সুলতানকে উত্তেজিত দেখে আরো দ্রুত হাতে চামর দোলায় চামর-বাহিনী।

—"সেই ঠিক! কুত্তাটাকে কুত্তা দিয়েই খাওয়াতে হবে! বেশ, তাই হবে। কিন্তু মনে রেখো, জবান বরখেলাপী হলে তোমার এবং তোমার বেরাদার বৈদ্যের দু'জনেরই গর্দান সাফ্।"

তৃতীয়বার কুর্ণিশ করে উভয়ে সম্মতি জানায়।

হামেহাল-হাজিরার দিকে চেয়ে আদেশ করেন তভ্রোল—"খাশনবীশ।"

আভূমি কুর্ণিশ করতে করতে পিছু হটে দরবার পরিত্যাগ করে হামেহাল-হাজিরা।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে সুলতান ঘোষণা করলেন—"তোমাদের প্রয়োজন মতো অর্থ লোকবল সবই পাবে আর কাজ হাশিল হলে উপযুক্ত ইনামও পাবে।"

গদগদ হয়ে গোপীবল্লভ বলেন—"জাহাঁপনার অনুগ্রহে ইনামস্বরূপ ঐ বন্দী যুবককে পেলেই বান্দা ধন্য হবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের অপর ইনামের প্রয়োজন কি!"

—"আগে তোমাদের ইলম দেখাও বেয়াকুফ! তারপর ইনামের কথা বলো।"

কুর্ণিশ করে করে খাসনবীশ প্রবেশ করতেই তদ্রোল আদেশ করেন—"নিয়ে যাও এই দু'জনকে। এখনই খাসনজর মহলে হাজির করে দাও। অর্থ, লোকবল, আর যে সব আয়োজনের এদের প্রয়োজন, হামেহাল-হাজির করবে। কিন্তু কড়া নজরবন্দ্ রাখবে, দেখো, চোখের আড়াল না হতে পারে।"

তারপর বৈদ্যরত্নের দিকে চেয়ে বলেন—"তোমাকে সম্পূর্ণ এক প্রহর সময় দিলাম। এক প্রহরের মধ্যেই আমার ইরাণী গস্তিদারের ঔষধ প্রস্তুত হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ইলম দেখাবার সময় দেওয়া গেল। নিজের ভাগ্য পরীক্ষা কর।"

কুর্ণিশ করে হরিশ্চন্দ্র ও গোপীবল্লভ চলে যান।

খাসনবীশের প্রতি চেয়ে তদ্রোল বিষণ্ণমুখে বলেন।—"উজিরে আজমকে সংবাদ দাও, খাসদরবার আজ আর বসবে না। আমার মেজাজ আজ সুস্থ নয়। দিল্লীর সংবাদ যদি কিছু আসে তুমি নিজে এসে পেশ করো, নতুবা আমাকে বিরক্ত করো না।"

কুর্ণিশ করে কক্ষের বাইরে এসে ঠোঁট টিপে হাসেন খাসনবীশ, মালেক আবদুল-মিনহাজ। নারীর জন্য শোক! সুলতানী খেয়াল বটে!

পায়ে মৃদুস্পর্শ পেয়ে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠে বসেন সুলতানা-আজিনা। ভালো করে চোখ ঘষে দেখেন, পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণমুখী মামুদা! উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করেন সুলতানা—"কি খবর রে মামুদা! এত ভোরে!"

—"খবর ভালো নয় বলেই তো তোমার ভোরের বিশ্রাম নষ্ট করতে বাধ্য হলো মামুদা বাঁদী। এখ্‌তেলাক গোস্তাগী মাফ্ করো সুলতানা।"

—"কেন? কি হয়েছে? শিশমহলের বেতরিবৎ টিয়া ফাঁদে পা দেয়নি বুঝি?"

—"দাঁড়কাকের পা তো ফাঁদে ঠিকই পড়েছিল কিন্তু খোদা নারাজ!"

—"কি রকম?"

মামুদা একে একে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে যায়। ভ্রূকুঞ্চিত করে সুলতানা নিস্পন্দ হয়ে শোনেন। কাহিনী শেষ করে মামুদা নিশ্বাস ফেলে বলে—"এখন এই হিন্দু মন্তরবাজ বৈদ্য এসে এত কারসাজী মেহনৎ সব বাতিল বরবাদ করে দেবে! ঐ দুশমনি যদি আবার শিশমহল দখল করে বসে তাহলে তো সারা মতলব পয়মাল!"

সুলতানার চিন্তিতমুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে, ওষ্ঠের পাশের ক্রূর রেখা ক্রূরতর দেখায়।—"না···রে···এবার টিয়া আর শিশমহল তক্‌ত্ পাবে না। ওকে ওর

জানের সঙ্গে মুখোমুখী দেখেছেন সুলতান, তার সাজা আছে। তবু বলা যায় না খোদের মর্জি। তাহলে ঐ বৈদ্যটাকেই এবার সরাতে হবে।"

—"তা তো হবেই, কিন্তু সরাবে কেমন করে? তহ্‌খানায় কড়া খবরদারী দিয়ে সুলতান দুই ব্রাহ্মণকে খাসনবীশ মালেক আবদুল-এর হাতে জিম্মা দিয়েছেন।"

সুলতানা অর্থপূর্ণ কটাক্ষে হাসেন।—"ওঃ আবদুল। তা এতক্ষণ বলিসনি কেন? খোদার অনেক দয়া এ বাঁদীর ওপর। আবদুল তো আর সুলতানের একার নবীশ নয়?"

সকৌতুক কটাক্ষে আবার একটু হাসেন সুলতানা।—"তুই এক কাজ কর। আবদুলকে কোনো প্রকারে এখুনি খবর দিবি, আজ রাত্রে আজিনার 'ভেট' বৈদ্যের রক্তমাখা সর্‌। আর সে সর্‌ কোতল হওয়া চাই মন্তর দেবার পূর্বে।"

—"অন্যের জিম্মায় সর্‌ থাকলে তো আর ভাবনা ছিল না সুলতানা। কিন্তু সর্‌ যে মালেক আবদুল-এর জিম্মা। সে-সর্‌ খোয়া গেলে মালেক আবদুল নিজের সর্‌ রাখবেন কি দিয়ে?"

—"যে লোক হামেহাল সুলতানের সম্মুখে হাজির থেকেও এতদিন গর্দানে সর্‌ রেখেছে, তার সর্‌-এ মগজ বড় সাফ মামুদা। তুই যা। যা বললাম ঠিক ঠিকভাবে সে-খবর পৌছে দে। সেই সঙ্গে আরও জানাবি যে, আজ আবদুল-এর খানাপিনা বড়-খাসমহলে।"

মামুদা কুর্ণিশ করে চলে যায়। খানিক পরেই সুলতানার সম্মুখে এক তরুণ যুবা এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সুলতানা হাসেন।—"সাবাস! কেউ চিনবে না। কিন্তু বড়-খাসমহল থেকে দিনদুপুরে এমন একজন যুবককে বার হতে দেখলে বরকন্দাজরা ছাড়বে তো?"

কৃতার্থ মামুদা হেসে বিনীত কুর্ণিশ করে।—"বড়-খাসমহলের খোজা বরকন্দাজরা যদি চোখ খুলেই হাজিরা রাখে, তাহলে বৃথাই সুলতানার পয়জরে এতদিন ইলম শিখেছে মামুদা বাঁদী।"

কুর্ণিশ করে খুশিতে মাথা নাচিয়ে মামুদা চলে যায়। যাক, এতদিনে প্রাসাদের হাওয়া তবু সর-গরম হয়ে উঠেছে! রাত্রিদিন নাচের মহড়া দেখে দেখে প্রাসাদ পান্‌সে হয়ে উঠেছিল!

খাস নজরমহল।

সুলতানের দ্বিতল মহলের এক-তলের নিচে মাটির তলায়ও আছে কয়েকটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠ। সকলে এ সংবাদ জানে না। সুলতানের বিশেষ বন্দীরা এই সব প্রকোষ্ঠে স্থান পায়। গোপন ষড়যন্ত্রের বিধিব্যবস্থাও অনেক সময়ে এখানে হয় বলেই এর নাম নজরমহল।

বাতায়নহীন প্রকোষ্ঠের বদ্ধবায়ুতে পচা কাদার গন্ধ !

শামাদানের স্তিমিত আলোয় চারিপাশ দেখে বৈদ্য বলেন—"এমন স্থানে কি চিকিৎসা করা সম্ভব ? মুক্ত বায়ু চাই যে।"

চোখ বিস্তৃত করে খাসনবীশ বলেন।—"সুলতানের হুকুম ! ওজর দেখায় সাধ্য কার ! এই স্থানেই যা পার করতে হবে।"

—"অনুগ্রহ করে সুলতানকে জানাবেন, গর্দান নিতে হলে নেবেন, কিন্তু এমন স্থানে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব।"

চিন্তিতমুখে খাসনবীশ বলেন—"আচ্ছা, তাহলে না হয় যাই একবার। সুলতানকে আপনার আবেদন জানিয়ে দেখি।"

ইশারায় রক্ষীদের সতর্ক থাকবার উপদেশ দিয়ে খাসনবীশ সুলতানের সাক্ষাৎ-লাভের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করলেন।

পথে খাসনবীশকে দেখে কুর্ণিশ করে এগিয়ে আসে এক তরুণ যুবক। প্রথমে খুবই বিস্মিত হন খাসনবীশ। তৎপর আগন্তুককে চিনতে পেরে মৃদুহাস্যে মস্তক আন্দোলিত করেন। ভাবেন কত কৌশলই যে জানেন সুলতানা !

নিম্নকণ্ঠে যুবকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলবার পর খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে খাসনবীশ খাসমহল-এর পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে গমন করেন !

সফলকাম তরুণ বার্তাবহ হৃষ্টমনে হাল্কা-পায়ে চর্মপাদুকা মশমশিয়ে বড়-খাসমহল-এর পথ ধরে।

নজরমহল-এর বদ্ধবায়ুতে বসে একটি মাত্র শামাদানের স্তিমিত আলোয় হরিশ্চন্দ্র চৌকিতে শায়িতা অবন্তীমালার স্থির ঈষৎ উন্মীলিত আয়তচোখের পানে সজলচোখে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন। হ্যাঁ, এই মূর্তিই তো হরিশ্চন্দ্র কিশোর বয়স থেকে গড়েছে ! কিন্তু হস্তিদন্ত-খণ্ডে বা প্রস্তরফলকে আয়ত-চোখের সেই চঞ্চল ভাষাময় চুম্বকের আকর্ষণী-মহিমা কিছুতেই ফোটাতে পারেনি ! হরিশ্চন্দ্রের বহু আয়াসে-গড়া মূর্তির চোখও এমনি স্থির, ভাষাহীন ! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এমনই অনমনীয় কঠিন ! নিষ্ঠুর প্রস্তরে কাটা ভাগ্য হরিশ্চন্দ্রের ! মন তবু আশা ছাড়ে না। অবন্তীমালার কানের কাছে মুখ নত করে রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—'কথা কও অবন্তীমালা। রুদ্রতাপের জীবন আজ হরিশ্চন্দ্রের হাতে। হরিশ্চন্দ্রকে যদি নাই চাও, তবে অঞ্জলি পেতে তোমার ঐ স্থির চোখে আকুতি এনে রুদ্রতাপের প্রাণ-ভিক্ষা কর, যেমন করে রুদ্রতাপের কাছে ব্যগ্রচোখে আকুলকণ্ঠে বিলের শ্বেতপদ্ম চাইতে। অতীতের সেদিনে হরিশ্চন্দ্র মাঝবিল থেকে পদ্ম এনে দিলেও মুখ ফিরিয়ে তুমি চলে গিয়েছ। কিন্তু আজ, আজ তুমি সজলচোখে অঞ্জলি পেতে না দাঁড়ালে হরিশ্চন্দ্র দেবে না, কিছুতেই দেবে না রুদ্রতাপের প্রাণ।'

চোখ তুলে কক্ষের অপর পাশে ভূমিতে শায়িত রুদ্রতাপের দিকে হরিশ্চন্দ্র ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে আসেন। পাশে বসে শ্লথ হাতে রুদ্রতাপের একখানি হাত তুলে নেন। অতীত দিনের স্মৃতি তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। টপ্ টপ্ করে ক'ফোঁটা অশ্রু রুদ্রতাপের মুদিত চোখের 'পরে ঝরে পড়ে। মনে পড়ে যায় কুশীগ্রামের গুল্মবনে পণ রেখে তীর খেলা! বনভোজনকালে পণসের পোড়া বীজ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে খাওয়া! না, এ কী কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করেছে হরিশ্চন্দ্র! কেন এল? কিসের মায়ায়? সজলচোখ তুলে চেয়ে দেখেন শায়িতা অবন্তীমালার দিকে। রুদ্রতাপের হাত সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে আবার অবন্তীমালার পাশে উঠে আসেন। হ্যাঁ, তোমার জন্যই এলাম অবন্তীমালা। যে-হরিশ্চন্দ্র তোমার নিকটে থাকবার জন্যই স্বপ্নে-ঘেরা গ্রাম ছেড়ে নগরের জঞ্জালের পাশে এসে বাসা বেঁধেছে, যে-হরিশ্চন্দ্র অবন্তীমালার সার্থক মূর্তি গড়ে তাকে পূজা করবার জন্যই ভাস্কর্য শিখেছে, সে আর তোমাকে চাক্ষুষ দেখবার প্রলোভন সংযত করতে পারলো না! মনের উত্তেজনায় হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়: 'না না না, তা নয়। আমি সারিয়ে তুলবো তোমাকে, তুমি আমারই হবে, একান্তই আমার।'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থেকে থেকে বোধহয় একটু নিদ্রাভাব এসেছিল গোপীবল্লভের। হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করেন—"কি হে বৈদ্যরত্ন, কতদূর? এ কী, ঔষধি সব এখনও পড়ে রয়েছে! মূলাদি পর্যন্ত পিষ্ট করোনি! করছিলে কি এতক্ষণ? বেলা তো এদিকে চারদণ্ড উত্তীর্ণ প্রায় বলে মনে হচ্ছে!"

অপ্রস্তুত হরিশ্চন্দ্র অবন্তীমালার হাত নামিয়ে রেখে মূল পিষ্ট করতে বসে বলেন—"কিন্তু খাসনবীশ যে সুলতানের আদেশ আনতে গেলেন, তিনি তো এখনো অবধি এলেন না?"

—"তুমিও যেমন! ঐ ছুতো করে বেটা পালিয়েছে। সুলতানের আদেশ একবার হলে পর আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করবার সাহস কি আছে এই সব ভীরু প্রাণ-সর্বস্ব যবনদের? হুঁঃ!"

যবনদের প্রাণের মায়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ-ভাব নাসিকা-কুঞ্চনে স্পষ্টতর করে আবার চোখ বুজে দেয়ালে পিঠ রাখেন গোপীবল্লভ। ক্রমে কুঞ্চিত নাসিকা সুস্থ হয়ে মৃদু গর্জন তোলে। মাঝে মাঝে হঠাৎ চটকা ভেঙে এক একবার করুণ চোখে রুদ্রতাপের প্রতি চেয়ে দেখেন।

মূল পিষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র গোপীবল্লভের বাহুতে মৃদুস্পর্শ করেন। আবার ধড়মড় করে উঠে বসেন গোপীবল্লভ।

হরিশ্চন্দ্র মৃদুস্বরে বলেন—"এই মূলের রস আপনি আপনার ভাগিনেয়র

অঙ্গে লেপন করুন। আমি ততক্ষণ সুলতানার অঙ্গে লেপন করে ফলাফল পরীক্ষা করি।"

—"কিন্তু আমি লেপন করলে যদি ফল না হয়?"

—"হবে, একই ফল হবে। তবে যদি বলেন আমিই না হয় আপনার ভাগিনেয়কে দেখি। আপনি বরং সুলতানার অঙ্গে ওষুধ লেপন করুন। সময় সংক্ষেপ, কার্যারম্ভে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।"

—"না, না বাপু। ও যবন রমণীকে আমার স্পর্শ না-করাই ভালো। আমি বরং রুদ্রতাপের অঙ্গচর্যার চেষ্টা দেখি।"

তারপর গোপীবল্লভ মূলরস নিয়ে সজলচোখে রুদ্রতাপের অঙ্গচর্যায় বসেন! ততক্ষণে হরিশ্চন্দ্র অতি ধীরে ধীরে অবন্তীমালার অঙ্গে ওষুধ লেপন করতে আরম্ভ করেছে। হ্যাঁ, উষ্ণতর হচ্ছে দেহ! পূর্বাপেক্ষা অনেক উষ্ণ! অতি ধীরে ধীরে ফিরে আসছে উষ্ণতা! আনন্দে, উত্তেজনায় যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন হরিশ্চন্দ্র!

নিঃশব্দে ঘরে ঢোকেন খাসনবীশ। ওষুধ লেপনে নিবিষ্ট গোপীবল্লভের পিঠে অতি সন্তর্পণে হাত রাখেন!

গোপীবল্লভ চমকে ঘাড় ফিরাতেই নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে আবদুল চুপ করবার সঙ্কেত করেন! তারপর আবার হাতের সঙ্কেতে বাইরে চলবার আদেশ করেন।

তবু নির্বোধ দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করেন গোপীবল্লভ। চোখে বিরক্তি এনে আবার ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করেন আবদুল, চুপ! গোপীবল্লভের গা ঠেলে বাইরে যাবার ইশারা করেন।

ভীত বিস্মিত গোপীবল্লভ খাসনবীশকে অনুসরণ করে কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ান।

সকৌতুকে নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন আবদুল—"কি হে, তোমার বেরাদারের কর্মকুশলতা কতদূর?"

—"সময় তো এখনও উত্তীর্ণ হয়নি জনাব।"

—"হয়নি বটে, তবে আর অল্পই বাকি। এতক্ষণে যদি সামান্য ভরসাও দেখা না দিয়ে থাকে, তবে আর কিছু হওয়ার আশা নেই। সুলতান ইতিমধ্যেই খাসমহল ত্যাগ করেছেন, পথটুকু সেলাম নিয়ে নিয়ে পার হয়ে আসতে যা সময়। হয়তো আর একদণ্ডেই এসে পৌছবেন। তিনি এসে যদি দেখেন যে কিছু হয়নি, তাহলে আর কথা বলবার অবকাশ পাবে না। তার পূর্বেই গর্দান থেকে সর্-এর সঙ্গে মুখ ভূলুণ্ঠিত হবে।"

ভীত গোপীবল্লভ একবার বলতে চেষ্টা করেন—"কিন্তু···মুক্ত বাতাস···"

চাপাকণ্ঠে ধমকে ওঠেন খাসনবীশ—"সুলতানের দরবারে মুক্ত বাতাসের

আন্ধার ধরলেই কি পাওয়া যায়! এবার তোমার মুণ্ডবিহীন পিন্দারে-হাসীন মুক্ত বাতাস পাবে! তার জন্য প্রস্তুত হও।"

প্রাণের ভয়ে গোপীবল্লভ কাঁপতে থাকেন।—"তাহলে!"

ভীত সন্ত্রস্ত গোপীবল্লভ কুর্ণিশ করতে গিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে অভ্যস্ত নমস্কার করে ফেলেন আবদুলকে। অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করেন—"বৈদ্যরত্নের মিথ্যা দম্ভে বিশ্বাস করেই না এমন বিপদে পড়ে প্রাণ বিপন্ন হলো জনাব! এখন? কোনো কি উপায় হয় না? এ নিরপরাধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কোনো উপায়ে রক্ষা করুন মহতাশ্রয়!"

কপট সহানুভূতিতে মুখ অন্ধকার করে আবদুল বলেন—"তুমি নিরপরাধ বুঝেই তো আপসোস হচ্ছে। কিন্তু সুলতানের খেয়ালী ক্রোধের আগুন অপরাধ-নিরপরাধ বিচার করে না। তোমাদের গর্দান রক্ষা করতে আজ খোদাও অক্ষম।"

—"আপনি খোদার চেয়ে কম কিসে খোদাবন্দ্?" গোপীবল্লভের ভীত বিবর্ণ মুখের স্তুতি শুনে আবদুল হেসে ফেলেন।

—"আহা সরল বৃদ্ধ! তোমার জন্য সত্যই মায়া হচ্ছে।" কপট চিন্তিতমুখে ঘাড় নাড়েন আবদুল।

হাত জোড় করে অবনত শিরে গোপীবল্লভ বলেন—"আপনার অনুগ্রহই এখন এ হতভাগ্য বৃদ্ধের সম্বল।"

উদারভাবে স্তুতি গ্রহণ করে সহানুভূতি দেখাবার জন্য গোপীবল্লভের পিঠে হাত রাখেন আবদুল। বলেন—"সাহস থাকলে প্রাণ নিয়ে পালাতে পার। আমিও সাধ্যমতো সহায়তা করতে পারি।"

প্রাণের আকুলতায় আবদুল-এর জানু চেপে ধরেন গোপীবল্লভ।—"বলুন খোদাবন্দ্, কি উপায়ে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়?"

নির্বিকারমুখে আবদুল বলেন—"পালিয়ে যাও।"

নির্বোধের মতো গোপীবল্লভ বলেন—"এত রক্ষী! সান্ত্রী!"

—"রক্ষী সান্ত্রীর চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যাও।"

—"প্রাসাদের প্রতি দ্বারে, প্রতি কোণে রক্ষী! চোখ এড়াব কেমন করে!"

—"প্রাসাদের বাইরে যাবার গোপন পথ দেখিয়ে দেবো। আমার রক্ষীরা বিশ্বস্ত, ধর্মভীরু। ওরা আমার হুকুমে মাঝে মাঝে বিড়ম্বিতকে এমন সাহায্য করে থাকে। কিন্তু অতি গোপনে, নিঃশব্দে কাজ হাসিল করতে হবে। এ রাজ্য ছেড়ে একেবারে বহুদূরে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত তোমাকে নিরাপদ করতে গিয়ে আমার ঘাড়ে না বিপদ চাপে!"

—"তাই যাব খোদাবন্দ! মহার্ণব, উপায় নির্দেশ করুন। আমার প্রাণ থাকতে বিপদকে আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না।"

—"তোমার পথ আমি নিরাপদ করে দিতে পারি কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যে, তোমার ঐ বেয়েদার বৈদ্যকে ছেড়ে যেতে হবে।"

নির্বোধের মতো গোপীবল্লভ উচ্চারণ করেন—"বৈদ্যরত্ন যে বিপদে… !"

—"আগে নিজের বিপদ উত্তীর্ণ হও পণ্ডিত, তারপর অপরের বিপদের কথা চিন্তা করো।"

—"কিন্তু এ যে বড় অধর্ম হবে খোদাবন্দ্।"

—"তাহলে যাও, ঘরে গিয়ে বস। সব্-এর মায়া ত্যাগ করে ধর্মে মন দাও। উভয়কে এক সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে নিজের সব্ তো বরবাদ করতে পারি না।"

চিন্তিত অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন গোপীবল্লভ। বিকৃত মুখভঙ্গি করে আবদুল বলেন—"যাও, যাও, ঘরে গিয়ে বস, এখনি সুলতান এসে পড়বেন।"

হাত জোড় করে গোপীবল্লভ আকুতি জানান—"গোপীনাথের যেমন ইচ্ছা তাই হোক। বৈদ্যরত্নের প্রাণটি অন্ততঃ রক্ষা করবেন দয়াবতার। আপনার দয়া থাকলে কৌশল অবশ্যই উদ্ভাবিত হবে। বিদায়ের পূর্বে বৃদ্ধকে শুধু এইটুকু ভরসা দিন।" আবার আকুল হয়ে আবদুল-এর জানু স্পর্শ করেন গোপীবল্লভ।

অপরদিকে চেয়ে নিস্পৃহকণ্ঠে আবদুল জবাব দেন—"সুলতানের আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য তো কথা দেওয়া যায় না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। তোমার অপরাধ তত সাংঘাতিক নয়, তায় বৃদ্ধমানুষ, তোমাকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।"

দ্বিধাকাতর হয়ে গোপীবল্লভ কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। অবশেষে নিশ্বাস ফেলে বলেন—"আচ্ছা তবে তাই হোক। গোপীনাথের যেমন ইচ্ছা। কিন্তু আমার এক আর্জি আছে খোদাবন্দ্। দয়া করে রক্ষীকে আমার নিকট সমর্পণ করুণ। মেহেরবান হুকুম করুন আমি তাকে নিয়ে চলে যাই।"

আবদুল-এর চোখের ইশারা পেয়ে নিঃশব্দে রুদ্রতাপকে বয়ে আনে রক্ষীদল। পথ দেখিয়ে চলেন আবদুল। রক্ষীদলের সঙ্গে সঙ্গে আবদুলকে অনুসরণ করে চললেন গোপীবল্লভ।

প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পার হয়ে প্রায়ান্ধকার দীর্ঘ গোলকচক্র উত্তীর্ণ হয়ে একটি প্রকোষ্ঠের শৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহদ্বার উন্মুক্ত করেন খাসনবীশ। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দেয়ালের মুখ থেকে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরালে পর দেখা দিলো সুড়ঙ্গ-পথ। এই সুড়ঙ্গপথই চলে গিয়েছে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত। দুর্গ, শত্রু আক্রান্ত হলে দুর্গবাসীদের এইটিই পলায়ন-পথ। এই পথেই খিলজী-আক্রান্ত দুর্গ থেকে পালিয়েছিলেন লক্ষ্মণ সেনের অন্তঃপুরচারিণীরা।

অতি পুরাতন সুড়ঙ্গপথের সিক্ত বদ্ধবাষ্পে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। বহু কষ্টে সুড়ঙ্গপথ উত্তীর্ণ হয়ে ভাগীরথীর তীরে আঘাটায় বাঁধা একখানি ক্ষুদ্র

বাইচ পানসি দেখিয়ে আবদুল বলেন—"নাও, ওই নায়ে উঠে বস। ভাটার স্রোত ধরে আজ রাত্রের মধ্যেই অনায়াসে নবদ্বীপ পর্যন্ত চলে যেতে পারবে।"

তারপর একটি জোব্বা, ফেজ ও একখণ্ড বাফ্‌তা পানসিতে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—"এবার এই জোব্বায় অঙ্গ ঢেকে ফেজটা মাথায় দিয়ে দাও।"

পানসিতে পা রেখে আকুলকণ্ঠে গোপীবল্লভ বলেন—"কিন্তু আমার স্ত্রী কন্যা, আশ্রম!"

ভ্রূকুটি করেন আবদুল—"আগে নিজের প্রাণ বাঁচাও পণ্ডিত, তারপর স্ত্রী, কন্যা, আশ্রম! পালাও, দ্রুত চালাও পানসি, আর মুহূর্ত বিলম্ব করো না। প্রাণ থাকলে অমন বহু স্ত্রী, কন্যা, আশ্রমের মালিক হতে পারবে।" ইশারায় পাটনীকে হুকুম দিয়ে দ্রুত ফিরে চললেন আবদুল।

পানসির দড়ি খুলে দেয় পাটনী। সজলচোখে একবার রুদ্রপ্রতাপকে স্পর্শ করেন গোপীবল্লভ। ভয়ে-চাপা বুকের মধ্যে থেকে কে যেন ক্ষীণ স্বরে বলতে চেষ্টা করে—"কোন্ ধর্ম রক্ষা হলো মৃতের জন্য জীবন্তকে বলি দিয়ে?" সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে অস্থির কম্পিত অঙ্গুলিতে উপবীত স্পর্শ করেন—"রক্ষা করো গুরু, বৈদ্যরত্নকে রক্ষা করো।" শব্দ ফোটে না ভীতকণ্ঠে, আকুল প্রার্থনায় বিবর্ণ ওষ্ঠ কেবল থর থর করে কাঁপতে থাকে।

গোপীবল্লভকে বিদায় দিয়ে এসে কক্ষদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখেন আবদুল। ধ্যানী হরিশ্চন্দ্রকে তখনো অবন্তীর চর্যায় নিমগ্ন দেখে খুশিমুখে প্রহরীদের হাতে স্বর্ণ দিনার দিয়ে বলেন—"বড় সহজে কাজ হাসিল হয়েছে। এখনকার মতো এই, পরে সব কাজ ভালোয় ভালোয় মিটলে আরো পাবে। এই নাও মেওয়া-মেঠাই। মেওয়া-মেঠাই গিলবার সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা হজম হওয়া চাই। গর্দান থেকে সর্ গেলেও একটি কথা যেন বদহজম না হয়!"

রক্ষীদল কুর্নিশ করে জানায়—"মেঠাই গেলবার আগেই সব কথা হজম হয়ে গিয়েছে জনাব, হাজার তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে একটি কথাও খুঁজে পাবার নয়।"

—"সাবাস! আচ্ছা, এবার যেমন যেমন বলেছি, সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো?"

রক্ষীদল সমস্বরে জানায়—"নিশ্চয়।"

—"তাহলে এবারে দ্বারের সামনে সব চটপট শুয়ে পড়। আমি এখনি ফিরবো।" আর একবার কক্ষ মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে নিঃশব্দে চলে যান আবদুল।

নিবিষ্টমনে এক দৃষ্টিতে অবন্তীমালার দিকে তাকিয়ে আছেন হরিশ্চন্দ্র।

হ্যাঁ, ঐ তো কম্পিত হচ্ছে ওষ্ঠ! চোখের পল্লব! দৃষ্টি ফিরে আসছে অসাড় চোখে! উত্তেজনায় হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। কম্পিত হাতে আরও ঘন ঘন অবন্তীমালার সারা অঙ্গে ওষুধ লেপন করেন। হ্যাঁ, এখন রীতিমতো উষ্ণ হয়ে উঠছে অঙ্গ! আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে হরিশ্চন্দ্র উচ্চারণ করেন—'অবন্তীমালা! অবন্তীমালা! এবার তোমার চুম্বক নয়ন আমার হবে, বুকে ধরবো তোমার শ্বেতপঙ্কজ আনন!'

আত্মহারা হরিশ্চন্দ্রের আনত-মুখের ঘনশ্বাসে অবন্তীমালার চূর্ণ কুন্তল গণ্ডে কপালে ছড়িয়ে পড়ে। পরম সোহাগে হরিশ্চন্দ্র বার বার সে চূর্ণ কুন্তল গুছিয়ে দেন।

হঠাৎ অস্ত্রের ঝনাৎকারে চমকে ফিরে পরম উল্লাসে লাফিয়ে চিৎকার করে ওঠেন আত্মহারা হরিশ্চন্দ্র—"দেখুন জাহাঁপনা! আপনার বাঁদী আরোগ্য লাভ করছে।"

ধীরপদে গম্ভীরমুখে এগিয়ে আসেন তভ্রোল। খাসনবীশ ও ইরাণী গস্তিদার তাঁর অনুসরণ করেন। তভ্রোল অবন্তীর শয্যার পার্শ্বে এসে হাঁটু গেড়ে বসে তার প্রতিটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করে বার বার স্পর্শ করেন। হরিশ্চন্দ্র দুই হাত বক্ষসংলগ্ন করে অধীর আবেগে সুলতানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করেন।

পরীক্ষান্তে তীক্ষ্ণ চোখে বৈদ্যকে বিদ্ধ করে গম্ভীরকণ্ঠে তভ্রোল বলেন—"কাফের, তুমি হয় উন্মাদ, নয় তো অতি চতুর। তোমার সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, এবার প্রতিশ্রুত গর্দান দিতে হবে।"

আকুল হয়ে জানু নত করে হাত জোড় করেন হরিশ্চন্দ্র—"গর্দান নিতে হয় নেবেন জাহাঁপনা, কিন্তু আমায় আর সামান্য সময় দিন। আমি নিশ্চিত জানি—কৃতকার্য হবোই।"

তীক্ষ্ণ চোখে ভ্রূকুঞ্চিত করেন তভ্রোল।—"কি করে জানলে?"

বিহ্বল হরিশ্চন্দ্র তভ্রোল-এর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে অস্থির বুক দু'হাতে চেপে ধরে আবেগ কম্পিতকণ্ঠে বলেন—"আমি জানি জাহাঁপনা, স্পষ্ট দেখেছি সুলতানার ওষ্ঠ কম্পিত হচ্ছে।"

রোষকম্পিতকণ্ঠে তভ্রোল উচ্চারণ করেন—"আর তোমার সেই স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে মুস্তাফিজকে নিয়ে পালিয়েছে পণ্ডিত, কেমন? না কি দু'জনে কারসাজী করে তাকে পার করেছো?"

এতক্ষণে লক্ষ্য করেন হরিশ্চন্দ্র। রুদ্রতাপের স্থান শূন্য! গোপীবল্লভ অদৃশ্য! কোনটা স্বপ্ন! অবন্তীমালার ওষ্ঠের স্পন্দন, না, গোপীবল্লভের অপসরণ! চিবুকে হাত রেখে বিস্মিত বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন হরিশ্চন্দ্র।

তাড়া দেন গস্তিদার—"আর দেরীতে কাজ শুরু হলে এ বান্দাকে আসামী করবেন না জাহাঁপনা।"

গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ দেন তব্রোল—"এবার তোমার ইলম শুরু কর গস্তিদার।"

আর একবার সজলচোখে আকুল আবেদন জানালো হরিশ্চন্দ্র—"এ অধমকে আর মাত্র দু'দণ্ড ভিক্ষা দিন জাহাঁপনা। তারপর এ বান্দার গর্দান নিতে আদেশ করবেন। তখন আর বিন্দুমাত্র দুঃখ থাকবে না আমার। জাহাঁপনার পবিত্র চরণে এ গোলামের প্রাণের বিনিময়ে শুধু এইটুকু প্রার্থনা।"

ধমকে ওঠেন গস্তিদার—"চুপ কর হে দাম্ভিক কাফের। ধৃষ্টতা রাখ। ইরাণী ইলম যা পারবে তুমি কী তাই পারবে—তুমি ঘুচাবে বেহুঁশি? সুলতানকে তরল চতুরতায় ভোলাবার বৃথা চেষ্টা করো না বেয়াকুফ!"

প্রতিটি মুখের 'পরে একবার আর্ত সজলচোখ বুলিয়ে আনেন হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু…না…কেউ দয়া করবে না! সুলতান থেকে গস্তিদার সকলের চোখেই ক্রূর ব্যঙ্গ হাসি পরিস্ফুট!

আবদুল-এর প্রতি চেয়ে সুলতান আদেশ করেন—"এ কাফেরকে নিয়ে যাও। অর্ধপ্রহরের মধ্যে দরবারে হাজির করবে এর আমিনা-তরিন্ সব্।"

কক্ষের বাইরে এসে ভূলুণ্ঠিত অচৈতন্য অবিন্যস্ত রক্ষীদলের প্রতি তব্রোল অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ফিরে দাঁড়িয়ে আবদুলকে কঠিন দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে বলেন—"হকিমকে তোমার মগজ দেখিও, আককল ক্রমেই কমে আসছে তোমার। নইলে একটা সামান্য কাফেরের বাক্যজালে মগজ হারিয়ে ফেল? আর এই অকর্মণ্য বরকন্দাজদের ভরসায় তোমার জিম্মায়-দেওয়া আসামী ফেলে রেখে ঐ শয়তান বৈদ্যটার চতুর আবেদন শোনাবার জন্য সুলতানের মহল পর্যন্ত পা বাড়াবার বেয়াকুফী কর? এ কসুরের জন্য তোমার ঐ মগজহীন সর্ গর্দান থেকে খারিজ হওয়াই আইন। খোদার দয়া—এবার মাফ পেলে—কিন্তু এমন অপরাধ দ্বিতীয়বার যেন না হয়, সাবধান!"

কপট বিনয়ে কুর্ণিশ করে সুলতানের দয়া স্বীকার করেন আবদুল।

তার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তব্রোল আবার আদেশ করেন—"যাও, এখনি হকিম তলব কর। আর কাফেরটার গর্দান খারিজের আগে জেনে নাও কোন দাওয়াইয়ে এত শীগগীর হুঁশ হাসিল করা যায়।"

দ্বিতীয় বার কুর্ণিশ করে আবদুল জবাব দেয়—"জাহাঁপনার মেজাজ বুঝে অনেক আগেই হকিমকে এত্তেলা পাঠিয়েছি। এই তো এসে পড়েছেন মালেক গজর-আলী।"

গস্তিদারের প্রতি চেয়ে তব্রোল বলেন—"তুমিও জেনে রেখো—তোমারও জবানের দাম সব্। তোমারও সময় মাত্র এক প্রহর।"

কুর্ণিশ করে গস্তিদার বলেন—"ইরাণীদের জবান মিথ্যা হয় না জাহাঁপনা।"

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি আর একবার চেয়ে গম্ভীরমুখে সুলতান প্রস্থান করলেন। সুলতানকে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে খাসনবীশ রক্ষীদলসহ এসে হরিশ্চন্দ্রকে শৃঙ্খলিত করেন। পাথরের মূর্তির মতোই চেয়ে থাকেন হরিশ্চন্দ্র। নিস্পন্দ হরিশ্চন্দ্রের ঘাড় ঝাঁকিয়ে আবদুল বলেন—“আর ধ্যানে থেকে কি করবে ব্রাহ্মণ? এবার তোমাদের মন্তর-তন্তর যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাদের স্মরণ কর।”

বিহ্বল দৃষ্টি তুলে ক্ষণেক আবদুল-এর মুখের 'পরে চেয়েই চোখ নত করেন শৃঙ্খলিত হরিশ্চন্দ্র।

সকৌতুকে হরিশ্চন্দ্রের শিখা টেনে আবদুল আবার বলেন—“আর দাঁড়িয়ে মিছে জানের মায়া বাড়াও কেন? চল, এবার সোজা চোখ রেখে মাকৃতাল। চল চল, আর দেরী নয়। অর্ধপ্রহরের মধ্যে নগর উত্তীর্ণ হয়ে মাকৃতাল পৌঁছান সোজা নয়। অর্ধপ্রহরের মধ্যেই তোমার খুনে-রাঙা খবরু সুদ্ধু সব্ নিয়ে ফিরতে হবে।”

তবু নড়েন না, নড়তে যেন পারেন না হরিশ্চন্দ্র। অবন্তীমালার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শিখায় জোর টান দিয়ে আবদুল জিজ্ঞাসা করেন—“কি হে, তাহলে কি এখানেই কাজ সেরে নেবো নাকি? সময়ও সংক্ষেপ হবে।”

রক্ষীদল সমস্বরে বলে ওঠে—“সে কি জনাব? নগরের লোক জানবে না! একটু বাদ্যভাণ্ড···”

কোমরের শৃঙ্খল ধরে টানে অপর রক্ষী।—“চল···বদমাশ, চল!”

শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝনিতে নিথর বুকের রক্ত যেন আলোড়ন তুলে রক্ষীর কথারই প্রতিধ্বনি করে—চল, ভাগ্য চল।

শিঙা, করতাল দুন্দুভী, কাড়া-নাকাড়ার উচ্চরোল শুনে গৃহের দ্বারে এসে দাঁড়ায় উচ্চকিত নগরবাসী। নগরের প্রশস্ত পথে অশ্বপৃষ্ঠে আগে আগে চলেছেন খাসনবীশ আবদুল। তারপর কয়েদ কোতোয়ালের পিছু পিছু চলেছে শাণিত খড়্গ কাঁধে শমনরূপী দুই জহ্লাদ। অবশেষে ধীর পায়ে অবনতমুখে রক্ষী-বেষ্টিত হয়ে চলেছেন শৃঙ্খলিত মুহ্যমান হরিশ্চন্দ্র! সুলতানের ক্রোধে নরবলি প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবু এই উল্লসিত বাদ্যভাণ্ডের শব্দে কেঁপে উঠে মানুষের বুক! অস্থির বুকে সজলচোখে অলিন্দের জাফরির ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়ান এসে সৌধবাসিনীরা। গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে দেখেন যুবা, প্রবীণ ও বৃদ্ধরা। অপরাধীর পিছু পিছু হাতে তালি দিয়ে ছুটতে থাকে ক্রীড়ারত বালকের দল। আবার কোন অবোধ শিশু কানে হাত রেখে ভয়ে ছুটে এসে কেঁদে মায়ের বুকে মুখ লুকোয়।

নগর তোরণদ্বারে পৌঁছে অশ্বের বল্গা সংযত করলেন আবদুল। দূর

থেকেই দেখতে পেলেন বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে এক আরোহী দ্রুত এগিয়ে আসছে। অনুমান করলেন দিল্লী-আগত দূত।

তোরণদ্বারে এসে শ্রান্ত অশ্বারোহী অশ্ব সংযত করে কপালের স্বেদ মুছে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে আবদুলকে কুর্ণিশ করেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য হরিশ্চন্দ্রের ওপর নিবদ্ধ হয়। তারপর বিস্ময় গোপন করবার জন্যই যেন সপ্রতিভ হয়ে আবদুল-এর দিকে চেয়ে বলেন—"সংবাদ গুরুতর। এই মুহূর্তেই সুলতান-খাসে জরুরী খবর পেশ করা প্রয়োজন।"

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে আগত অশ্বারোহীকে একান্তে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে কিছুক্ষণ আলাপ করেন আবদুল। তারপর অশ্বপৃষ্ঠে উঠে কয়েদ কোতোয়ালকে আদেশ করেন—"রহমান, তোমার জিম্মায় এই আসামীকে দিলাম। মনে রেখো, সুলতানের খাস আসামী। চারদণ্ডের মধ্যেই আসামীর সব্ সুলতান-দরবারে হাজির করা চাই। আমি দিল্লীর খবর নিয়ে প্রাসাদে চললাম।"

মুখের কথা শেষ না হতেই আবদুল তীরবেগে প্রাসাদ অভিমুখে অশ্ব ছুটিয়ে দেন।

অশ্ববল্গা নিকটস্থ রক্ষীর হাতে দিয়ে হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে দাঁড়ান নবাগত দূত, শ্রীনেত্র বৃহৎচট্ট। ভাবহীন আয়ত-চোখ একবার শ্রীনেত্রের মুখের 'পরে ক্ষণেকের জন্য তুলেই দৃষ্টি নত করেন হরিশ্চন্দ্র।

সমাগত লোকদের দিকে চেয়ে দূত বলেন—"আপনারা এখান থেকে সরে যান—গুরুতর খবর এসেছে…।"

জনতা খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

অতি নিম্নকণ্ঠে গ্রাম্যভাষায় শ্রীনেত্র প্রশ্ন করেন—"হরি, তুই এখানে! এ অবস্থায়! নগরে কতদিন হলো এসেছিস?"

নতমুখে অস্ফুটকণ্ঠে হরিশ্চন্দ্র বাল্যবন্ধুর কানে কি যে বললেন তা উচ্চ বাদ্য-রোলের জন্য শোনা গেল না।

পেছন ফিরে দুইজনকে একত্র দেখেই কঠিনস্বরে দূতকে সরে যেতে আদেশ করেন কয়েদ কোতোয়াল। আদেশ শোনা মাত্র রহমানের কাছে এগিয়ে এসে ধীরগতি অশ্বের পিঠে হাত রেখে নীচুকণ্ঠে আত্মীয়তার স্বরে শ্রীনেত্র বললেন—"ঐ বেয়াদব ব্রাহ্মণটার কাছে বহুদিন হলো আমার কিছু স্বর্ণ গচ্ছিত আছে। হঠাৎ ব্যাটা এখন মরতে বসে আমাকে ফাঁকি দিতে চলেছে। একি আর আমি জানতাম? ভাগ্যে শেষমুহূর্তে দেখা হলো! জনাব যদি এখন করুণা করে অনুমতি দেন তাহলে ধোঁকাবাজটার নিকট গচ্ছিত স্বর্ণের অবস্থানটা অন্ততঃ জেনে নিতে পারি। যদি আদায় হয়—তাহলে জনাবকে তাঁর প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করবো না নিশ্চিত।"

দূতের কথায় হৃষ্টচিত্ত কোতোয়াল স্বীয় গাম্ভীর্য বজায় রেখে নীরবে ঈষৎ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন।

বহুদিন পর দুই বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎলাভ ঘটেছে। মিলন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উভয়েই অভিভূত। অতিকষ্টে উদ্বেলিত অশ্রু দমন করে উভয়েই সংযত হলেন। কেননা বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে নিশ্চিত মৃত্যুকে আর রোধ করা যাবে না।

মৃত্যু-মিছিল নগর উত্তীর্ণ হয়ে ভাগীরথী-তীরে বধ্যভূমিতে এসে পৌছলো। বলিপীঠে উপস্থিত হয়ে হরিশ্চন্দ্র বললেন—"মহানুভব কোতোয়াল সাহেব যদি অনুমতি করেন তাহলে এ-হতভাগ্য অপরাধী তার ইষ্টদেবের নিকট শেষ প্রার্থনা জানাতে পারে।"

কোতোয়াল সাহেব এখন সুলতানের প্রতিনিধি। হরিশ্চন্দ্রের প্রার্থনার উত্তরে তিনি সময়োচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে ধরলেন।

কুর্ণিশ করে হরিশ্চন্দ্র বললেন—"আপনাদের খোদার কাছে উপস্থিত হবার পূর্বে ভাগীরথী-জলে স্নান ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করে তাঁদের কাছে চিরতরে বিদায় নেবার যদি অনুমতি করেন?"

কপট তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জিহ্বায় চুক্ চুক্ শব্দে সহানুভূতি দেখিয়ে শ্রীনেত্র বললেন—"দিয়ে দিন জনাব, ওর জিন্দগীর আখেরি ইচ্ছা…!"

ক্ষণেক চিন্তা করে রহমান বললেন—"আচ্ছা, কিন্তু যেন অধিক বিলম্ব না হয়! আর দুই দণ্ডের মধ্যে তোমার সর্ সুলতানের দরবারে হাজির করতে না পারলে আমার নিজের সর্ গর্দানে রাখতে পারবো না।"

—"না জনাব, দেরী হবে না। তিনটি ডুব আর কয়েকটি মাত্র মন্ত্র!"

রক্ষী-বেষ্টিত হয়ে নদীতীরে পৌছে শৃঙ্খলিত হরিশ্চন্দ্র বললেন—"মহামান্য কোতোয়াল সাহেবের কাছে আর একটি আবেদন…"

কথা শেষ না হতেই ভ্রূকুটি করেন রহমান—"আর অনুরোধ-উপরোধের সময় নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সার, নতুবা…" ঝনৎকারে কটিবদ্ধ তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন।

শিহরিত হরিশ্চন্দ্র কণ্ঠে অধিকতর বিনয় এনে বললেন—"আচ্ছা তাহলে থাক, ও এমন কিছু নয়। তবে কিনা আমার কোমরে পূর্বপুরুষদের স্মৃতি-চিহ্ন একটি স্বর্ণসূত্র রয়েছে। দয়াবতার কোতোয়াল সাহেবের অনুগ্রহেই যখন শেষসময়ে পিতৃপুরুষদের স্মরণ করতে সমর্থ হলাম তখন কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি-স্বরূপ পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্নটিও যদি কোতোয়াল সাহেবের হাতে দিয়ে যেতে পারতাম! তাঁদের গচ্ছিত ধনের যথার্থ সম্মান রক্ষা হলো দেখে পিতৃপুরুষরাও নিশ্চিত আনন্দিত হতেন!"

তীক্ষ্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রহমান হরিশ্চন্দ্রকে চেয়ে দেখলেন।

কণ্ঠে আরও বিনয় ঢেলে হরিশ্চন্দ্র বললেন—"আমার হাতের এই শৃঙ্খল ক্ষণেকের জন্য মুক্ত করে দিলে সূত্রটি জনাবের হাতে খুলে দিতে পারতাম।"

কোমরের মোটা স্বর্ণসূত্রটি টিপে পরীক্ষা করতে রক্ষীদের ইশারা করলেন

রহমান। রহমানের চোখের ইশারায় উৎসাহিত হয়ে হরিশ্চন্দ্রের কোমরের বস্ত্রের বন্ধন টেনে খুলতে খুলতে রক্ষীদল বলে—"তুমি আর কেন কষ্ট করবে ঠাকুর—ওই স্বর্ণসূত্রটুকু আমরাই অনায়াসে খুলে নিতে পারবো।"

শ্রীনেত্রের প্রতি একবার চকিতে নিরুপায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন বিব্রত হরিশ্চন্দ্র।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন শ্রীনেত্র।

বুদ্ধিহীন বিরসমুখে রহমান বললেন—"তোমার আবার কি হলো হে? ঐ সূত্রটিই কি তোমার সেই গচ্ছিত স্বর্ণ?"

হাসি সংযত করবার কপট চেষ্টা করে শ্রীনেত্র বললেন—"না জনাব, ও-সূত্র কেন আমার হবে? আমার হলো গিয়ে ঘটপূর্ণ স্বর্ণ দিনার। তবে ব্যাপার কি জানেন জনাব, ও-সূত্র টেনে খোলা যাবে না। ওটির গ্রন্থিতে কৌশল আছে সেজন্যই ওটা ওই বদমাশ ভিন্ন অপর কারো পক্ষে খোলা অসম্ভব।"

সত্যিই খোলা যায় না মোটা স্বর্ণ-সূত্র, কোমরে অদ্ভুত কৌশলে আঁট করে বাঁধা! হুকুম দেন রহমান—"কোমরটাই নয় আগে কেটে ফেলা যাক!"

করুণস্বরে হরিশ্চন্দ্র বললেন—"তা না হয় কাটবেন জনাব, কিন্তু আমার পিতৃ-তর্পণ?"

—"ও হ্যাঁ।" তারপর রক্ষীদের দিকে চেয়ে রহমান আদেশ করলেন—"আচ্ছা, হাতের শৃঙ্খলটিই না হয় খুলে দাও এক মুহূর্তের জন্য, স্বর্ণ-সূত্র খুলে দিয়ে জলে নামুক। কোমরের শৃঙ্খলটি কিন্তু শক্ত করে ধরে থেকো।"

হাতের শৃঙ্খল মুক্ত করে দেয় রক্ষীদল।

একটি মাত্র রক্ষীর হাতে ধরা কোমরের শৃঙ্খল। স্বর্ণ-সূত্রটির ওপরেই আর সকলের লোলুপদৃষ্টি। নিমেষের মধ্যে লোভাতুর অসতর্ক রক্ষীদের দুই হাতে সবলে ঠেলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হরিশ্চন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদলও লাফিয়ে পড়লে। কিন্তু কোথায় হরিশ্চন্দ্র! শৃঙ্খলের ভার নিয়ে হয়তো অতলে ডুবে গিয়েছেন! নির্মল ভাগীরথীর স্রোত বৃথাই ঘোলা করে ঘোরে রক্ষীদল, হরিশ্চন্দ্রের সন্ধান আর মেলে না।

হায় হায় করেন রহমান—"এখন উপায়!"

শ্রীনেত্রও রহমানের সঙ্গে সঙ্গে কপট সহানুভূতিতে হায় হায় করে উঠলেন। তারপর তাঁকে প্রবোধ দেবার জন্য বললেন—"বৃথা সময়ের অপব্যয় করছেন সাহেব। ও ব্রাহ্মণকে বাল্যকাল থেকেই জানি। যোগ-সন্তরণে বিশেষ পটু, এক ডুবে চার দণ্ডের পথ উত্তীর্ণ হতে পারে। এতক্ষণে শৃঙ্খল খুলে হয়তো সাগর-দ্বীপের পথ ধরেছে।"

উত্তেজিত হয়ে তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন রহমান্। তারপর শ্রীনেত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন—"তবে তোমার দোস্তের বদলে না হয় তোমারই সর্ নিয়ে যাওয়া যাক?"

কৌতুকের ভাব গোপন রেখে বিনীত হাসেন শ্রীনেত্র। বললেন—"খান সাহেবের শির রক্ষার জন্য এ অধম শির দিতে পারলে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য উপস্থিত অধমের শিরে দিল্লীর বহু জরুরী সংবাদ অবস্থান করছে। এখনই হয়তো সুলতান এ অধমের জিন্দা শিরের জন্য তলব করবেন। যদি আপনার হাতে সে-শির কোতল দেখেন, তখন কি আর আপনার শির রক্ষা করা যাবে?"

আর একবার ক্রোধোন্মত্ত ভ্রূকুটি মেলে শ্রীনেত্রকে দগ্ধ করে মুখ ফিরিয়ে ভাগীরথীর স্রোতের তল পর্যন্ত দেখবার প্রচেষ্টায় নিরূপায় দৃষ্টিপাত করলেন রহমান।

কৌতুকহাস্য সংযত করে কৃত্রিম চিন্তিতমুখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে শ্রীনেত্র বললেন—"এ মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন বটে! তবে হ্যাঁ, অপরের মুণ্ড গ্রহণে যদি বাধা না থাকে তাহলে এক উপায় হয়তো হতে পারে।"

ভাগীরথীর বুক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি তুলে ধরলেন রহমান।

সহানুভূতির স্বরে শ্রীনেত্র উত্তর দিলেন—"কিছুক্ষণ পূর্বে ভাগীরথীর তীর দিয়ে আসতে আসতে দেখতে পেলাম এক বস্ত্রব্যবসায়ী ভাটী স্রোতে পানসি নিয়ে তীরবেগে চলেছে। বস্ত্রব্যবসায়ীর অমন ক্ষিপ্রগতি খুবই সন্দেহজনক। এখুনি পানসি নিয়ে পূর্ব স্রোত ধরে ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হতে পারলে রহস্যের কিনারা এবং শিরের ঠিকানা দুই-ই হয়তো নির্বিঘ্নে আপনার হাতে এসে যেতে পারে।"

ক্ষণেক চিন্তা করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রহমান প্রশ্ন করলেন—"সত্য বলছো?"

—"মিথ্যা বলবার তো কোনো কারণ নেই জনাব।"

—"তবে তুমিও সঙ্গে এস, পথ দেখিয়ে চল।"

—"আমি যেতে পারলে তো ধন্য হতাম। কিন্তু হুজুর আমার যাওয়ায় বিপদ আছে। যে কোন মুহূর্তেই সুলতানের তলব আসতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রাসাদ-অভিমুখে অশ্ব ছোটাতে হবে। খাসনবীশ সাহেব হয়তো এতক্ষণে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। কে জানে ইতিমধ্যেই সুলতান আমার খোঁজ করছেন কিনা! তবে আপনার চিন্তার কিছু নেই, পথ একেবারে সোজা। পূর্ব নদীপথে এখন অধিক নৌকো চলাচল করে না সুতরাং আপনি সহজেই ঐ নৌকো চিনে নিতে পারবেন। আমি বরং সুলতান-সমীপে উপস্থিত হয়ে নানা সংবাদ পরিবেশন করে তাঁকে এমন ব্যস্ত রাখবো যাতে আপনার বিলম্ব তিনি অনুমান করতে না পারেন।"

রহমানের শিঙার সঙ্কেত-ধ্বনি পেয়ে ফিরে এল অকৃতকার্য রক্ষীদল। তাদের নিয়ে ঘাটে বাঁধা একখানি শূন্য পানসিতে উঠে চিন্তিতমুখে রহমান পুবদিকে রওনা হলেন।

পানসি স্রোতের বাঁকে অদৃশ্য হলে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে প্রাসাদ অভিমুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন শ্রীনেত্র বৃহৎচট্ট।

আবদুল-এর দিকে রক্তচক্ষুতে চেয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে তঘ্রোল বললেন—"কালই খবর এল, বর্ষায় দিল্লী ত্যাগে প্রস্তুত নন বলবন, আবার আজই কিনা খবর অন্যরূপ! জাসুস্‌রা পর্যন্ত অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে বলে সন্দেহ হচ্ছে!"

ভীত বিষণ্নমুখে সম্মতিসূচক মাথা দোলান আবদুল।

হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন তঘ্রোল—"ডাকো সে ব্রাহ্মণকে, আমি নিজে তার মুখ থেকে সঠিক খবর শুনতে চাই।"

উত্তরে আবদুল বলেন—"তার আস্‌প অত্যন্ত শ্রান্ত। পদব্রজে নগরের পথ অতিক্রম করে আসতে যা বিলম্ব। এখনই হয়তো উপস্থিত হবে।"

—"হুঁঃ, আজ সুলতান মুঘীষ-এর আস্‌প-এরও অভাব ঘটেছে, কি বল?"

হঠাৎ কক্ষের বাইরে হামেহাল-হাজিরা কুর্ণিশ করে হেঁকে উঠলে—"গস্তিদার!"

সঙ্গে সঙ্গে আভূমি নত হয়ে কুর্ণিশ দিতে দিতে ঢুকলেন গস্তিদার। বললেন—"দাওয়াই সব প্রস্তুত জাহাঁপনা।"

নীরবে গস্তিদারের মুখের দিকে একবার আনমনে চেয়ে পৃষ্ঠদেশে দুই হাত আবদ্ধ রেখে আবার নতমুখে পদচারণ করতে থাকেন তঘ্রোল। তারপর বিস্মিত গস্তিদারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খাসনবীশের প্রতি চেয়ে বললেন—"যাও মহলনবীশকে বল, ছয় মাসের মধ্যে একটি নবকল্পিত মহল চাই সুলতানের খাসমহল-এর পাশে। আর খাসনিদ্‌মহল-এর জন্য বরাদ্দ করে দাও নিত্য পুষ্প-কর্পূরের মালা।"

আবদুল বিদায় হলে পর গস্তিদারকে সম্বোধন করে তঘ্রোল বললেন—"যাও, তোমার ইলম পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হলে নসিবের লিখন মতো গর্দান খারিজ অথবা ইনাম-তোষ-এর হুকুম জানতে পারবে। ততক্ষণ তোমার হেপাজতে রক্ষিত জান আর নিজের এবং সুলতানের জন্য খোদার কাছে আর্জি জানাওগে।"

নির্জনকক্ষে অস্থিরচিত্তে আবার পদচারণ করতে লাগলেন তঘ্রোল—তাই তো। বৃদ্ধ অসুস্থ বলবন-এর হঠাৎ এত শিকারের সখ জেগে উঠলো কেন! ফিরিস্তাদাররাও অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে! উজীর, কাজী, সালারে-ফৌজ, হাবিলদার, সেরেস্তাদার—সকলের চোখে যেন অবিশ্বাসের ছায়া! কে সত্য, কে মিথ্যা! এত অবিশ্বাস পেছনে নিয়ে কি মরণের সামনে দাঁড়ান সম্ভব!

আবার হাঁক দেন হামেহাল-হাজিরা—"দিল্লী-আগত জাসুস্‌।"

কুর্ণিশ দিতে দিতে প্রবেশ করলেন শ্রীনেত্র।

ভ্রূকুঞ্চিত করে গম্ভীরকণ্ঠে তভ্রোল জিজ্ঞাসা করলেন—"দিল্লী থেকে আসবার পথে কাসিদে-সওয়ার কি আস্প বদল করতে পারেনি ?"

দ্বিতীয়বার কুর্ণিশ করে জানালো শ্রীনেত্র—"জাহাঁপনার সুশাসনে ঘাঁটিতে অশ্বারোহী বা অশ্বের অভাব নেই। পথে প্রতি ঘাঁটিতেই উপযুক্ত বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে।"

—"তবে ? সুলতানের দরবারে জাসুস্ হাজির হতে বিলম্ব করল কেন ?"

শ্রীনেত্র সভয়ে বললেন—"হুজুর জনাব খাসনবীশ সাহেব স্বয়ং জাহাঁপনার দরবারে দিল্লীর খাস-খবর পেশ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এ বান্দা নগরে কিছু জলযোগের সুযোগ গ্রহণ করেছিল মাত্র। সে অপরাধ জাহাঁপনা ক্ষমার চোখে দেখবেন এমন অভয় তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম।"

নীরবে নতশিরে ক্ষণেক চিন্তা করে অন্যমনে দাড়ি টেনে টেনে তভ্রোল বললেন—"শুনলাম, বলবন দিল্লী ত্যাগ করে শিকারে বেরিয়েছেন ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, জাহাঁপনা।"

—"কিন্তু কালই অনুরূপ খবর নিয়ে ফিরেছিল অপর এক জাসুস্, তা বোধ হয় জানো ?"

—"জানি জাহাঁপনা। ফিরিস্তাদারমহলে তার সঙ্গেও দেখা হয়েছে। শুনলাম, সে দুর্ভাগা পথে নিতান্তই অসুস্থ হয়ে পড়ায় বল্গকপুর পৌছতে কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছিল। দিল্লীশ্বর সকল ব্যবস্থা এত গোপনে সম্পন্ন করেছিলেন যে, তাঁর যাত্রার দুইদিন পূর্ব পর্যন্ত সে সকল সংবাদ গুপ্তচরের পক্ষেও সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। পূর্ব গুপ্তচর যখন সংবাদ সংগ্রহ করে দিল্লী ত্যাগ করে তখন পর্যন্ত বর্ষায় বাঙলার নদীবহুল দুর্গমপথ অতিক্রম করা দিল্লীশ্বরের দুর্বল শরীরে সম্ভব নয়, কেবল এই কথাই গোপনে ও প্রকাশ্যে নগরে আলোচনা চলেছিল। কিন্তু মাত্র সাতদিন পূর্বে হঠাৎ শিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করে বহু অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত সৈন্যসহ দিল্লী ত্যাগ করে অবহোদ অভিমুখে যাত্রা করেছেন দিল্লীশ্বর। এ বান্দা বহু কৌশলে সে-সংবাদ সংগ্রহ করে তারপর অবহোদ উপস্থিত হয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে।"

—"হুঁ, তারপর ?"

—"দিল্লীশ্বর দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের জন্য অবহোদ-মালেক বগড়া খানকে ইতিপূর্বেই এক গোপন আদেশলিপি পাঠিয়েছিলেন। পিতার অবহোদ উপস্থিতির পূর্বেই তাঁর আদেশ মতো দুই লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন বগড়া খান।"

—"দুই লক্ষ সৈন্য !"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, জাহাঁপনা। অবহোদবাসীর বিশ্বাস এমন কি গৌড়বাসীরও ধারণা এবার কোনো ক্রমেই পরাজয় নিয়ে ফিরতে রাজী নন দিল্লীশ্বর। সেইজন্যই যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সর্বদিক বিবেচনা করে সুচিন্তিত উদ্যোগ

আয়োজন করে সাফল্য লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। দিল্লীশ্বরের শিকার যাত্রার প্রচার জাহাঁপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করবার প্রচেষ্টা মাত্র।"

—"হুঁম্, আর কোনো সংবাদ আছে?"

—"জাহাঁপনার দরবারে সত্য সংবাদ পরিবেশন দূতের ধর্ম, সে-ধর্ম পালনে অপ্রিয় বাচনের অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করি…।"

ধমকে ওঠেন অধৈর্য তভ্রোল—"বিনয় বাক্যের এখন আর অবকাশ নেই ব্রাহ্মণ! আর কি জান জলদি প্রকাশ কর।"

—"বল্‌গক্‌পুরবাসীরাও এবার ভীত হয়ে পড়েছে।"

শ্রীনেত্রের অতি নিকটে এসে ভ্রূকুঞ্চিত করে তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে তভ্রোল জিজ্ঞাসা করলেন—"বল্‌গক্‌পুরবাসীরাও কি মনে করছে দিল্লীশ্বরের শিকার যাত্রা ছলনা মাত্র?"

—"তা সে রকম একটা কানাকানি হচ্ছে বৈ কি?"

—"জাসুস্‌দের সকল সংবাদ গোপন রাখাই ধর্ম! সে-প্রতিজ্ঞা বোধহয় ভুলে গিয়েছে সুলতান মুঘীষ-এর জাসুস্‌রা?" হুঙ্কার করে ওঠেন তভ্রোল।

ভয়ে একবার কেঁপে উঠলেন শ্রীনেত্র। কিন্তু পরমুহূর্তে সংযত হয়ে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"নগরবাসী আমীরদের কৌতূহল পূরণ, ভাগ্য নির্ণয় ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁদের গুপ্তচররাও সর্বত্রই বিচরণ করছে জাহাঁপনা।"

—"সে-সব জাসুস্‌দের পরিচয় দরবারে হাজির করাও কি সুলতানের জাসুস্‌দের কর্তব্য নয়?"

—"কর্তব্য বই কি! সাধ্যমতো সে-চেষ্টারও ত্রুটি নেই জাহাঁপনা। কিন্তু তাদেরও তো কৌশলী মাথা।"

—"হুম্, আর কোনো খবর আছে?"

—"জাহাঁপনার আদেশ পেলে কালই পরবর্তী সংবাদের জন্য যাত্রা করতে পারি।"

—"তাই যেও। তোমার ন্যায্য ইনাম খাজাঞ্চিখানা থেকে নিয়ে যাও।"

শ্রীনেত্রকে বিদায় দিয়ে চিন্তিতমুখে মসলন্দ-পোষে বসে মাথা টিপে ধরে অস্পষ্ট উচ্চারণ করলেন তভ্রোল—'দুই লক্ষ সৈন্য!' উন্মুক্ত গবাক্ষপথে চোখ রেখে মৃদুহেসে বলবনকে উদ্দেশ্য করেই যেন প্রশ্ন করলেন: তিন প্রতাপশালী পুত্র পেছনে নিয়েও ক্রীতদাস তভ্রোল-এর সম্মুখে বীরের অহঙ্কারে যুদ্ধে নামতে ভীত হয়ে তুমি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে একটুও লজ্জা বোধ করলে না! কিন্তু তভ্রোলও অল্পবুদ্ধি আর ক্ষীণশক্তি নিয়ে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করেনি! তারপর গবাক্ষের কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন—মহল-আঙিনায় চলেছে ব্যস্ত কর্মচারীর আনা-গোনা। যে যার কাজ করে চলেছে নিশ্চিন্ত মনে। আজ তভ্রোল-এর

মহলে যে উৎসাহ নিয়ে এরা কাজ করে চলেছে কাল বলবন বা বগড়া খান এলেও সমভাবেই কাজ করবে! রাজার রাজ্য থাকা-না-থাকা ওদের নিকট বড় কথা নয়, জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাই হলো ওদের পরম কাম্য! নিঃশ্বাস ফেলে সরে আসেন তঘ্রোল। ঐ নিতান্ত প্রাণ-সর্বস্বদের নিশ্চিন্ত আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ যেন আজ আর সহ্য করতে পারছেন না। মসলন্দ-পোষে বসে সুরাপাত্রের দিকে হাত বাড়াতেই দৌড়ে এসে সুরা ঢেলে দেয় সিরাজীবরদার। সুরাপাত্র মুখে তুলে আবার বলেন—'দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করবে বগড়া খান! করতেই হবে, নইলে নিষ্ঠুর পিতার অভিশাপে নিজের গর্দানে সর্ রাখতে পারবে না।"

পানপাত্র শেষ করে আর এক পাত্র ঢেলে নিয়ে স্ফটিকপাত্রটি উঁচু করে ধরে দুলিয়ে দুলিয়ে সুরার রঙ দেখে হেসে ওঠেন—'হোক দুই লক্ষ সৈন্য—এস বগড়া খান, তোমার অবহেদের সিংহাসন চিরতরে ঘুচিয়ে দেবে সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্! পিতার মৃত্যু অপেক্ষায় তোমাকে দিল্লীর তক্তের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আর দিন গুনতে হবে না। পিতাপুত্র একসঙ্গেই যাবে বেহস্তের সিংহাসনে!' সুরাপাত্র হাতে আবার এসে দাঁড়ান গবাক্ষের পাশে। অস্ফুট উচ্চারণ করেন—'কিন্তু···এই অবিশ্বাসী পরিষদ, যুদ্ধবিমুখ সৈন্য···? ······কি জানি কি খেলা খেলছো খোদা!' তারপর অন্দরের দিকে মুখ বাড়িয়ে হাঁক দেন—"কৈ হ্যায়।"

আদেশ অপেক্ষায় এসে দাঁড়ায় হামেহাল-হাজিরা।

—"যাও, খবর দাও, এই মুহূর্তে হাজির চাই ম্যা-মেহ্‌র দেখনেওয়ালা রাঘব পণ্ডিতের।"

সুরাপাত্র নিঃশেষ করে গা ঢেলে দেন মসলন্দপোষে। আল্‌বোলার দিকে হাত বাড়াইতেই ছুটে এসে আল্‌বোলার নল এগিয়ে দেয় খাসখিদ্‌মদ্‌গার। আল্‌বোলায় টান দিয়েই চোখ বোজেন তঘ্রোল।

স্ত্রী-কন্যা ফেলে যেতে পারেননি গোপীবল্লভ। পাটনীর হাতে পায় ধরে সাধ্য মতো দক্ষিণা গুঁজে দিয়ে গোপনে আশ্রমে এসে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে আবার পানসি ভাসালেন নিরুদ্দেশের পথে। বহুদিন এখানে বাস করেছিলেন—কত স্মৃতি ভেসে আসে মনে! সতৃষ্ণ নয়নে বার বার তীরের দিকে চেয়ে চোখ মোছেন স্বামী স্ত্রী। আবার ইষ্টনাম স্মরণ করে হাত ছোঁয়ান কপালে—'যা যাবার তাতো গেল, ভগবান এখন ভালোয় ভালোয় বিপদ উত্তীর্ণ করে জীবন ক'টা রাখলে হয়!' হতাশ নেত্রে গলুই-এ শায়িত বস্ত্রাবৃত রুদ্রতাপের প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করলেন গোপীবল্লভ।

ভাগীরথীর বুক চিরে তীরবেগে বেয়ে চলেছে পানসি। চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে এনে আবার কপালে হাত ছোঁয়ান গোপীবল্লভ।

হঠাৎ তর্জনী তুলে গোপীবল্লভের কন্যা জিজ্ঞাসা করে—"দেখ তো বাবা ওটা কি ?"

চমকে উঠে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখেন গোপীবল্লভ। দূর হতে তীর-বেগে ছুটে আসছে একটি কৃষ্ণ বিন্দু! হ্যাঁ আরো কাছে! কিন্তু এইদিকেই যেন আসছে! আরো কাছে এসে পড়ল যে! ভালো করে দেখা যায় এবার! হ্যাঁ সুলতানেরই রক্ষীদল! মধ্য আকাশের সূর্য-কিরণে ঝল্‌মল্ করছে জরির সাজ, মাথার সরূপেঁজ! পানসি আরও এগিয়ে এল। তাই তো, এ যে দেখছি কয়েদ কোতোয়াল! ভয়ে ইষ্টনাম পর্যন্ত আর স্মরণে থাকে না গোপীবল্লভের! বৃথা চেষ্টা, কেবল থর্ থর্ করে ওষ্ঠ কাঁপতে থাকে।

অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে বলেন গোপীবল্লভ—"পাটনী ভাই। আরো জোরে বৈঠা চালাও।" বলে, দুই হাতে উপবীত সারা বুকে চেপে ধরে ইষ্ট নাম উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেন!

প্রাণপণে পানসি চালায় চার পাটনী। আর কতটুকু? বড় বাইচের পানসি, তায় সংখ্যাধিক সৈনিকের শিক্ষিত বৈঠা। না, আর বুঝি রক্ষা হলো না! চোখ বুজে সপরিবারে আর্ত চিৎকার করে ওঠেন ব্রাহ্মণ—'হে ইষ্টদেব রক্ষা কর!' কিন্তু ইষ্টদেব হয়তো তখন নিদ্রাগত!

সুলতানের অনুচরদের নৌকো তখন খুবই নিকটে এসে গিয়েছে। গোপী-বল্লভ সপরিবারে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। সারাজীবন তিনি ঈশ্বরের ভজনা করেছেন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় ইষ্টনাম জপ না করে কখনও জলগ্রহণ করেননি—এই বুঝি তার পরিণাম! আজ আর কোনও কথা তাঁর মনে পড়লো না। কারো কথাই মনে পড়লো না। কেবল ইষ্টদেবতাকেই অভিসম্পাত করতে করতে তিনি নদীর অতল তলে তলিয়ে যেতে লাগলেন। মনে হলো কে যেন তাকে একবার স্পর্শ করলে। তারপর তার সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেল। শুধু তলিয়ে যাবার আগে যেন স্ত্রী কন্যার আর্তনাদ একবার কানে এসেছিল। কিন্তু সে একবার মাত্র।

এ-অত্যাচার এই প্রথম নয়। শেষও নয়। বার বার এমনি করে অত্যাচারের বন্যায় জনপদের পর জনপদ জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। আবার লোকালয় হয়ে উঠেছে অরণ্য। গোপীবল্লভ সেই অসংখ্যের একজন, সেই অগণিতের অন্যতম।

রুপোর নস্যাধার থেকে নস্য ঘন ঘন নাকে টিপে দিয়ে বার বার খড়ির রেখা মুছে ছক আঁকেন দৈবাচার্য জ্যোতিষবাচস্পতি সর্ববিদ্যাবিশারদ রাঘবাচার্য। কিন্তু প্রতিবারই এক ফল! অবশেষে খড়ি ফেলে রাঘব অধোমুখে বসে থাকেন।

শেরপোষে শায়িত তন্দ্রোল আল্‌বোলার প্রবালখচিত স্বর্ণ নলে সুদীর্ঘ

টান দিয়ে চোখ বুজেই বলেন—"ভালো করে হিসেব কর হে পণ্ডিত। গত দু'বার তোমার হিসেব একেবারে মিলে গিয়েছিল। এবারও যদি মেলে তাহলে আর এক গ্রাম নয়, একেবারে পঞ্চগ্রাম আল্‌তাম্‌মা করে দেব তোমাকে।"

বিষণ্ণমুখে আবার ছক আঁকতে বসেন রাঘবাচার্য। কিন্তু ফলের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। ছক মুছে আবার হাতের উপর গাল রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

খিদ্‌মৎগারের হাতে আল্‌বোলার নল ছেড়ে দিয়ে স্থলতান উঠে বসেন। চামরবাহিনী দ্রুতবেগে চামর দোলাতে থাকে। সিরাজী এগিয়ে ধরে সুরাসরবরাহক।

সুরাপাত্র তুলে নিয়ে তব্রোল জিজ্ঞাসা করলেন—"কি দেখলে পণ্ডিত?"

নিরুত্তর রাঘবাচার্য অধোমুখে মাথা নাড়েন।

এক নিঃশ্বাসে সুরা পান করে শূন্যপাত্র ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে মুষ্ঠাঘাত করে হুঙ্কার ছাড়েন স্থলতান—"ভালো করে দেখ পণ্ডিত।"

আবার ছক কাটেন ভীত দৈবাচার্য! কিন্তু মিথ্যা ফল বলারও ভয় কম নয়। অতএব সত্যিই বলতে হয়। শুষ্ককণ্ঠে রাঘবাচার্য উত্তর দেন—"জাহাঁপানার এ যুদ্ধে অগ্রসর না হওয়াই মঙ্গল।"

ভ্রূকুটির সঙ্গে দ্বিগুণ হুঙ্কার করে ওঠেন তব্রোল। বলেন—"শত্রু দ্বারে উপস্থিত দেখে যুদ্ধে অগ্রসর হবো না, তবে কি পলায়ন করবো?"

"সেই পথেই হয়তো কিছুটা মঙ্গল জাহাঁপনা। আজ হতে পাচ পক্ষ কাল—শুক্লাদ্বাদশীর মিথুনের তিন পাদ পর্যন্ত আপনার পক্ষে কিঞ্চিৎ শুভ। ঐ সময়ের মধ্যে যদি ভাগীরথী উত্তীর্ণ হয়ে মহানদীর কূল পর্যন্ত পৌছতে পারেন তবে কুপিত গ্রহ কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হতে পারেন।"

—"কেন? ম্যা-মেহর কয়েদ করবার কি সব মন্তর-তন্তর নাকি আছে তোমাদের। তবে সেই চেষ্টাই দেখো। তার জন্যে যা জওহর স্বর্ণ চন্দন ঘৃত কর্পূর প্রয়োজন হয় পাবে। যদি ম্যা-মেহর কয়েদ করে স্থলতানের নসিব কায়েম রাখতে পার তা হলে একেবারে পঞ্চগ্রাম আর সেই সঙ্গে নগদ ইনাম পাবে। যাও, রোজা রেখে আগুন জ্বালোগে স্থলতানের মঙ্গল কামনায়।"—পার্শ্বস্থ হস্তিদন্তের চৌকি থেকে দিনার পূর্ণ ছোট একটি স্বর্ণ পেটিকা দৈবাচার্যের হাতে দিয়ে বলেন—"আজকের দক্ষিণা। তোমার মন্তরে যদি সর্বদিক রক্ষা হয়, তোমার দেহের ওজনে স্বর্ণ পাবে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাঘবাচার্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে কক্ষ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হন। তব্রোল হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—"হ্যাঁ, কোন তারিখ যেন বললে?"

—"আজ্ঞে জাহাঁপনা, আজ থেকে পাঁচ পক্ষকাল। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী দিবা দুই দণ্ড গতে মিথুনের তিন পাদ পর্যন্ত।"

—"আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার, প্রয়োজন মতো আবার তলব করবো। তোমার যাগ মন্তরের জন্য যা প্রয়োজন খাজাঞ্চিকে বলে তোষাখানা থেকে নিয়ে যেও। রসদদার বৈকালে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।"

নীরবে সম্মতি জানিয়ে আভূমি কুর্ণিশ দিতে দিতে রাঘবাচার্য বিষণ্ণমুখে বিদায় হয়ে যান।

পানপাত্র এগিয়ে ধরে সুরা সরবরাহক। পানপাত্র তুলে নিয়ে অন্যমনে তব্রোল বলেন—"সুলতান আজ বড় খাসমহল পরিদর্শনের ইচ্ছা করছেন—খবরদারকে অন্দরে খবর পাঠাতে বল।"

খিদ্মৎগার কুর্ণিশ করে চলে যাবার পূর্বেই আবার হাত তুলে নিষেধ করেন তব্রোল—"না, থাক, প্রয়োজন নেই। যাও তোমরা, কক্ষ নির্জন করে দাও।"

একে একে চামরবাহিনী, খিদ্মৎগার, সিরাজী-বরদার, হামেহাল হাজিরা সবাই চলে যায়। নিজ হাতে একখানি চামর তুলে নিয়ে তব্রোল স্বয়ং চালনা করতে করতে বলেন—'না, শিশমহল-এর শোকে বড় খাসমহলে আশ্রয় ভিক্ষা খুবই লজ্জাকর!'

বাইরে দৌবারিক দাঁড়িয়ে ছিল। খাসনবিশ এসে বললেন—"জাঁহাপনার সঙ্গে একবার ভেট করবো এত্তেলা দাও ভেতরে।"

দৌবারিক প্রশ্ন করলে—"কী সংবাদ?"

—"বল সেই বৈদ্য ব্রাহ্মণের সর এনেছি।"

মনে মনে ভীষণ আতঙ্কও ছিল খাসনবীশের। সেই বেটা বৈদ্য ব্রাহ্মণ পালিয়েছে, পণ্ডিতও অন্তর্ধান করেছে। কোনও উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সেই নৌকায় প্রাপ্ত হিন্দু রক্ষী রুদ্রতাপের দেহ থেকে মৃত সর্ বিখণ্ডিত করে নিয়ে এসেছিল কয়েদ কোতোয়াল। জাহাঁপনা যদি এ-সংবাদ জানতে পারেন তাহলেই সর্বনাশ। তাই মুর্দা সর্টার গায়ে খানিকটা মোরগের রক্ত মাখিয়ে বেলদার মখমলে ঢেকে নিয়ে এসেছিল খাসনবীশ। কিন্তু তবু আতঙ্কে তার বুক দুরু দুরু করছিল।

পরক্ষণেই দৌবারিক সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করলে।

কুর্ণিশ করে দৌবারিক জানাল—"জাহাঁপনার বিশ্রাম নষ্ট করবার এখ্তেলাক মার্জনা করুন—কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাই···!"

—"কি সংবাদ!" গম্ভীরকণ্ঠে চোখ মুদ্রিত রেখে তব্রোল জিজ্ঞাসা করেন।

—"সেই অপরাধী ব্রাহ্মণের সর্···।"

চমকে ওঠেন চিন্তিত তব্রোল।—"সর্। কার সর্?"

—"সেই বৈদ্য ব্রাহ্মণের সর্।"

—"ও, হ্যাঁ। সে মগজহীন জলিল তরিন সর্ ভাগীরথীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে বল, ওর আর কোন প্রয়োজন নেই।"

বিদায় হয়ে যায় সুলতানের মেজাজে অভ্যস্ত নির্বিকার দৌবারিক।

বেদনার্ত নিঃশ্বাস ফেলে তব্রোল স্বগতঃ বলেন—'কত সর্ নিয়ে খেলেছো তব্রোল, দু'হাতে কুড়িয়েছো কত শত-সহস্র অভিশপ্ত কালো নিঃশ্বাস! আজ সে অভিশপ্ত নিঃশ্বাসের ঝড়ে যদি তোমার সর্ লুটিয়ে পড়ে তাহলে বলবনকে অভিসম্পাত দিয়ে তোমার জন্যে দুঃখ করবে, ছোট্ট একটু কাতর নিঃশ্বাস ফেলবে এমন কেউ নেই!'

সুলতানার বিশ্রামকক্ষে ঢুকে কুর্ণিশ করে খুশিতে উজ্জ্বল মামুদা বলে—"খাসনবীশ সাহেব বড কাজের লোক। সুলতানার হুকুমজারী হতে না হতেই তামিল!"

অসলতায় গা মুড়ে নিঃস্পৃহকণ্ঠে সুরাচ্ছন্ন সুলতানা প্রশ্ন করেন—"কোন হুকুম রে মামুদা?"

—"বাঃ! এর মধ্যেই ভুলে গেলে! সেই মন্তরবাজ ব্রাহ্মণটার সর্?"

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে মামুদা।—"সুলতানার মেজাজ সরিফ রাখতে একেবারে রক্তসুদ্ধ সর্টা বেলদার মখ্মলে মুড়ে কায়দা মাফিক হাজির করেছেন খাসনবীশ সাহেব! খাসমহল ফাটকে ভেট-বরদারনী সর্ নিয়ে অপেক্ষা করছে, তাকে আসতে বলবো কি?"

আর একবার গা মুড়ে হাই তুলে চোখ বুজেই উত্তর দেন সুলতানা—"কাজ হাসিল হলেই হলো। এই বাদলা দিনের আমেজী মেজাজ খুন-খারাবী দেখিয়ে আর নষ্ট করে দিস না বাপু। সর্টা বরং আমার পেয়ারী কুত্তাগুলোর মুখে ফেলে দে, ওরা কাড়াকাড়ি করে আনন্দ করুক।"

যে সর্-এর জন্য এত কারসাজী, সুলতানাকে খুশি করতে নিজের জান কবুল করলেন খাসনবীশ, সেই সর্ একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলেন না পর্যন্ত! বিরস হয় মামুদার মন। কিন্তু সুলতানী-খেয়ালের ওপর তো আরজী চলে না। বিষণ্নমুখে বলে—"তাহলে তাই বলিগে না হয়?"

হঠাৎ সুরারক্ত চোখ বহু চেষ্টায় মেলে ধরে সুলতানা জিজ্ঞাসা করেন—"হ্যাঁ ভালো কথা—সে বাঁদীটার খবর কি?"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে মামুদা জবাব দেয়—"সে আর বলো না সুলতানা, পান্‌সে গৌড়ের মেয়েদের দিল্…সেও গাবের শাঁসের মতোই। যেমন হিম, তেমনি পান্‌সে! শিশমহল-এর দাঁড়কাক, জানের সঙ্গে পালাবার আগেই বরক-এর ঝলক লেগেছে শুনে সেই ভোর থেকেই না খেয়ে না দেয়ে পালঙ্কে শুয়ে ফোঁপাচ্ছে।"

—"আহা, রোশেনা বাঁদী নয়, আমি জানতে চাইছি ঐ শিশমহলওয়ালীর শেষ পর্যন্ত কি হলো?"

—"ওঃ, সে আর এক বদ্খবর সুলতানা।"

—"কি রকম ?"

—"বৈদ্য বেচারী নাহ'ক গর্দান খারিজ দিলো। শুনছি সুদূর ইরাণ থেকে কে নাকি এক গস্তিদার এসেছে, তার নাকি জবর ইলম।"

—"সে ইলমে কী হবে ?"

—"কী জানি, হয়তো বৈদ্যের মতো শেষে ইরাণীরও গর্দান খারিজ হবে !"

—"আর যদি শিশমহলওয়ালী আবার জিন্দগী ফিরে পায় ?—বলা তো যায় না, কাফের হিন্দুদের যে অনেক মন্তর-তন্তর আছে—ওরা অনেক যাদু জানে—"

—"তাহলেই তো বিপদ—"

—"হুঁ, এবার তাহলে শিশমহলওয়ালীকে সরাতে হবে।"

—"তাতো হবেই। কিন্তু সরানো কি সহজ কথা !"

—"উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। আচ্ছা তুই এখন যা, আমায় একটু ভাবতে দে।" বলেই সুরাপাত্রের দিকে হাত বাড়ান সুলতানা।

ব্যস্ত হয়ে সুরা ঢেলে দেয় মামুদা। তারপর বলে—"হ্যাঁ সুলতানা—ভেবেচিন্তে যা হোক একটা উপায় বার করো। একটা বঙ্গাল ছুক্‌রী তোমার বুকের কাঁটা হয়ে সুলতানের আদর খাবে—তোমার সইলেও এ-বাঁদীর জানে এমন বে-আদতী বরদাস্ত হবে না। তোমার পঁয়জর ধরি, যাই কর ভেবেচিন্তে একটা সুরাহা বাতলাও।"

সুরাপাত্র হাতে নিয়ে সুলতানা বলেন—"আচ্ছা থাম না বাপু তুই, ভেবে দেখি। এখন যা, আর বলে দিস কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।"

মনে বিস্ময় জাগে মামুদার। সুলতানার এত সাফ্‌সফা মগজের আক্‌কল পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে গেল একটা ছুক্‌রী সামাল করতে ! ও ছুকরী কক্ষণো মানুষ নয়, জিন্নথ্‌ ! নইলে এখনও খতম হয় না ! এখনও সুলতানকে বশে রাখে ! এবার সুলতানের জান রক্ষা পেলে হয় !

একবার চিৎকার করে কাঁদতে পারলেও যেন কতকটা হালকা হতে পারতো রোশেনা। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল ফেলে ফেলেও বুক এক তিল হালকা হচ্ছে না। এমনই শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে অনুশোচনার পাথর ! অসহ্য ! অসহ্য এই পাপের বোঝা !

বালিশে মুখ গুঁজে রোশেনা আজ সমস্ত দিন পড়ে আছে। না, না, সে তো এ-রকম চায়নি ! ভাবতে পর্যন্ত পারেনি অবন্তীমালার কচি বুকের মুকুলিত আশার এমন নির্মম পরিসমাপ্তি !···কিন্তু কী সে চেয়েছিল ? কী সে ভেবেছিল···?···না, কিছুই যেন ভাবেনি—স্পষ্ট করে কিছুই সে চায়নি। রোশেনার সমস্ত চাওয়া পাওয়ার কল্পনা, সম্ভব অসম্ভবের ভাবনা আচ্ছন্ন করে

তাকে অধৈর্য করেছিল তম্রোল-এর উদাসীন উপেক্ষার নির্মম অপমান। আর সেই অধৈর্য মুহূর্তে তার ঈর্ষার আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে তাকে অন্ধ করেছিল মামুদার পঙ্কিল প্ররোচনা, উন্মত্ত করেছিল আর্জিনার ভীতিকর প্রলুব্ধ উত্তেজিত উক্তি। সে-প্রলোভন, ঈর্ষা আর অবমাননার আলোড়নে সুস্থ চিন্তার অবসর ছিল না, ছিল না ধৈর্যের অবকাশ। তুচ্ছ রোশেনার তুচ্ছতম আবেগের আগুনে তিন তিনটি নিরপরাধ প্রাণ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! রোশেনা নিজেকে কেমন করে ক্ষমা করবে? কেমন করেই বা দীর্ঘজীবন এ পাপের বোঝা বুকে বয়ে সে বেঁচে থাকবে! কিন্তু তম্রোল-এর ক্রোধবহ্নি উদ্দীপ্ত হলে এমন নিষ্ঠুর পরিণতির কথা তো কারো অজানা নয়। রোশেনারও তা অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তার সব-জানা সব-না-জানা তখন কেবল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অবহেলিতার প্রতিশোধের উদগ্র কামনা!

আর একবার বালিশে মুখ গুঁজে নিশ্বাস চেপে ধরে রোশেনা—কিন্তু কেন? রোশেনারই কি সব পাপ? রোশেনা তো ভালোই চেয়েছিল অবন্তীমালার—বজ্র যে তার ওপরে এত রোষ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তা তো রোশেনার জানবার কথা নয়। না, না, এ তো রোষ নয়, এ যে বজ্রের প্রেম! অবন্তীমালার কচি বুকের ওপরে বজ্রেরও মায়া ছিল, মায়া নেই কেবল নিষ্ঠুরা রোশেনার। নইলে শুধু মামুদার চোখের তাড়নায় আর স্থলতানার নির্মম শাস্তির কথা স্মরণ করেই কি রোশেনা বিগতরাত্রে স্থলতানের দরবার-মহল-এ গিয়েছিল? ভাগ্যে বজ্র ওদের করুণা করেছিল! নইলে তো কাঁটায় ডুবে কিংবা কুকুরের মুখে নিষ্পাপ দুটি ফুল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত! উঃ, ভাগ্যিস বজ্র ছিল!

সকালে মামুদা এসে তাকে বলে গিয়েছে যে অবন্তীমালা আবার নাকি জ্ঞান ফিরে পাবে। হিন্দুদের নাকি অনেক মন্ত্র-তন্ত্র আছে। কে জানে—কিন্তু তাই যেন সত্যি হয়, হে অন্তর্যামী তাই যেন সত্যি হয়!

সন্ধ্যায় সরবৎ নিয়ে এসে দাঁড়ায় সরবৎ-বরাতী স্থফিয়া-বাঁদী। বলে—"ওঠ স্থলতানা, আজ সারাটাদিন তো জল পর্যন্ত মুখে দিলে না? হাত মুখ ধুয়ে এসে এ-সরবৎটুকু অন্তত মুখে দাও।"

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে রোশেনার। ভালো লাগছে না আলো, ভালো লাগছে না মানুষের স্পর্শ। তবু স্থফিয়ার সামান্য মমতা-স্পর্শে বুকের ভারী পাথরখানা একটু যেন তুলে ওঠে আর তারই ফাঁক দিয়ে এতক্ষণের রুদ্ধ অশ্রু হু-হু করে উছলে পড়ে। নিমেষে ভিজে ওঠে বালিশ। কিন্তু না! এ-জগতে রোশেনার প্রয়োজন আর এতটুকুও নেই! ভিজে বালিশে নিষ্ঠুরভাবে মুখ ঘষতে ঘষতে অন্তর থেকে স্থফিয়ার মমতা-স্পর্শটুকু সরিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্থফিয়া সরবৎ রেখে দিয়ে কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল

এনে রোশেনার মাথায় দেয়। এলিয়ে-পড়া দীর্ঘকেশ গুছিয়ে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—"যা ঘটবার তা তো ঘটে গিয়েছে সুলতানা, এবার শান্ত হও। আজ যদি বা না পার কাল তো চোখ মুছে আবার হাসতেই হবে? তাই তো মোল্লারা বলেন—দুনিয়ার দু'দিনের দুঃখে বেহস্তের চিরদিনের প্রাণ নষ্ট করতে নেই। তা ছাড়া তোমার এত দুঃখই বা কিসের? তোমার কসুরই বা কোথায়? নিজের জান রাখতে গেলে সকল সময়ে কি আর পরের জন্য মায়া রাখা যায়? জগতে জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত আপন জান রাখতে পরের জান নিতে হয়!"

সুফিয়ার সহজ বিশ্বাসের সরল ভাষায় চির খেয়ে যায় রোশেনার বুক। আকুল হয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রোশেনা। বলে—'তুই ঠিক বলেছিস সুফিয়া—আমি সত্যিই মানুষ নই, জন্তু! নইলে নিজের ক্ষুধার আগুনে কি করে···?" আর বলতে পারে না রোশেনা। কণ্ঠস্বর আবার অবরুদ্ধ হয়।

নীরবে করুণ চোখে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলোয় সুফিয়া। রোশেনার অবাধ্য অশ্রু অবিরল ধারে ঝরে পড়ে। জন্তুই তো রোশেনা, নইলে···কি করে নষ্ট করলো অবন্তীমালার সরল বিশ্বাসেভরা আশা-উজ্জ্বল কচি-হৃদয়? কি করে নষ্ট করলো নিষ্পাপ ব্রাহ্মণের মহৎ প্রাণ!

দেখে দেখে শ্রান্তি আসে সুফিয়ার—কি করবে সে? প্রাসাদে চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস তো রাত্রিদিনের হাওয়ার মতোই সহজে এসে আবার সহজেই উবে যায়। ভালো খেয়ে ভালো পরে সুলতানাদের হা-হুতাশ আর চোখের জল, নাচগানের মতোই অলস দিন-ক্ষয়ের আর এক মজলিসি। তবুও চোখের জল দেখলে গরীব নোকরাণীদের বুকের মাঝটি কেমন যেন করে ওঠে। চোখের জলে, চোখের জল টেনে আনে। মনের অস্থিরতায় তখন কিছু না বলে থাকা যায় না। এ ছাড়া এই সুলতানী-কলজের অসুখের দাওয়াই আর কি আছে! সুলতান আমীরদের খেয়ালের আগুনে পোড়া ইটের প্রাসাদে চোখের জলের বন্যা নামলেই বা তার দাগ থাকে কতক্ষণ! প্রথম প্রথম সুফিয়ার চোখের জলই কি মায়ের বুক ছেড়ে এসে কম ঝরেছে? এখন সবই সয়ে গিয়েছে। মনে না করলে আর মনেও পড়ে না সে ভাঙা কুঁড়ের আউস ধানের সোয়াদ! নিশ্বাস ফেলে সরবৎ-এর গেলাশটি তুলে নিয়ে নির্বিকারমুখে সুফিয়া বেরিয়ে যায়।

প্রতিদিনের মতোই নিদ্‌মহল-এর পাশের কক্ষে প্রবেশ করলেন তভ্রোল। একাধিক স্তিমিত শামাদানের স্ফুরিত জ্যোৎস্নার মতো শান্ত স্নিগ্ধ আলোয় ফুলের মালা ও স্তবক সজ্জিত, অগুরু কস্তুরীমদ সুবাসিত কক্ষে অপরূপ মোহময় পরিবেশ!

বিষণ্ণ জলভরা চোখে অবন্তীমালার বিবর্ণ শুষ্ক মুখের 'পরে বহুক্ষণ চেয়ে

থাকেন তভ্রোল। অবশেষে নিশ্বাস ফেলে জ্বেলে দেন খস্‌খস্‌ আতরে সিক্ত পলিতা। নীরব অবন্তীমালার পাশে রাখেন আরো একটি সল্‌মাদার কর্পূরের মালা। করুণকণ্ঠে বলেন—'মালা জমে জমে যে স্তূপ হয়ে উঠেছে প্রেয়সী, কিন্তু তুমি নিজে তুলে গলায় না পরলে আমি তো জোর করে তা পরিয়ে দিতে পারি না। আমার প্রতিজ্ঞা আজও আমি ভুলিনি। কিন্তু তুমি হেরে গেলে। তোমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারলে না!"

তভ্রোল-এর চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে আবার বলেন—'আমিও জানতাম না—নিষ্ঠুর তভ্রোল-এর প্রস্তরময় বুকের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল প্রেমের এমন উত্তাল তরঙ্গ। তুমিই তো তা জাগিয়ে দিলে প্রেয়সী! তোমার সিতারায়ে মশরিক-এর মতো চোখে প্রথম দেখলাম নিজের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তুমি তা দেখোনি। তোমার চোখের বিদ্যুৎঝলকে তখন তা দেখতে পাওনি। কিন্তু আজ অমন করে অপরূপ অপলক চোখে কি দেখছো? এ হৃদয়ের উত্তপ্ত প্রবল তরঙ্গ তোমার রুদ্রতাপের মতো ক্ষুদ্র-প্রাণ সহস্র ব্রাহ্মণ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ হৃদয়ের আগুন বজ্র হয়ে এরূপ শত সহস্র ব্রাহ্মণকে ভস্ম করতে পারে!'

চমকে ওঠেন তভ্রোল। বলেন—'কিন্তু···তুমি জেগে ওঠ—কথা বলো—আমি কল্পনাও করতে পারি না তুমি হারিয়ে গিয়েছ—না, না, তুমি হারিয়ে যাওনি। আছো, তুমি নিশ্চয়ই আছো।'

বুকে হাত রেখে চোখ বুজে স্থির হয়ে যান তভ্রোল। নিদ্রিতের মতো বলেন—'না, তোমায় হারালে আমার চলবে না, তোমায় হারানো যায় না। তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে প্রেয়সী? সে দিনের মতো তোমার ঐ সরল নয়নের শুভদৃষ্টির আজ যে আমার বড় প্রয়োজন। তোমার চশমা হৃদয়ের একটু শুভ-ইচ্ছা বলবন-এর তুই লক্ষ শাণিত তলোয়ারের মুখ থেকে আমায় ফিরিয়ে আনবে। নইলে আজ বলবন-এর বিপুল অস্ত্রের আঘাত থেকে রক্ষা করবার মতো আর কোনো বলই তো আমার নেই?'

অবন্তীমালার চোখ নিশ্চল পাষাণের মতো চেয়ে থাকে। ব্যর্থ চোখের জলে অসহায় আত্মার আকুল ক্রন্দন জানিয়ে শয়নকক্ষে ফিরে আসেন তভ্রোল।

শিশমহল শয়নকক্ষের দ্বারে হামিদা গালে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। শূন্য! সব শূন্য মনে হয়। অলস প্রাসাদের মন্থর বাতাস যেন চতুর্দিকে গম্ভীরতম বিষাদ ছড়িয়ে দিয়েছে! হামিদার শিশমহল বাঁদী জীবনে কত সুলতানাই তো এল গেল! কিন্তু শিশমহল-এর বাতাসের এমন সর্বহারা রিক্তের ক্রন্দন হামিদা আর কখনো শোনেনি। এক সুলতানার

আগমনে অন্যজন বিদায় হয়েছেন কিন্তু শিশমহল-এর সিংহাসন কখনো শূন্য হয়নি! অসহ্য এ অলস প্রহর! অসহ্য এ শূন্যতার হাহাকার! দু'হাতে হামিদা নিজের বুক চেপে ধরে—না না—এই শিশমহল-এর বাতাসের কান্নাই তো তাকে আকুল করে তুলেছে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কক্ষের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে আনে হামিদা। দেয়ালের আরশিতে আরশিতে ছায়া আঁকে হামিদার! হঠাৎ হেসে ওঠে হামিদা—তবে কি হামিদাই আজ শিশমহল-অধিশ্বরী? গুরু গুরু করে ওঠে বুক! এক ঝলক উষ্ণ রক্ত চোখে মুখে রাঙা আবির ছড়িয়ে দেয়। ছি···ছি···এ কি চিন্তা হামিদার মনে! হামিদা তুচ্ছ আত্তর-বরদারণী। অবাধ্য অশ্রু গণ্ড বেয়ে অবিরল ধারায় ঝরে পড়ে। ক্রীতদাসী হামিদা—অন্য কিছু হবার বাসনা তো কোনোদিন সে করেনি? যা পেয়েছিল তার বেশি তো কিছু চায়নি। সযত্নে শিশমহল-অধিশ্বরীকে সাজিয়েই সে আপন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। আর আড়াল থেকে প্রেম-অভিসারের নিত্য নতুন কথার মালার গুঞ্জরন শুনে—চোখ বুজে সে-গুঞ্জন আপন ক্ষুধার্ত অন্তরের একান্তে বারবার উচ্চারণ করেছে। কল্পনায় সে-ছবি এঁকে—রাত্রির অন্ধকারে—অশান্ত তন্দ্রায় স্বীয় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাও বুঝি অকরুণ ভাগ্যের সহ্য হলো না!

হামিদার পাশ কাটিয়ে উদাসদৃষ্টিতে ধীর পায়ে ঘরে ঢোকে রোশেনা। চোখ তুলে দেখে, জানুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে হামিদা। কক্ষের চতুর্দিকে একবার উদাসদৃষ্টি বুলিয়ে আনে। যেখানে যা ছিল সবই তো সাজানো রয়েছে, তবু কেন কেঁদে ফিরছে শোকার্ত বাতাস? হা হা করে ওঠে রোশেনার বুক। না, না, শিশমহল-এর গৌরব ঐশ্বর্য আর সে চায় না। শুধু ফিরে এস অবন্তীমালা! আবার সুলতান শিশমহলের আনাগোনা করুন। সে কেবল দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেই তৃপ্ত হবে। আর তোমাকে ঈর্ষা করবে না। আবার যেমন ছিল, তেমনি হোক। শুধু এই শূন্যতা, এই রিক্ততা অসহ্য!

মাথা তুলে রোশেনাকে দেখতে পেয়েই হামিদা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে—"তুমিই সুলতানকে প্রকৃত ভালোবেসেছো সুলতানা। তুমিই চেষ্টা করলেই সুলতানকে আবার শিশমহল-এ ফিরিয়ে আনতে পারো।"

সযত্নে হামিদার বন্ধন মুক্ত করে যেমন এসেছিল তেমনি ধীর পায়ে বেরিয়ে যায় নিরুত্তর রোশেনা।

সজলচোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হামিদা। কাঁধ থেকে ঝুলে-পড়া অর্ধমলিন ওড়নাখানার ওপরে হামিদার চোখের জল অবিরল ধারায় ঝড়ে পড়ে। যা সত্যিই হারিয়ে যায় তা আর সাধনা করেও ফিরে পাওয়া যায় না! এই বোধ হয় প্রকৃতির প্রতিশোধ!

দীর্ঘ তাল বৃক্ষশ্রেণী পরিবেষ্টিত সুলতানের আরামবাগের কোণে কোণে লতাকুঞ্জে মাধবী, অপরাজিতার স্তবক মৃদু বাতাসে মন্দ মন্দ দুলছে। নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী বেষ্টিত মর্মরে বাঁধা দীঘিতে শ্বেতপদ্ম কোরক হেসে হেসে অস্তগমনোন্মুখ সূর্যকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। পথের দুই ধারের কেতকী ফুল কৌতূহলী বধূর মতো মুখ বাড়িয়ে ঘোমটা খুলে আকাশের অপর কোণে মেঘাড়ম্বর দেখছে।

দীঘির মর্মরসোপানশ্রেণীতে বসে নির্মল জলে ছিপ ফেলে সুলতানের আশায় অসহিষ্ণু প্রতিক্ষায় অপেক্ষা করছেন ইয়ারের দল। সুলতান না আসা পর্যন্ত সুরা সরবরাহ পরিমিতভাবে চলে। সুলতানের উপস্থিতির পুর্বে সুরায় সম্বিৎ হারানো যে বে-আদতী ও অপরাধ।

নিতান্ত অধৈর্য হয়েই মালেক ইয়াকুব ব্যঙ্গ করে বলেন—"খবিশ সুন্দরীর মোহে সিরাজী, ইয়ার—এমন কি জীবন্ত সুন্দরীরা পর্যন্ত ভেসে গেল! এমন উল্টো স্রোতের দরিয়া খবিশের চোখের আকর্ষণ ভিন্ন আর কিসে সম্ভব?"

সায় দিয়ে জানুতে হাত ঠুকে দ্বিতীয় ইয়ার বলেন—"বলবন এবার খবিশ ছাড়াতে আসছেন।"

হাতের ছিপে নাড়া দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি বলেন—"এই খবিশই হয়তো তাঁকে রক্ষা করবে, কে জানে?"

চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে ফাতনার ওপরে দৃষ্টি রেখে চতুর্থজন বলেন—"ব্যাপারটা হাল্কা কথায় উড়িয়ে দেবার নয় হে, রীতিমতো উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। আমার মনে হয় ওঝা দেখানো দরকার। ওই কাফেরাণীর নজর থেকে সুলতানকে রক্ষা করতে না পারলে বাঙলায় বসে মাছ, দুধ, কুঁকড়ো খাওয়া তোমাদের ঘুচে যাবে। বলবন সোজা লোক নন, সে তো আমীর খানের নজির থেকেই বুঝতে পারছ। ইয়ার আত্মীয় কেউ সর্ নিয়ে পালাতে পারবে না, যদি না সুলতানের সর্ রক্ষা করা যায়।"

আরেকজন বলেন—"বুঝলাম, ওঝা দেখানো উচিত, কিন্তু বাঘের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? যত নষ্টের গোড়া ঐ বে-আককল গস্তিদার! প্রথমেই কাঁটার কবরে বাঁদী বেটীকে পুঁততে পারলে ব্যাপারটা মিটে যেত। কিন্তু ও-ব্যাটা সব ভেস্তে দিলে! এখন যেমন করেই হোক শিশমহলওয়ালীর বাসা ভাগীরথীর স্রোতে নিয়ে ফেলতেই হবে। একটা পন্থাও ক'দিন হলো আমার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু…"

হঠাৎ হোঁশদারের কণ্ঠস্বরে হাতের ছিপ ফেলে হাস্যমুখে উঠে দাঁড়ান ইয়ারবর্গ! শুষ্কমুখে তন্দ্রোল ধীর পায়ে পদ্মকোরক সজ্জিত কড়ির খাস ঝুলায় এসে বসেন।

কুর্নিশ করে এগিয়ে এসে সুলতানের হাতে সোনার ছিপ তুলে দিতে যান

মালেক ইয়াকুব। ছিপটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ঝুলার পাশে গুঁজে রেখে মৃদু হেসে তঘ্রোল বলেন—"আজ আমার সময় অল্প, দোস্ত। আজ আর ছিপ নয়।"

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে চোখ টেপেন ইয়ারবর্গ—ব্যাপার ক্রমেই জটিলতর মনে হচ্ছে!

দ্বিতীয়বার কুর্নিশ করে ইয়াকুব বলেন—"জাহাঁপনা, পদ্মপত্রের বুক ছিঁড়ে বড়শি জলে ফেলুন—ভাগ্যবানের ছিপে শিকার উঠতে বিলম্ব হবে না।"

চোখ বুজে মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে তঘ্রোল বলেন—"না দোস্ত, বহু পদ্মপত্রের বুক বিদীর্ণ করেছি—শিকারও কম গাঁথিনি। কিন্তু আজ আর শিকারে আনন্দ জাগে না।"

বিস্মিত উদ্বেগভরামুখে অভ্যাস মতো বয়স্য বলেন—"ঠিক, ঠিক বলেছেন, জাহাঁপনা ধন্য। জগতে জাহাঁপনার মতো দৌলত রয়েছে বলেই খোদার সৃষ্টি সার্থক!"

ইয়াকুব একাই সব কথা বলছে দেখে দ্বিতীয় ইয়ার তাকে সরিয়ে দিয়ে বলে—"আহা, জাহাঁপনার দয়ার শরীর। কমলের আঘাতও তাঁর হৃদয় বিদ্ধ করে। কিন্তু দ্বারে এক নবীন গায়ক সুলতানকে খোস করবার আশায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে। এখন সুলতানের হুকুম হলে কিছু সঙ্গীত শোনা যায়!"

কড়ির ঝুলায় নড়ে বসেন তঘ্রোল। বলেন—"হাঁ, সেই ভালো। সন্ধ্যার বিষণ্ণ রোশনিতে বুকের রঙে মিলে যেতে পারে তেমনি কিছু সঙ্গীত বরং শোনা যাক।"

ইয়াকুবের ইশারায় হামেহাল-হাজিরা হাঁক দেয়—"ওস্তাদ মহম্মদ ইশাক!"

সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ দিতে দিতে সারেঙ্গী হাতে প্রবেশ করেন এক নবীন গায়ক। তরুণ গায়কের কমনীয় শ্মশ্রু ও আয়তচোখের 'পরে ক্ষণেক চেয়ে তঘ্রোল জিজ্ঞাসা করেন—"ইতিপূর্বে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ কতদিন পূর্বে ঘটেছিল?"

তঘ্রোল-এর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কেঁপে ওঠে গায়কের বুক। তবু সংযত কণ্ঠেই জবাব দেন—"জাহাঁপনার পবিত্র শরীর সন্দর্শনের সৌভাগ্য এ বিদেশীর ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। এ মগধবাসীর গৌড়ে আগমন এই প্রথম।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বার বার গায়কের আপাদমস্তক দেখে গম্ভীরকণ্ঠে তঘ্রোল বলেন—"নতুন এসেছো? কিন্তু মনে হয় ইতিপূর্বে তোমায় যেন দেখেছি? কণ্ঠস্বরও যেন পরিচিত!"

—"জাহাঁপনার পবিত্র দৃষ্টির গতি সর্বত্র সমান। কিন্তু এ মুশাফিরের এ-পথে এই প্রথম আগমন।"

চিন্তিতমুখে তভ্রোল জিজ্ঞাসা করেন—"স্বদেশ পরিত্যাগের উদ্দেশ্য ?"

—"দরিদ্রের জঠরের সংস্থানই হলো প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গৌড়ের রূপ পরিদর্শন। হরিৎ গৌড়ের বর্ষার রূপ দেখে সঙ্গীতে ভাষা দেবার জন্য বাল্যকাল থেকেই মন উতলা হয়ে ছিল, তাকে চোখের দীপে বরণ করবার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল। গৌড়ের রূপ যেন যৌবন উন্মেষে প্রথম প্রেমের স্বপ্ন-দর্শনের মতো! এ রূপের স্পর্শে হৃদয়-সঙ্গীতের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। সুরে ছন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর জ্যোৎস্নালোক-প্লাবিত নদীতরঙ্গের অস্ফুট প্রেম-গুঞ্জনে তট চুম্বন, লাস্যময়ী রমণী-নয়নের তরঙ্গায়িত কটাক্ষের চেয়েও মধুর অনির্বচনীয় প্রীতিপ্রদ!"

অবাক দৃষ্টি মেলে আগন্তুককে লক্ষ্য করে ইয়ারের দল! নিষ্ঠুর সুলতানের উদ্ধতদৃষ্টি ভাবের আবেগে সুদূর প্রসারিত হয়ে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! সেই বিষাদ-গাম্ভীর্য কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে রাখে তরল আনন্দ-মুখর আরামবাগ। তারপর নিজেকে সংযত করে তভ্রোল প্রশ্ন করেন—"মগধবাসী, তুমি কি স্ব-ইচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, জাহাঁপনা।"

—"এমন ইচ্ছার কারণ?"

—"দারিদ্র্যই আদি-কারণ। এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে নেমেই উপলব্ধি করলাম—হিন্দুজাতি মূলধর্ম হারিয়ে ফেলেছে। ধর্মের নামে যাকে আঁকড়ে ধরেছে, তা শুধু কীটদষ্ট তুষ। একের সঙ্গে অপরের বন্ধন সৃষ্টি আর ভেদাভেদ নাশই তো প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু সেই পরম-বীজই অজ্ঞান কীটরা খেয়ে ফেলেছে। অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্মের আচরণে আঁকড়ে ধরে আজ মানুষ পরস্পরকে অন্তর থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। মনে মনে উপলব্ধি করলাম—আত্মজনের প্রীতি শ্রদ্ধা হারিয়ে, কেবলমাত্র জন্ম পরিচয়ের আর সংস্কারের মোহে স্বজাতির মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখার কোন অর্থ হয় না। তাই ধর্মান্তরে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছি জাহাঁপনা।"

—"সাবাস! তোফা! তোফা!" সমস্বরে বলে ওঠেন ইয়ারবর্গ।

চোখ বুজে ক্ষণেক চিন্তা করে তভ্রোল আবার জিজ্ঞাসা করেন—"মগধ ত্যাগ করেছো কতদিন?"

—"তা প্রায় তিন পক্ষকাল।"

—"তিন পক্ষকাল!" সন্দিগ্ধকণ্ঠে তভ্রোল উচ্চারণ করেন। তারপর বলেন—"আচ্ছা, নতুন কথা কি জানো শোনাও।"

সারেঙ্গী নিয়ে একপাশে বসে সুর বাঁধতে বাঁধতে বলেন গায়ক—"নতুন কথা তো জানিনে জাহাঁপনা। জগতের সুর আর সঙ্গীত চিরন্তন। সেই একই সঙ্গীত জগতে আবহমানকাল চলেছে। শুধু সুরকারের আবেগের তারতম্যে তাতে ভিন্ন ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়! কিন্তু সর্বত্রই সেই না-পাওয়ার

বেদনা—বিরহের সন্তাপ। তাই অরণ্য পর্বত থেকে নদী বালুকণা পর্যন্ত সর্বকালে সর্বত্রই শুধু মিলনে আকুল আর বিরহে ব্যাকুল সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছে!"

গায়ক বাঁধা সারেঙ্গীতে একটি ঝঙ্কার টেনে মৃদু-হেসে আকাশে চোখ রেখে আবার বলেন—"কিন্তু স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ কীর্তি মানুষও তার চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অবিরত সেই সম্পূর্ণতাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে যা মিলনে সার্থক আর বিরহে ব্যর্থ। সেইজন্যই প্রকৃতির রাজ্যে অন্বেষণের বিরাম নেই। যুগযুগান্ত ধরে আবহমানকাল একে অন্যকে খুঁজে ফিরছে। কবির কলমে তারই স্বাক্ষর, গায়কের সুরে তারই প্রতিধ্বনি আর ভাস্করের হাতে তারই রূপরেখা এবং চিত্রকরের তুলিতে তারই প্রতিচ্ছবি।"

সারেঙ্গীর সুরে সুর মিলিয়ে গান শুরু করলেন গায়ক।

"সাবানে হীর্ জান্ দরাজ চুন্
জুলফ্ ভা ওরা রোজে ভাস্লাৎ
চু উমর কোটা
সাখী পিয়াকো জো ম্যাঁয়
না দেখো তো কৈয়সে
কাটাউঁ আঁধেরি রাতিয়া।"

—"সাবাস! ওয়া! ওয়া! ওয়া!..."—বলে ওঠেন ইয়ারদল।

সংযতকণ্ঠে তব্রোল বলেন—"তোমার কণ্ঠের ভাঁজ এখনও দোরস্ত হয়নি ওস্তাদ, তবে তোমার প্রাণে দরদ আছে। এ-শের তুমি পেলে কোথায়?"

—"দিল্লীর এক নবীন কবি—আমীর খসরু—এসেছিলেন মগধ পর্যটনে। এ-সঙ্গীত তাঁরই অনুগ্রহে পেয়েছিলাম।"

—"তিনি এখন কোথায়?"

—"দিল্লীতেই ফিরে গিয়েছেন! তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে দিল্লীশ্বর তাঁকে আপন সভায় স্থান দিয়েছেন আর খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া তাঁকে শিষ্যত্বের সম্মান দিয়েছেন।"

—"হুঁ! এ কবি-প্রতিভা দিল্লীর রুক্ষভূমিতে ফোটবার নয়। একে বাঙলার রসাল ভূমিতে এনে আমি রোপণ করতে চাই ওস্তাদ।"

—"দিল্লী-আগত জাসুস্!" সুলতানের নিকটস্থ হয়ে মৃদুকণ্ঠে দৌবারিক ঘোষণা করে।

ঝুলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান তব্রোল। সিরাজী-বরদারের প্রতি চেয়ে আদেশ করেন—"আকণ্ঠ সিরাজীতে পূর্ণ করে দিও আমার পিয়ারা দোস্তদের! খুশ করে দিও এই নবীন ওস্তাদকে।"

তারপর গায়কের প্রতি ফিরে বলেন—"তোমার কণ্ঠের সুর উজাড় করে

দাও সমঝদার আমীরদের কানে। আর রাত্রে সুলতানের শয়নকক্ষে তোমার প্রাণের সঙ্গীতে যেন সুলতানের কর্তব্যের শ্রান্তি হরণ করে নিদ্রার শান্তি এনে দেয়।" বলেই ধীর-গম্ভীর পায়ে চলতে চলতে অনুচ্চকণ্ঠে দৌবারিককে ডেকে বলেন—"জাসুস্‌কে আমার বিশ্রামকক্ষে সাক্ষাৎ করতে আদেশ কর।"

মন্ত্রণাগারে বসে জিজ্ঞাসা করেন তঘ্রোল—"সৈন্য সংগ্রহ কতদূর অগ্রসর হলো?"

কুণ্ঠিতমুখে অস্ফুট ভাষায় সালারে-ফৌজ জবাব দেন—"কৈ আর তেমন হচ্ছে জাহাঁপনা? হিন্দু সৈন্যরা দিল্লীশ্বরের সাক্ষাতে অস্ত্র ধরতে আর সাহসী নয় বলেই যেন মনে হয়। আর অবাধ্য সৈন্য বশীভূত করবার মতো অর্থবলও তহবিলে তেমন…"

কথা অসমাপ্ত রেখেই তহশীলনবীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন সালারে-ফৌজ।

ভীত অবনতমুখে তহশীলনবীশ বলেন—"দু' দু'বার দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লুণ্ঠিত ধন কিছুই পাওয়া যায়নি। বরং উৎকোচ ইত্যাদিতে বহু ব্যয় হয়েছে। তার উপর গত দুর্ভিক্ষে খাজাঞ্চিরাও বকেয়া খাজানা একেবারেই আদায় করতে পারেনি।"

—"হুঁ", বলেই উজিরে আজমের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তঘ্রোল জিজ্ঞাসা করেন—"কালকের সংবাদ শুনেছেন কি? সে-বিষয়ে কিছু চিন্তা করেছেন? গোধভূমি ছেড়ে ভাগীরথীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন বলবন। আর বিশ ক্রোশ পথ চলে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হয়েই বঙ্গে পদার্পণ করবেন।"

—"হ্যাঁ জাহাঁপনা, কাল রাত্রেই সে-সংবাদ জাহাঁপনা প্রেরিত জাসুস্ মুখে শুনেছি এবং সেই চিন্তাতেই সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়েছি। কিন্তু এক উপায় ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

—"সুলতানের মঙ্গল কামনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে কী পরম উপায় আবিষ্কার করলেন?" তঘ্রোল-এর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন শ্লেষমিশ্রিত প্রশ্ন।

সুলতানের শ্লেষোক্তির উত্তাপটুকু অনুভব করে উজীরে-আজম কুণ্ঠার সঙ্গে উত্তর দেন—"জাহাঁপনাও শিকার-উদ্দেশ্য প্রচার করে রাজধানী ত্যাগ করুন। গোপনে জাজনগর অভিমুখে যাত্রা করুন।"

—"পলায়ন করবো?" হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তঘ্রোল।—"দেখছি বলবন-এর উজীরে-আজমের বুদ্ধিই তঘ্রোল-এর উজীরে-আজমের মস্তিষ্কে ক্রিয়া করছে! বলবন কাপুরুষের মতো শিকারের নাম করে তঘ্রোল সিংহকে ধরবার জন্য জাল পেতেছেন। তঘ্রোলকেও আত্মরক্ষার জন্য সেই পথ বেছে নিতে হবে! এ আপনি কী বলছেন?"

আরও সঙ্কুচিত হয়ে উজীরে-আজম বলেন—"তা ছাড়া আর উপায় কি জাহাঁপনা? রাজ্যরক্ষায় কখনো বল, কখনো ছলের আশ্রয় গ্রহণ করাই

বিধি। বলবন-এর মতো প্রতাপশালী, অহঙ্কারী স্থলতানও যখন জাহাঁপনার প্রতাপ রোধে অসমর্থ হয়ে ছলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন তখন জাহাঁপনার পক্ষেও এ অবস্থায় ছলের আশ্রয় নিলে স্থফলই দেখা দিতে পারে। মুঘল-শত্রু পিছনে ফেলে আর দিল্লীর সিংহাসন অযোগ্য পুত্রের অধীনে রেখে বঙ্গে অধিকদিন অবস্থান করা বলবন-এর পক্ষে সম্ভব হবে না। জাহাঁপনা কিছুদিন সাবধানে অজ্ঞাতবাস করতে পারলে, আপনার সন্ধান না পেয়ে বলবন অবশ্যই দিল্লী ফিরে যাবেন। তখন বিনা আয়াসে জাহাঁপনা আবার স্বরাজ্যে এসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। বৃদ্ধ বলবন একবার দিল্লী ফিরে গেলে, তাঁর পক্ষে আবার স্থদূর বাঙলার দুর্গম পথ অতিক্রম করা স্থদূর পরাহত হবে। বলবন-এর মৃত্যুর পর তাঁর তিনপুত্র দিল্লীর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে এবং মুঘল-সৈন্য প্রতিহত করতেই ব্যস্ত থাকবেন, বাঙলার প্রতি মনোযোগ দেবার আর অবসর পাবেন না।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে তঘ্রোল জিজ্ঞাসা করেন—"কিন্তু পলায়নের পক্ষে তেমন নিরাপদ স্থান ?"

—"জাজনগরের ঘন অরণ্যই আপনাকে সেই নিরাপত্তা দেবে জাহাঁপনা।"

—"কিন্তু জাজনগর অরণ্য পর্যন্ত পৌছবার সময়ই বা কোথায় ? ভাগীরথী উত্তীর্ণ হলেই তো বঙ্গে পদার্পণ করবেন বলবন !"

—"এই ঘন বর্ষায় খরস্রোতা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হওয়া বিদেশীর পক্ষে সহজ নয় জাহাঁপনা !"

—"কিন্তু পরদেশী বলবন-এর সঙ্গে আছে ঘরের শত্রু বিভীষণ—কুলিশ। দুই লক্ষ পরদেশীকে পথ দেখাবার পক্ষে সে বিশ্বাসঘাতক একাই যথেষ্ট !"

—"যদিও সংবাদ পাওয়া গিয়েছে বলবন-এর বহু নৌকো যমুনা ও সরযূ উত্তীর্ণ হয়ে ভাগীরথীর বুকে পড়েছে তবু আমাদের সমস্ত নৌকোই অপসারণ করে নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশী নৌকো বাঙলার ভাঁটির টানে পথ ঠিক রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।"

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কিছুক্ষণ মৌন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতকণ্ঠে তঘ্রোল বলেন—"কিন্তু···না, ব্যাঘ্র মুঘীষ-এর পক্ষে শৃগালের মতো কৌশল আশ্রয় করে পলায়ন অসম্ভব !"

—"কিন্তু ভেবে দেখুন জাহাঁপনা, দুই লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে অকিঞ্চিৎ সৈন্য ও অর্থবল নিয়ে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র !"

—"বিশেষত সৈন্যরা এ যুদ্ধে যখন মোটেই উৎসাহী নয়।" কুণ্ঠিতমুখে সালারে-ফৌজ বলে ফেলেন।

ক্রূর বক্রহাসি ফুটে ওঠে তঘ্রোল-এর ঠোঁটে। ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলেন—"সেনাপতিদের সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা হলো সৈন্যবাহিনীর বল।

তত্রোল-এর সৈন্যবাহিনী যদি আজ ভীত হয়ে থাকে তো সে চালকদেরই দোষ নয় কি ?

অধোমুখে সভাসদরা নিরুত্তর বসে থাকেন। ব্যঙ্গটুকু ঠোঁটে রেখে কর্কশকণ্ঠে তত্রোল আবার বলেন—"কিন্তু একদিন আপনারাই বলবনকে বলহীন মনে করে এই তত্রোলকে স্নেহময় প্রভুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন। দুই লক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্য বল আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে, সেদিন সে-কথা কি চিন্তা করেননি ?"

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন মন্ত্রণা-কুশলী উজীরের দল। দৃষ্টির আদান-প্রদানে হয়তো বা দুর্ধর্ষ তত্রোল-এর নিরুপায় কণ্ঠের কম্পন উপভোগ করলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার সকলের আনত-গম্ভীরমুখ নিরীক্ষণ করে মন্ত্রণাগৃহ পরিত্যাগ করেন তত্রোল!

বড় খাসমহল-এর মজলিসি-কক্ষে বাঁদী পরিবেষ্টিত হয়ে ফুলদার গালিচায় বসে পাশা খেলছিলের সুলতানা। সেই দিনের পর আর বড় খাসমহল-এ পা বাড়ায়নি রোশেনা। অতি সঙ্কুচিত মনে দ্বিধাজড়িত পায়ে সে নিঃশব্দে এসে সুলতানার পেছনে দাঁড়ায়। বাঁদীরা কৌতূহলী চোখ মেলে একবার চেয়েই উপেক্ষায় ফিরিয়ে এনে খেলায় মন দেয়। সিরাজী-বরদারণীর হাত থেকে সুরাপাত্র তুলে নিয়ে মুহূর্তে নিঃশেষ করেন সুলতানা। তারপর পান-বরদারণীর এগিয়ে-ধরা সোনার পানদান থেকে একটি পানের খিলি নিয়ে পাশায় দান ফেলেন।

—"ক'চ্চে বার ?"

—"সাবাস! জবর ইলম!" উল্লাসে সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে বাঁদীর দল।

পানের খিলিটি মুখে পুরে এক টিপ জর্দা তুলে নিয়ে উল্লসিত সুলতানা উচ্চ-কণ্ঠে বলেন—"চালাও ঘুঁটি বাদশা-মহল!"

সুলতানার সাহায্যকারিণী বাঁদী ঘুঁটি চালিয়ে নিয়ে চলে ছকের পাকা ঘরে। হঠাৎ হস্তীদন্তের সূক্ষ্ম পাটির রঙীন ছক উল্টে দিয়ে স্বর্ণখচিত-হস্তীদন্তের ঘুঁটি ছড়িয়ে উঠে পড়েন সুলতানা। বলেন—"যা আর খেলবো না। পাশার ছকে ঘুঁটি পাকাতে গিয়ে মনের ছকের ঘুঁটি সব কেঁচে গেল! সব চাল ভুল!"

বিবর্ণমুখে ছক গুটিয়ে তোলে বাঁদীরা। সুলতানার উল্লাসে উল্লসিত, বিরসতায় বিরস হওয়াই বাঁদীদের নিয়ম।

চলতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই রোশেনার চোখে চোখ পড়ে। সুলতানা ক্ষণেক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন। তারপরই হেসে ফেলে বলেন—"বাঃ, বেহস্তের হুরী যে পথের ধুলোয় গড়াচ্ছে! তা···।" কথা শেষ না করেই শেরতক্তে গিয়ে বসে রোশেনার আরক্ত সলজ্জ মুখ লক্ষ্য করে সুলতানা আবার জিজ্ঞাসা করেন—"বেশ! কিন্তু কি মনে করে ?"

চোখের জল অতিকষ্টে সংযত করে আনতমুখে এগিয়ে এসে সুলতানার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ে রোশেনা। বলে—"ভুল চাল কি আর শোধরানো যায় না সুলতানা?"

ছলছলিয়ে হেসে ওঠেন সুলতানা—"ভুল! কার চালে ভুল! না, ভুল মোটেই নয়। চাল ভুল হলে সুলতানের পেয়ারী রূপসীর এরূপ হবে কেন? না, ভুল একেবারেই না। সব ঠিক ঠিক মিলছে—যেমনটি চেয়েছি।" আবার উচ্চহাসি হেসে শেরপোষে গা এলিয়ে দেন সুলতানা।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে উঠে বসে শুষ্ককণ্ঠে রোশেনাকে সম্বোধন করে বলেন —"যাও, নিজ মহল-এ ফিরে যাও। শূন্য মহল-এর হাওয়ার সঙ্গে আক্ষেপে দিল্ মিলিয়ে কেঁদে মর। আর জেনে রেখো, সুলতানার পরওয়ানা ভিন্ন বড় খাসমহল-এ পা দেওয়ায় কসুর হয়। সুলতানার পঁয়জরে কসুর হলে তার শাস্তিও আছে।"

তবু বসে থাকে মুহ্যমান রোশেনা।

রোশেনার নিশ্চল অবস্থা সুলতানা আজিনাকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। চিৎকার করে বলে—"এখনও বসে রইলে যে! যাও, এক্ষুণি মহল ত্যাগ করো। এমন বেশে বড় খাসমহল-এ পা দেওয়ার স্পর্ধা আর করো না।"

অপমানে অনুভূতিও বুঝি হারিয়ে গিয়েছে রোশেনার। বহু চেষ্টায় বিবশ-দেহ টেনে তুলে ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়। কানের কাছে মরুভূমির উত্তপ্ত ঘূর্ণির মতো ছুঁয়ে যায় সুলতানার নিষ্ঠুর উন্মত্ত হাসির রেশ!

হাসতে হাসতে সুলতানার দুই চোখের কোণ বেয়ে জল ঝরে পড়ে। বাঁদী ছুটে এসে রেশমী রুমাল দিয়ে সযত্নে তা মুছিয়ে দেয়।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের আকাশের চাঁদের মতোই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে সুলতানের বিশ্রামকক্ষের বেলোয়ারি-ঝাড়ের দীপ। স্তিমিত হয়ে এসেছে প্রাসাদের কল-গুঞ্জন। বীণ থামিয়ে কুর্নিশ করেন নবীন গায়ক।

প্রশস্ত সুউচ্চ খিলানদার উন্মুক্ত গবাক্ষের নির্মল বাতাস সন্তর্পণে বুকে তুলে নিয়ে যায় করুণ সুরের শেষ রেশটুকু। বহুক্ষণ চোখ বুজে স্তব্ধ থেকে শেরপোষে অর্ধশায়িত তব্রোল ভাব-গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলেন—"ওস্তাদ! তুমিই প্রকৃত প্রেমিক! প্রকৃত প্রেমের স্পর্শে হৃদয় শিহরিত না হলে বিরহের সুরে এমন করে শিহরণ, প্রাণের স্পন্দন ও মূর্ছনা জাগানো সম্ভব নয়!"

দ্বিতীয়বার কুর্নিশ করে নিশ্বাস ফেলে উদাসকণ্ঠে গায়ক উত্তর দেন—"জাহাঁপনার অনুগ্রহে এ বান্দার কণ্ঠ আজ ধন্য হলো।"

নিস্তব্ধতায় কিছুক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ উঠে বসে একান্ত মমতাভরা কণ্ঠে তব্রোল বলেন—"তোমার বিরহিণীকে আমি তোমার বুকে এনে দেবো ওস্তাদ! বল, আমাকে নিঃসঙ্কোচে বল, কোথায় হারিয়েছে তোমার প্রাণের

রক্ত-কমল !” সহানুভূতিতে তব্রোল-এর চোখ সজল হয়ে আসে। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে স্তিমিত তারার দিকে সজল আয়তচোখ মেলে চেয়ে বসে থাকেন ধ্যানমগ্ন গায়ক। আরো একটু এগিয়ে এসে ঈষৎ ঝুঁকে গায়কের একখানি হাত তুলে নিয়ে ব্যথাতুর সুলতান জিজ্ঞাসা করেন—“বল ওস্তাদ, কোথায় কেমন করে ও কোন বুদ্ধির ভুলে তোমার প্রিয়াকে হারালে?” দুর্ধর্ষ তব্রোল-এর কণ্ঠে শিশুর ব্যাকুলতা।

—“বলবো বৈ কি জাহাঁপনা! আপনার চরণে আবেদন জানাতেই তো এসেছি, কিন্তু আজ থাক।” যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে ধ্যানী-গায়কের কণ্ঠস্বর।

—“না, না ওস্তাদ, তোমার সে-ব্যথার ইতিকথা আমি আজই এই মুহূর্তেই শুনতে চাই। আমার মন বড় ব্যাকুল! আমার বুকের ছবির সঙ্গে তোমার বুকের ছবি মিলিয়ে দেখবো! বল ওস্তাদ, সমব্যথীর কাছে দুঃখ বলার মতো সান্ত্বনা আর নেই।” সুলতানের কণ্ঠে যেন ভিক্ষুকের আবেদন!

অস্ফুটকণ্ঠে গায়ক জবাব দেন—“বলবো জাহাঁপনা, কিন্তু তা বলার ক্ষণ এখনও উপস্থিত হয়নি।”

স্বীয় মনের উত্তেজনায় বুঝি গায়কের কথা আর কানে যায় না তব্রোল-এর। তাঁর হাতখানি ধরে তব্রোল উঠে দাঁড়ান। বলেন—“তোমার প্রেয়সীকে তুমি হয়তো আবার খুঁজে পাবে ওস্তাদ, কিন্তু আমার সে-আশা···। এস ওস্তাদ, আমার প্রেয়সীর মন্দিরে এসে তোমার বিরহাকুল কণ্ঠের একটি করুণ সঙ্গীতে আমার বুকের ব্যথার প্রতিধ্বনি শুনিয়ে যাও। এ-হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন তোমার গানের মধ্যে প্রেয়সী শুনুক।”

উত্তেজিত তব্রোল বিস্মিত গায়কের হাত ধরে আপন শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থ-কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ান। বদ্ধ-কপাট উন্মুক্ত করে গায়কের হাত ধরে প্রবেশ করেন তব্রোল। অগুরু গুগ্‌গুল্‌ ধূমে আবৃত কক্ষে একাধিক নীলাভ স্তিমিত শামাদানের আলোয় দেখতে পেলেন কাকে ঘিরে যেন কয়েকজন বসে আছে। ওষুধের পাত্র আশেপাশে ছড়ানো।

তব্রোল ইঙ্গিতে সকলকে সরে যেতে আদেশ করলেন।

সবাই অন্তর্হিত হলে গায়কের দৃষ্টি অদূরে শায়িত মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ হলো। প্রথম দর্শনে মনে হলো বুঝি এক স্বপ্ন-দৃষ্ট বিগ্রহ। কিন্তু লক্ষ্য স্থির হলে পর তার বুক কেঁপে উঠলো। উত্তেজনায় সমুদয় অঙ্গ শিথিল হয়ে এল। এ কি! তিনি কি দেখছেন! এর জন্যই তো মৃত্যুপণ করে প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। অসীম সাহস সঞ্চয় করে সুলতানের সম্মুখীন হয়েছেন। বহু কষ্টে মনের আবেগ সংযত করে দুরুদুরু বুকে অপলক চোখে স্থিরনয়না অবন্তীমালার মুখের ’পরে চেয়ে থাকেন গায়ক। এই কি সেই পদ্মবরণী চঞ্চলনয়নী পূর্ণ তরঙ্গিণী!

নিস্পন্দ গায়কের স্কন্ধ স্পর্শ করে রুদ্ধকণ্ঠে তভ্রোল বলেন—"এই কক্ষের বায়ুর হাহাকার তোমার আকুলকণ্ঠের বিরহ-সঙ্গীতে সিক্ত করে দাও ওস্তাদ।"

কিন্তু গায়কের কানে যেন সুলতানের করুণ আবেদন প্রবেশ করে না। অবন্তীমালার চোখে চোখ রেখে অস্ফুটকণ্ঠে আত্মবিস্মৃত গায়ক আবৃত্তি করেন—

"আশিক না সুদী তো গমে হিজরা না কাশিদী,
কস্ পেশে তো নাযমায়ে হিজরা চে গুর আয়েদ?

ব্যাকুলভাবে গায়কের শীতল হাত দু'খানি তুলে নিয়ে তভ্রোল বলেন—"বুঝবে, আমার প্রেয়সী তোমার গানের মর্ম বুঝবে ওস্তাদ। তার চোখে রয়েছে তোমারই মতো বেদনার প্রশান্তি লেখা!"

নিরুত্তর গায়কের চোখ তখনও অবন্তীমালার মুখের ওপর নিবদ্ধ। তাঁর স্কন্ধে ঈষৎ চাপ দিয়ে তভ্রোল আবার বলেন—"একটি সঙ্গীত শোনাও ওস্তাদ।"

আত্মসংবরণ করে ফিরে দাঁড়ান গায়ক। বলেন—"আজ আর সুর বাঁধা যাবে না জাহাঁপনা।"

—"কেন? তুমিও কি আমার প্রেয়সীর আঁখির তারায় ভুলে সুর হারালে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গায়ক উত্তর দেন—"জানিনে, হয়তো জাহাঁপনার প্রেমের প্রতিচ্ছবি দর্শনেই সব সুর হারিয়ে গেল!"

গায়কের শীতল হাতখানি ছেড়ে দিয়ে মুখে আত্মপ্রসাদের রেখা টেনে একটু হাসেন তভ্রোল।

তারপর ধীর অবিচলকণ্ঠে বলেন—"আমি যেমন করে পারি আমার প্রেয়সীকে সুস্থ করে তুলবোই। আমি রাজ্যের সমস্ত বৈদ্যকে সংবাদ দিয়েছি। এক লক্ষ আশরফি ইনাম দেব বলে কবুল করেছি। আর তা যদি না পারি তো এমন এক স্মৃতিসৌধ তৈরি করে দেব প্রেয়সীর নামে যা ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি আর এ জহান-এ। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ, মুযীষ-এর প্রেমের কাছে বিস্ময়ে মাথা নত করে দু'ফোটা আবেগাশ্রু ফেলে যাবে। রেখে যাবে বিস্মিত বেদনার নিশ্বাস। সুলতানের আবেগ-কম্পিত হাতখানি গায়কের স্কন্ধচ্যুত হয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে।

ধীর পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন গায়ক। বাইরে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে বলেন—"সময়ান্তরে তলব পেলে আবার আপনার সন্দর্শনে আসবো জাহাঁপনা।"

—"হ্যাঁ, তোমাকে সুলতানের দরবারে বহাল করে নেবো। সকাল-সন্ধ্যে তুমি প্রেয়সীর দরবারে সঙ্গীত শোনাবে।"

গায়ককে বিদায় দিয়ে এসে গবাক্ষের পাশে দাঁড়ালেন তভ্রোল।

বহু চিন্তা একের পর এক মনে উদিত হয়—রাত্রি ভোর হয়ে এল!

চলে গেল জীবনের আর একটিদিন। কে জানে জীবনের ভোরও হয়তো নিকটবর্তী! জানি না অবকাশ আর মিলবে কিনা? তব্রোল-এর বুকভরা এই প্রেমের কাহিনী বলবন-এর এক হিংস্র তরবারির আঘাতে হয়তো মিলিয়ে যাবে! কেউ জানবে না! বিড়ম্বিত-ভাগ্য তব্রোল-এর জন্য কেউ গড়বে না অমর সৌধ। তাঁর রক্তে-রাঙা প্রেম কাহিনীর জন্য কেউ রচনা করবে না এক পংক্তি কবিতা কিংবা সঙ্গীত! মানুষ শুধু জানবে অত্যাচারী তব্রোল-এর লুন্ঠন আর বলবন-এর অস্ত্র-ভয়ে ভীত পলায়ন কাহিনী!

সজলচোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ফিরে আসেন অবন্তীমালার কাছে। জ্বেলে দেন অগুরু পলিতা, আরো একটি কর্পূরের মালা পরিয়ে দেন অবন্তীমালার গলে। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—'আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে অমর করবো প্রেয়সী। রক্ষা কর, এ বিপদ থেকে তোমার শক্তি দিয়ে পূর্বের মতো আমাকে রক্ষা কর।' নতজানু হয়ে অঞ্জলি পাতেন তব্রোল।

কক্ষদ্বার দিয়ে মৃদু বাতাস এসে আন্দোলিত করে কণ্ঠের মালা। পুষ্প মুকুট থেকে চ্যুত হয়ে ঝড়ে পড়ে কয়েকটি পুষ্পদল। সাগ্রহে সে কয়টি তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো আনন্দে বুকে চেপে ধরে তব্রোল উল্লসিত কণ্ঠে বলেন—'দিয়েছো! দিয়েছো প্রেয়সী! এই পুষ্পদলই আমায় রক্ষা করবে!' আশ্বস্ত আনন্দোজ্জ্বল হৃদয়ে বিশ্রামকক্ষে আবার ফিরে আসেন তব্রোল।

দৌবারিক ঘোষণা করে—"জাসুস্!"

চমকে সম্বিত ফিরে আসে তব্রোল-এর। এক ঝটকা দমকা বাতাসে আলতো করে ধরে রাখা পুষ্পদল হস্তচ্যুত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে গুপ্তচর।

কুর্নিশ করে জানায়—"ভাগীরথীর অপর পারে এসে উপস্থিত হয়েছেন দিল্লীশ্বর। ভাগীরথীর খরস্রোতে ভিন্‌দেশী মাঝিরা নৌকো রাখতে পারছে না। বঙাল মাঝি সংগ্রহে হুকুম দিয়েছেন দিল্লীশ্বর। সৈন্যদের উৎপীড়নে গ্রামবাসীরা সব ভীত হয়ে পলায়ন করছে। নদী-তীরের সমস্ত গ্রাম অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে।"

ভীত সন্ত্রস্তকণ্ঠে তব্রোল উচ্চারণ করেন—"ভাগীরথী-তীরে এসে পৌছেছেন বলবন?"

অস্থির পদচারণে পিষ্ট হয়ে যায় অঞ্জলিচ্যুত বিস্মৃত পুষ্পদল।

—"হ্যাঁ, জাহাঁপনা।"

—"আর কোনো খবর আছে?"

—"পরবর্তী সংবাদ নিয়ে আসছেন অপর দূত।"

—"আচ্ছা, তুমি যাও।"

কুর্নিশ দিতে দিতে পিছু হটে বিদায় হয়ে যায় দূত। নির্জনকক্ষে অস্থির-ভাবে পদচারণ করতে থাকেন তব্রোল।

বহু রঙীন চিত্র তাঁর মানসপটে উদ্ভাসিত হতে থাকে—বিদ্রোহ, কৃতঘ্নতা, যুদ্ধ, জয়, পরাজয়, হত্যা, লুণ্ঠন, অপহরণ ইত্যাদি সব যেন একে একে তাঁর সম্মুখ দিয়ে দ্রুতগতিতে ছায়া-ছবির মতো চলতে থাকে। তারপর হঠাৎ অন্ধকার এসে যেন সব গ্রাস করে। তাঁর বল বীর্য, রাজপাট সব যেন অপহরণ করে নিলে, এখন তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত। কি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবেন! কি দিয়ে জয়লাভ করবেন! বলবন-এর নাম উচ্চারণে সভয়ে পিছিয়ে যায় সব! কেউ আর উৎসাহী নয় যুদ্ধসাজে। যারা একদিন তব্রোল-এর চোখের ইশারায় প্রাণ কবুল করেছে, আজ তারা প্রাণভয়ে ভীত!

বলবন-এর অনুগ্রহলাভের আশায় তারা আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না তব্রোল-এর বাহুবলে! কে জানে, বলবন-এর পুরাতন সৈন্যদলই এখন পুরাতন প্রভুর সম্মুখীন হয়ে অস্ত্র ধরতে সাহসী হবে কিনা! অধীর অবসন্ন-দেহে বসে পড়েন তব্রোল।

বলবন-এর নিষ্ঠুরতা তাঁর করুণার মতোই মাত্রাবিহীন! তুরস্ক অধিকারের পর দিল্লীর সিংহাসনে একনাগাড়ে বিশ বৎসর আর কেউ বসতে পারেনি! পিছনে মুঘল, সম্মুখে হিন্দু—দুই হাতে দুই অজেয় শত্রু প্রতিহত করে আজও দোর্দণ্ড প্রতাপে বসে আছেন দিল্লীর সিংহাসনে! বলবন যেমন বিরাট, তেমন মহান! তব্রোল কি করে তাঁর সঙ্গে এটে উঠবেন? না, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার লোভে, অর্থগৃধ্নুতায়, বিলাসীতার প্রলোভনে তুমি উন্মাদ হয়েছো তব্রোল! কিন্তু বলবনকে ডেকে এনে তো আর পিছু হটা যায় না। সম্রাটের অভ্যর্থনা অস্ত্রের সংঘাতে জানাতেই হবে। হ্যাঁ, সমস্ত অপ্রস্তুতি আর বিরুদ্ধ সৈন্য নিয়েও বলবন-এর সৈন্যস্রোত প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যেতেই হবে। পলায়ন? না, তুরস্ক তব্রোল-এর পক্ষে শৃগালের বৃত্তি অসম্ভব! কিন্তু···একা কি করবে সে? ঠিকই বলেছেন উজীর—অকিঞ্চিৎ বল নিয়ে অপরিমিত বলের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া—আত্মহত্যারই নামান্তর। কিন্তু···উপায় কি? পালাবে? শেষে কি তুরস্ক তব্রোল পালাবে! প্রাণের জন্য মান দেবে! কিন্তু···রাজ্য রক্ষা হলে আবার হয়তো মান ফিরে পাবে···তখন মানুষ সুলতানের প্রাণভয়ে পলায়নের কথা ভুলে যাবে। তব্রোলও অপমানের জ্বালা ভুলে যাবে—কিন্তু প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ পাবে না? কত কল্পনা, প্রস্তুতি· সব ভেসে যাবে! হ্যাঁ, রাজ্যরক্ষায় ছল ও কৌশল বলের চেয়েও বেশি প্রয়োজন।

আবার কিছুক্ষণ নতমুখে পদচারণ করে এসে গবাক্ষের পাশে দাঁড়ান।

এই সুন্দর পৃথিবী! অপরিমিত সম্মান খ্যাতি সবই একদিন মুছে যাবে। ···কিন্তু তাই বলে রাজ্য ও যশের লোভে বৃদ্ধ বলবন-এর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত! তাও যে অসম্ভব। তার চেয়ে আত্মসম্মান, আত্মস্বার্থ লুটিয়ে দেওয়া হয়তো সহজ। তবে তাই হোক। রক্ষা কর প্রেয়সী। তোমার অলৌকিক শক্তি দিয়ে তব্রোল-এর অহঙ্কারকে পরাস্ত করেও তাকে রক্ষা কর। তোমার চশমা

হৃদয়ের ভালোবাসার স্রোতে ধুয়ে দাও তত্রোল-এর আত্মগরীমা। উঠে আবার গিয়ে প্রবেশ করেন অবন্তীমালার কক্ষে।

প্রাসাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমীতে হঠাৎ নতুন চাঞ্চল্যের সাড়া জেগেছিল। কীসের নির্মম আঘাতে আবার যেন সব স্তব্ধ বিষণ্ণতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো! ভালো লাগে না মামুদার। সুলতানার খেয়ালী মেজাজ প্রতিদিন যেন ক্ষিপ্ততর হয়ে উঠছে! নিকটে যেতেও ভয় হয়। কিন্তু বাঁদীকে যেতেই হয়, কর্ত্রীর খেয়াল মতো চলতেই হয়। তবু···যতটা পারে কর্ত্রীকে এড়িয়ে আজকাল সে বিভিন্ন মহল-এ ঘুরে বেড়ায়। নিজের গরজেই এতদিনের উপেক্ষিতা সুলতানাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করে।

সেদিন মামুদা ঘুরতে ঘুরতেই সুলতানা-জুবেদার মহল-এ এসে দাঁড়ায়। রূপসী জুবেদা সবে স্নান শেষ করে এসে প্রসাধনে ব্যস্ত। দুই পাশে দাঁড়িয়ে দুই বাঁদী পদ্মকোরক-গুচ্ছ দুলিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করছে। অপর বাঁদী চন্দনচূর্ণ নিয়ে পিঠ মেজে দিচ্ছে। জুবেদা খানদানী হিন্দু-ঘর থেকে এসেছেন, তাই চালচলন হিন্দুর মতো। মামুদাকে দেখে জুবেদা ভ্রূকুঞ্চিত করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করেন—"কে?"

—"বাঁদী, বড়-সুলতানার পার্শ্বচরী মামুদা।"

—"বস। কী প্রয়োজন?"

খুশি হয়ে জুবেদার কাছ ঘেঁষে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে মামুদা।

—"প্রয়োজন আর কি? প্রাসাদে তো প্রাণ নেই, তাই যাদের কাছে প্রাণের সন্ধান পাই তাদের কাছে একটু ঘোরা-ফেরা করি।"

—"বেশ তো, বস। এখনই মন্দির-সেবিকা ভজন গাইতে আসবে। শুনো, আনন্দ পাবে।"

—"মনে গীত না থাকলে কি আর তা শুনে আনন্দ হয় সুলতানা?"

মুখ টিপে হাসেন জুবেদা—"কেন? তোমার মনের গীত হারালো কেন?"

—"আমরা বাঁদী, আমাদের আর মন বলতে কি আছে? তোমাদের মনই আমাদের মন। তোমরা নৃত্য-গীতে আনন্দে থাকলে প্রাসাদের বাতাস গরম থাকে। তখন আমাদের প্রাণও সেই বাতাসের উষ্ণতা লাগে।"

—"নৃত্য-গীত তো অন্দরে হামেহাল চলেছে।"

—"তা বটে, তবে তাতে যেন প্রাণ নেই?"

—"প্রাসাদের নৃত্য-গীতে আবার প্রাণ থাকে কবে? হেরেমবাসিনীর প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু?" বলে কাংসদর্পণ সামনে ধরে কপালের চুয়াকুমকুম তিলক নিপুণভাবে আরো একটু ঊর্ধ্বে তুলে আঁকেন জুবেদা।

—"কিন্তু তবু···মনে হয় কোনো অশুভ নজরে যেন আরও হিমশীতল হয়ে এসেছে অন্দরের বাতাস।"

মুখ টিপে হাসেন জুবেদা—"উপায় নেই। সুলতানের খেয়াল!"

—"উপায় করলেই উপায় হয় সুলতানা। তোমরাই যদি বল উপায় নেই তবে উপায় করবে কে? এক সুলতানার এন্তেকাল সমুপস্থিত বলে সুলতান অন্দর ছেড়ে বিরাগী হয়েছেন, এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে?"

—"তোমার বড়-সুলতানার এত মগজ, সুলতানকে এক আঁচলে বাঁধবার এত তিয়াষ! তিনিই যখন কিছু করতে পারছেন না, তখন কে আর কি করবে বল?"

—"সুলতানার যদি সেদিকে আজকাল খেয়াল থাকতো তবে কি আর ভাবনা ছিল? কবেই সব সুরাহা হয়ে যেত।"

জুবেদার পিঠ ঘষা শেষ করে বাহুতে চুয়াচন্দনের আলপনা তিলক আঁকতে বসে বাঁদী।

—"সুলতানার খেয়াল নেই কেন?"

—"কি জানি? আমরা বাঁদী, তোমাদের সব খেয়ালের হদিশ কি আমাদের মগজে আসে? তবে ওদিকে যে মতলব নেই এইটেই শুধু বুঝছি। তাছাড়া সুলতানার দেহেও তো সুখ নাই আজকাল।"

—"দেহে, না মনে?"

—"ঐ যাই বল। তোমাদের মনে অসুখ হলে দেহও খারাপ হয়ে পড়ে।"

—"দেহে অসুখ কিনা জানিনে—তবে মনে যে সুখ নেই তা খুবই সুস্পষ্ট।"

—"তবু সুলতানা হয়তো কিছুটা খুশিতেই আছেন মনে মনে। ভাবছেন আজ আর তিনি একলা বঞ্চিতার নিশ্বাসে উত্তপ্ত নন, দল ভারী হয়েছে।"

—"কি জানি!"

—"হ্যাঁ তাই। শুধু তোমার সুলতানা কেন? মহল-এর সব সুলতানাই খুশি। সবাই একে অন্যের মহল-এর দিকে চেয়ে কালো নিশ্বাস ফেলা ত্যাগ করেছে।"

—"তাই তো ভাবছি সুলতানা—এতগুলি জানের ভালোবাসা সুলতান ভুলে আছেন কি করে!"

আবার মুখ টিপে একটু হাসেন জুবেদা। বলেন—"ভালোবাসা! এ ভালোবাসা নয়, এ হলো অধিকারের আকাঙ্ক্ষা। উপেক্ষার অসম্মান থেকে নারীর ভঙ্গুর অহঙ্কার রক্ষার আকুলতা! সুলতানের হেরেমের বদ্ধ বাতাসে ভালোবাসার পবিত্র নিশ্বাস প্রবেশ করলেও বাস করতে পারে না। তাই তো খুশি হয়েছে সবাই। আজ আর কারো অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ হয় না। কেবল রোশেনাই ঘুরছে পাগলের মতো আঁর দেখছি—ঘুরছে হামিদা।"

—"হামিদা!"

—"হু।"

—"বাঁদীও এত বড় বেসামাল, বেচাল !"

—"মন কি অধিকারের হিসেব দিয়ে বাঁধা যায় মামুদা ? রাতে শুয়ে ভেবে দেখলে দেখবে, তোমার স্পর্ধাও কম নয়।"

কানে হাত দিয়ে জিব বের করে মামুদা।—"এমন কল্‌জে এ বাঁদী রাখে না সুলতানা, যে কল্‌জে সুলতানাদের পঁয়জর ছেড়ে তক্‌ত্‌-এ নজর দেয়।"

প্রসাধন শেষ হয়েছে জুবেদার, চুলের সিঁথিতে মণিখচিত সোনার সিঁথিপাটী বেঁধে দেয় বাঁদী।

ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু রেখে মুখ ঘুরিয়ে বলেন জুবেদা—"তাহলে আর মহলে মহলে ঘুরে মরো না। সুলতানার পাশে থেকে তাঁর খেয়ালে উঠ ব'স করগে।"

ক'দিন ধরে মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। তা সফল করতে জুবেদার সাহায্য নেবে ভেবেই এসেছিল মামুদা। কিন্তু জুবেদার নিস্পৃহ অভ্যর্থনায় আর শ্লেষে-পোড়া উপদেশে জ্বলে ওঠে মামুদার মন। কিন্তু যেচে আলাপ করতে এসে তো আর মনের আঁচ ঝাঁঝিয়ে প্রকাশ করা চলে না। আর তা ছাড়া—সেদিনও আর নেই মামুদার! সুলতানার বলই ছিল মামুদার বল। সেই সুলতানার 'পরেই যে আজ আর তেমন ভরসা রাখতে সাহস হচ্ছে না। কাজেই অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করে সংযতকণ্ঠেই মামুদা বলে—"যাই এবার, কখন যে সুলতানার খেয়ালের তলব পড়ে তার তো ঠিক নেই !"

মামুদার কথার জবাব দেয় না জুবেদা। দর্পণখানি মুখের অতি নিকটে ধরে হাসিটুকু আড়াল করে মাত্র।

জুবেদার হাসির অন্তরালে যে অবজ্ঞা আর উপহাস রয়েছে তা অনুভব করে মামুদা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় পায়ের পদ্মমঞ্জিরায় ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ তুলে সে প্রস্থান করে।

পায়ের শব্দে সমস্ত মহল সচকিত করে বড় খাসমহল-এর সুলতানার পাশে এসে দাঁড়ায় মামুদা।

বাহুমূলে চোখ ঢেকে পরীপালঙ্কে তখনো শুয়ে ছিলেন সুলতানা। অলিন্দের পাশে বসে বাঁশের বাঁশিতে ভাটিয়ালী বাজিয়ে চলেছে জাগরদারণী বাঁদী।

মামুদার খাড়ুর ঝুমকী তাবিজের শব্দে একবার নিস্পৃহদৃষ্টি মেলে আবার বাহুমূলে চোখ ঢাকেন সুলতানা। পালঙ্কের মাল্যধারিণী পরীর কাঁধে হাত রেখে নীরবে বিরসমুখে দাঁড়িয়ে থাকে মামুদা।

খানিকপরে অলসকণ্ঠে সুলতানা জিজ্ঞাসা করেন—"কিরে ? কিছু খবর আছে ?"

সুলতানার প্রশ্নে কিছুটা উৎসাহিত বোধ করে মামুদা। কিন্তু পরক্ষণেই

জবাব দিতে গিয়ে সুলতানার দিকে চেয়েই সে নিরুৎসাহ হয়ে যায়। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলে—"খবর আর কি? আর খবর থাকলেও তোমার তহসির মেজাজ তো ভালো নয়। খবরের সুরাহা করবে কে?"

সুলতানা নিরুত্তর। অসহ্য নীরবতায় উসখুস করে মামুদার মন।

কিছুক্ষণ পরে পূর্বের মতোই অলসকণ্ঠে সুলতানা বলেন—"বল, যা বলবার থাকে বলে নিশ্চিন্ত হ'।"

—"বলছিলাম কি···শিশমহলওয়ালীর দেমাক যে ক্রমেই সারা প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ছে সুলতানা। রোজ রোজ নতুন কর্পূরের আর মোতির মালা চড়ছে, বাগিচা কাবার করে ফুল আসছে! সুলতান নিজে আত্তর-পলিতা জ্বালছেন প্রতি সন্ধ্যায়! সত্যি বলতে কি সুলতানা, এত তহিত্ কোনো বাদশার জীবন্ত-সুলতানাদের নসীবেও জোটে না।" নীরব সুলতানার দিকে চেয়ে একটু থেমেই আবার মামুদা বলতে থাকে—"এক নওজোয়ান সুরৎ ওস্তাদ এসেছে মগধ থেকে। রোজই সে নিদ্‌মহল-এ সঙ্গীত শোনাচ্ছে। নতুন মহল তৈরি হলে নাকি তার বন্দোবস্ত কায়েম করে দেবেন সুলতান। রোজ ভোরে ও সাঁঝে সঙ্গীত শোনাবে দরবারে। যাই বল সুলতানা, সে জোয়ান ওস্তাদের গলার খাঁজ যদি শোনো···"

কথার মাঝে থেমে যায় মামুদা। মামুদার দিকে পিছন দিয়ে পাশ ফিরে সুলতানা। কিন্তু তাতেও দমে না মামুদা। আজ যখন সুযোগ পাওয়া গিয়েছে তখন সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। সুলতানার ঔৎসুক্য জাগাবার উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা এনে বলে—"তোমার পয়জর-এর হুকুম হলে একটা কথা বলতাম সুলতানা।"

—"বল।"

—"যে নওজোয়ান ওস্তাদ রোজ সঙ্গীত করে সুলতানের নিদ্‌মহল-এ, ওকে হাত করতে পারলে শিশমহলওয়ালীর বাসা সরানো হয়তো শক্ত হবে না।"

একটু নড়ে-চড়ে নিস্পৃহকণ্ঠেই সুলতানা বলেন—"বাসা সরালেই কি আর আসল সমস্যার সমাধান হবে ভেবেছিস?"

—"হবে, নিশ্চয়ই হবে। ও-বাসা চোখের আড়ালে গেলেই সুলতানের খেয়াল নড়বে।"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে নীরবে মাথা দোলান সুলতানা।

—"আচ্ছা আগে তুমি একবার সে ওস্তাদের গান শুনেই না-হয় দেখো। অন্য কথা এখন থাক।"

—"বেশ তো, খবর দিয়ে আসিস একদিন সময় বুঝে।" বলে গা মুড়ে উঠে দাঁড়ান সুলতানা। হম্মাম-তসবির নিয়ে এগিয়ে আসে আত্তর-বরদারণী।

সুলতানার প্রস্থানের দিকে চেয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বিরসমুখে চলে যায় মামুদা।

নগরপ্রান্তে বনের মধ্যে বেলা-শেষের ম্লানিমা ঘনিয়ে এসেছে। এর মধ্যেই কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন ওস্তাদ মহম্মদ ইশাক। আর বার বার মনে মনে আবৃত্তি করছেন মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ প্রক্রিয়ার শ্লোক। কখনও বা ভাবছেন তোমায় আমি সারিয়ে তুলবো অবন্তীমালা। জীবন থাকতে আশা ছাড়বো না। নিশ্চিত জানি, এখনও তোমার মধ্যে রয়েছে প্রাণের স্পন্দন। সে-প্রাণকে আমি জাগাবো। আমার সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে তোমার সুপ্ত প্রাণে আমি চেতনা আনবো। তোমার নিস্পন্দ চোখে আবার তড়িৎ-বিদ্যুৎ খেলা করছে দেখবো।

হঠাৎ শুকনো পাতার উপর পায়ের শব্দে চমকে ওঠেন ইশাক। ফিরে দেখেন, এক তরুণ! কিন্তু সাজ-সজ্জায় আমীর তুরস্ক বলেই যেন মনে হয়। বেলা-শেষের রক্তিম আলো পড়ে ঝক্ ঝক্ করছে মূল্যবান মণি-খচিত সরপ্যাজ।

—"তোমার সঙ্গীত শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি ওস্তাদ! প্রকৃত প্রেমিক না হলে এমন সুর কেউ কণ্ঠে বাঁধতে পারে না।" যুবকের কথা বিস্মিত ইশাককে বিস্মিততর করে তোলে।

ইশাকের কণ্ঠে কথা সরে না। বিস্মিত চোখ নত করে কোনোরকমে কুর্ণিশ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

আবার যুবকের কণ্ঠ শোনা যায়—"কিন্তু যতই না কেন প্রেমের ভাবুক হও, বর্ষার সন্ধ্যা-সমাগমে বনে বনে ঘোরায় যে বিপদ, সে ভাবনাটা ভাববার অবকাশ রেখো। নইলে যে ভাববার মগজটাই বিলকুল হারিয়ে ফেলবে।"

নীরবে মাথা দুলিয়ে ইশাক তরুণের কথার তাৎপর্য স্বীকার করেন। কিন্তু চোখ তুলে চাইতে পারেন না।

ইশাকের বিহ্বলতা লক্ষ্য করে কৌতুকের হাসি হেসে তরুণ জিজ্ঞাসা করে —"বলি এখানে করছ কি?"

মৃদুকণ্ঠে ইশাক জবাব দেয়—"এমন কিছু নয়। প্রদোষের বনের শোভা দর্শন করে চলেছি।"

ইশাককে চমকিত করে ছল্‌ছলিয়ে হেসে ওঠে তরুণ—"তোমার বনের শোভা দর্শনের অবকাশে সাপ যখন তোমার পদলেহন করবে তখন সে শোভা দেখবার দৃষ্টিটুকুও যে খোয়াতে হবে!"

আশ্চর্য হয়ে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করেন ইশাক। কণ্ঠস্বর নারীর মতো না হলেও হাসিটি যেন নারীর অনুকরণ! ছদ্মবেশিনী নাকি? অনুসরণ করছে কী? নিশ্চয়ই করছে, নইলে ইশাকের সঙ্গীত শুনলো কোথা থেকে?

ইশাকের নির্বাকদৃষ্টির বিস্মিতভাব দেখে আবার খিল্‌খিল হেসে ওঠে তরুণ। বলে—"ভাবছো হঠাৎ এ বনের মধ্যে পথ খুঁজে তোমাকে পেয়ে এত পেয়ার করছি কেন?" বলে লীলায়িত কটাক্ষ হানে তরুণ।

এবার সন্দেহ নিশ্চিত হয় ইশাকের। আগন্তুকের প্রতি জিজ্ঞাসুদৃষ্টি তুলে ধরেন।

—"তবে শোনো ওস্তাদ, তোমার সন্দেহ সত্য—এ আমার ছদ্মবেশ। আমি সুলতানার পার্শ্বচরী। তোমার কাছে এক আর্জি পেশ করবো বলে এসেছি।" বলেই এগিয়ে আসে ছদ্মবেশী আগন্তুকা।

বিস্ময়াভিভূত ইশাককে প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে সুলতানার পার্শ্বচরী আবার বলে—"হ্যাঁ, তোমার কাছেই আর্জি। সুলতানার বড়-খাসমহল-এ গিয়ে তোমাকে সঙ্গীত শোনাতে হবে।"

—"সুলতানা মহল-এ সঙ্গীত!"

—"হ্যাঁ, ভয় নেই। আমিই তোমাকে নিয়ে যাব। এবং আজ রাত্রেই। তুমি প্রস্তুত থেকো। ভাবনার কিছু নেই, কেউ জানতে পারবে না।"

—"কিন্তু..."

—"কিন্তু কি? সুলতানের নিদ্‌মহল-এর ব্যাপার তো? সেজন্য ভাবনা নেই। সুলতানকে খবর পাঠাও—জোর বোখার। দাওয়াই আনতে পরগাঁয়ে গিয়েছ। ভাবনা নেই, সে-খবরও আমি যথাস্থানে পৌঁছে দেব। তুমি প্রস্তুত থেকো।"

—"কিন্তু আমি..."

—"আর কিন্তু নয়, সুলতানার হুকুম। তালিম না করলে গর্দান রাখতে পারবে না। আমি চললাম। মহল ছেড়ে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। তোমার খোঁজে কি কম ঘুরতে হয়েছে!" বলে আর একটি কটাক্ষ হেনে ক্ষিপ্রপায়ে চলতে থাকে মামুদা।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে বিস্মিত চোখে চেয়ে থাকে ইশাক।

কিছুদূর গিয়ে আবার ঘাড় ফিরিয়ে মামুদা বলে—"মনে থাকে যেন—হয় গান নয় জান্।"

মামুদার গমনপথের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নগরের পথ ধরেন ইশাক। না, আর কোনো নারীকে সঙ্গীত শোনানো চলে না। প্রাণ গেলেও না। সুলতানের মন্দিরের এক রাত্রির বিরহ—সেও মৃত্যুতুল্য।

পথ চলতে চলতে মামুদার মনে নানা চিন্তার উদয় হয়। সুলতানা তো একেবারেই আশা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মামুদা খাঁটি তুর্কী মেয়ে। প্রেমিকের জান না পেয়ে মান হারিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে জানে না। যে জান চেয়ে পেলাম না—সে জানের মায়া বুকে ধরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রাণ ক্ষয় করে বাঙলার মেয়ে। সুলতানাও তাই বাঙলার হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে নিয়ে পান্‌সে হয়ে গিয়েছে। তাই এই হাঁ-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু ওস্তাদ! চোখে কি মায়া! যেন প্রলোভনের হাতছানি!

রাত্রি দ্বিপ্রহর না হতেই নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে সুলতানের খাসমহল। শুধু ভেসে বেড়াচ্ছে সুলতানের শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষে করুণসুরের ঝঙ্কার! ধীরপায়ে বন্ধদ্বারের কাছে এসে দাঁড়ায় একটি কালো বোরখা-পরা মূর্তি। বন্ধদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করে বোরখার আধ-রোশনাইয়ের মধ্যে দিয়ে দুটি আকুল চোখ কক্ষের মোহময় পরিবেশ আর মোহমুগ্ধ পূজারীদের দেখতে চেষ্টা করে। অপূর্ব এক সুরের ব্যঞ্জনায় দুরু দুরু করে ওঠে বুক, সজল হয়ে আসে বোরখা-ঢাকা আয়ত-আঁখি। কতক্ষণ যে কেটে যায় তার হিসেব থাকে না আত্মহারা গায়কের, বিমুগ্ধ শ্রোতার আর উচকিতা অভিসারিণীর। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে ঘণ্টাঘরের প্রহরবার্তা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করে। কক্ষমধ্যে গায়ক ও দুয়ারে-দাঁড়ানো অভিসারিণী উভয়েই চমকে ওঠেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে পা টিপে যেমন এসেছিল তেমনিই কালো বোরখাটা সন্তর্পণে চেপে ধরে হামিদা সরে যায়। আজকের অভিসার শেষ হলো! কে জানে আগামীদিন আবার কেমন রূপে দেখা দেবে!

তানপুরা সরিয়ে তম্রোল-এর দিকে একবার চেয়ে দেখেন গায়ক। তখনো নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন তম্রোল। দুই চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়ছে প্রেমধারা! সমস্ত শরীরে এক অভূতপূর্ব শিহরণ অনুভব করে গায়ক। অবন্তীমালার মুখের 'পরে স্বপ্নালু দৃষ্টি তুলে অস্ফুটে উচ্চারণ করেন —'তোমায় নিয়ে যাব বলেই এসেছিলাম। কৌশলে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তোমার চৈতন্য ফিরিয়ে আনবো—এ ছিল আমার পণ। তিনপক্ষকাল ধরে সংগ্রহ করেছি লতা-গুল্ম, কণ্ঠস্থ করেছি জীবন-দানের প্রক্রিয়া। কিন্তু— এ তুমি বেশ আছ অবন্তীমালা। চৈতন্য ফিরে পেয়ে বাঁচার চেয়ে অচৈতন্য অজ্ঞান অবস্থায় ঢের বেশি তুমি বেঁচে রয়েছো প্রেমের সমাধিতে। আজ তুমি তম্রোল আর হরিশ্চন্দ্রের মনে সূর্যের মতো সম-আলোয় পরিস্ফুট!' সজল হয়ে আসে গায়কের আয়ত-চোখ। চোখ মুছে নিস্তব্ধতা ভেঙে উঠে দাঁড়ান ওস্তাদ।

চোখ উন্মীলিত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তম্রোল। জিজ্ঞাসা করেন—"থামলে কেন ওস্তাদ?"

—"হ্যাঁ জাহাঁপনা। তারের সুর আর থাকে কতক্ষণ?"

—"তারের নয় ওস্তাদ। তোমার প্রাণের সুর! কতই তো সঙ্গীত শুনেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গীতে আমার প্রাণে এমন তরঙ্গ ওঠে কেন? তোমার সুরের তালে যেন বুক ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে লুটিয়ে পড়তে চায় আমার প্রেয়সীর প্রতি অঙ্গে।"

গায়কের হাত ধরে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে তম্রোল বলেন—"তুমি আমাকে ফেলে যেও না ওস্তাদ। জবান দাও।

—"থাকবো, জাহাঁপনা। আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো।"

—"বলো কী ওস্তাদ, সত্যিই থাকবে!"

—"থাকবো বৈ কি জাহাঁপনা। যুগ যুগ ধরে প্রেয়সীর গলায় আপনি দেবেন মালা আর আমি যুগিয়ে যাবো সুর।"

তব্রোল-এর মুখের ব্যগ্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে। একটু থেমে আবার বলেন—"কিন্তু ওস্তাদ, এতদিন হলো তুমি তো কৈ তোমার প্রেয়সীর ঠিকানা বললে না?"

—"বলবো বৈ কি জাহাঁপনা। সময় এলেই বলবো।"

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তব্রোল। বলেন—"তাই হবে ওস্তাদ, তুমি দিও সুর, আমি দেব মালা। আসন্ন বিপদ থেকে প্রেয়সী আমায় রক্ষা করতে পারলে সোনালী মহল গড়ে নিত্যি কর্পূর আর মোতির মালা উপহার দেব।"

উত্তেজিত তব্রোলকে সম্বোধন করে গায়ক বলেন—"চলুন জাহাঁপনা আজ রাত্রির জন্য বিশ্রাম করবেন চলুন।"

—"ঘুম! ঘুম নেই ওস্তাদ। সিংহাসনের পাশে ঘুমের শান্তি দাঁড়াতে ভয় পায়। বিশ্রাম দূর দিয়ে হেঁটে যায়।"

—"তবু চলুন জাহাঁপনা। চেষ্টা করে দেখুন।"

—"আর কত চেষ্টা করবো? হেকিম তো কত রকম দাওয়া দিচ্ছে!"

—"চলুন, আমি আবার জাঁহাপনাকে গান শোনাবো। নিশ্চয়ই নিদ্রা আসবে।"

তব্রোল-এর হাত ধরে শয়নকক্ষে নিয়ে চলেন গায়ক। বাধ্য শিশুর মতো পরম বিশ্বাসে গায়কের সঙ্গে সঙ্গে চলেন সদা-সন্দিগ্ধ সুলতান।

নানা ভাবনা গায়কের মাথায় ভিড় করে আসে। নিজের জীবন বিপন্ন করে কেন সে এসেছিল। আর এলই যখন কেন সে কার্যোদ্ধার করছে না? জীবনে যাকে এখনও একান্ত করে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার চঞ্চল কটাক্ষের নিক্ষিপ্ত শরে ভস্মীভূত হবার আনন্দ আছে—সব ভাসিয়ে দিয়ে সে কি সারাজীবন শুধু দূরে বসে অবোধ তারের ঝঙ্কারে হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার গান গেয়ে কাটিয়ে দেবে? না, না, এই অবোধ স্তুতির জাল ছিঁড়ে অবন্তী-মালাকে সত্যিকারের আলোর জীবনে নিয়ে আসবে সে। অবন্তীমালা আবার ফিরে পাবে চাওয়া-পাওয়ার কান্না-হাসির দোলার সুন্দর জীবন।

তন্দ্রা টুটে আবার উঠে বসেন তব্রোল।

আকুতি জানিয়ে গায়ক বলেন—"অস্থির হবেন না জাহাঁপনা।"

—"না হয়ে কি করি বল ওস্তাদ! ভাগীরথীর কূলে এই অন্ধকার রাতে কত অসহায় গৃহহীন গ্রামবাসী প্রাণভয়ে আত্মজন হারিয়ে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করছে। তাদের সে-কান্না তন্দ্রা-ঘোরে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে

কানে বাজছে! বুক হাহাকার করে উঠছে। তাদের ঘরের আগুনের আঁচ আমার শয্যা উত্তপ্ত করে তুলছে!"

—"আপনাকে আরাম দেবার জন্য কোনো সেবাকারিণীকে কি তলব দিতে বলবো জাহাঁপনা?"

মলিন হেসে তম্রোল বলেন—"না ওস্তাদ, এ অন্তরের জ্বালা। সেবাকারিণীর হাসিতে নেভে না। এর জন্য চাই সমবেদনার অশ্রু। সে ওদের নেই। যাও ওস্তাদ, তুমি এখন বিশ্রাম করোগে।"

—"আপনার নিদ্রা না আসা পর্যন্ত বান্দাকে যেতে হুকুম দেবেন না জাহাঁপনা।"

—"তুমি কি আমায় সত্যি ভালোবেসেছো ওস্তাদ?" করুণদৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করেন তম্রোল।

সে-দৃষ্টিতে ঈষৎ নড়ে ওঠেন গায়ক। কিন্তু উত্তর না দিয়ে অবনতমুখে বসে থাকেন। বারবার সহস্র প্রশ্ন মনে দোলা দিয়ে যায়। কেন? কেন বসে আছে এখানে? কিসের আশায়? কেন করছে নিত্য নিজেকে প্রবঞ্চনা! কেনই বা এই পরমবিশ্বাসীর বিশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ করছে? কেন যেতে পারে না এই প্রেমের দুয়ারে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে? নাকি সারাজীবন বসে থাকবে এই প্রেমিকের পদতলে? পলে পলে তিলে তিলে শিখবে সত্যিকারের প্রেমের ভাষা!

গায়কের দ্বিধাভরা মুখের 'পরে দৃষ্টি রেখে আবার চিন্তায় ডুবে যান তম্রোল। হঠাৎ সচেতন হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা ওস্তাদ, এই আর্ত গ্রামবাসীদের ফেলে চলে যাওয়া কি আমার উচিত?"

—"রাজ্যরক্ষার কর্তব্য তো একা রাজার নয় সুলতান। রাজ্যবাসীরও কর্তব্য আছে। সুলতান-উপস্থিতিতেও যখন সে কর্তব্য তারা পালন করতে উৎসুক নয়—তখন···সুলতানের পক্ষে রাজধানী ত্যাগই হয়তো নিরাপদ পথ।"

—"নিরাপত্তা আর কর্তব্য তো একপথে চলে না ওস্তাদ। আচ্ছা তুমি এখন যাও ওস্তাদ। একা থাকলেই মনে হচ্ছে এখন আয়েশ পাব।"

অগত্যা কুর্নিশ করে আর একবার পার্শ্বস্থ বন্ধদ্বারের দিকে চেয়ে শয়নকক্ষ ত্যাগ করেন গায়ক। কিন্তু···মহলদ্বারে এসে সুলতানার পার্শ্বচরীর কথা মনে পড়ে যায়। তাঁকে দেখেই প্রতিহারী কুর্নিশ করে জানায়—"জনাব ওস্তাদের দর্শন কামনায় এক তরুণ বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে।"

কেঁপে ওঠে ওস্তাদের বুক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীরকণ্ঠে বলেন—"সুলতানের মেজাজ ভালো নেই, সেজন্য সারারাত সঙ্গীত শোনবার আদেশ দিয়েছেন। এখন তো কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নিরাপদ নয়।"

দ্বারীর মুখে সংবাদ পেয়ে মনের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে যায় মামুদা।

কিন্তু উপায় নেই। আগের দিন হলে আর সূর্যোদয় দেখতে হতো না ওস্তাদকে। সুলতানাকে বলেও এখন লাভ নেই। আজ মামুদার অপমান তাঁর মনে বাজে না। তাই নিজেকেই দেখতে হবে শয়তান ওস্তাদের কলিজার বিষ। ঐ প্রেমসিক্ত করুণকণ্ঠ যদি মামুদার বুকের আগুন না সিক্ত করে—ঐ তন্দ্রালু আঁখির জল যদি মামুদার উত্তপ্ত নিশ্বাস প্রশমিত না করে—তবে জহান্-এ অমন কণ্ঠ, অমন আঁখ না থাকাই মঙ্গল। অস্থির বুকের তরঙ্গ নির্মমভাবে দমন করে পথের বুক নিপীড়িত করে চলতে থাকে মামুদা।

সূক্ষ্ম পট্টপাটিতে তুলির সূক্ষ্মতম রেখার টানে উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠছিল মনোমুগ্ধ এক চিত্র। বাহ্যিক চেতনা হারিয়ে শিল্পী তুলিতে রেখা টেনে চলেছেন—মেঘাড়ম্বর দেখে ময়ূরী পাখা খুলেছে নৃত্যের আশায়। অদূরে দাঁড়িয়ে ব্যাধ ধনুকে তীর যোজনা করেছে। কিন্তু—কি বর্ণ-বৈচিত্র্য! যেন জীবন্ত ময়ূরীর রক্ত আঁখি থেকে এখনি ঝরে পড়বে বেদনার ধারা!

উদ্বিগ্নমুখে অবিন্যস্ত-বেশে চরণ-মঞ্জিরার উচ্চরোল তুলে ঘরে ঢোকে মামুদা।

বিরক্তমুখে উচ্চারণ করেন ধ্যানমগ্না শিল্পী সুলতানা—"আঃ···!"

থমকে একটু দাঁড়িয়ে ঘনশ্বাসের সঙ্গে কুণ্ঠিতকণ্ঠে মামুদা বলে—"জবর খবর আছে সুলতানা।"

—"খবর? খবর এখন অপেক্ষা করুক!"

—"এ খবর অপেক্ষা কিংবা উপেক্ষা করবার নয় সুলতানা। সুলতানের খাস জরুরী খবর।"

জিজ্ঞাসুদৃষ্টি তুলে মামুদার দিকে চেয়ে তার উদ্বিগ্নমুখ ও কেশবাস লক্ষ্য করে বিস্মিত সুলতানা জিজ্ঞাসা করেন—"ব্যাপার কিরে মামুদা?"

—"সুলতান এবার আর দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রয়াসী নন। তিনি লখ্‌নৌতি পরিত্যাগে প্রস্তুত হচ্ছেন!"

—"লখ্‌নৌতি ত্যাগে প্রস্তুত হচ্ছেন!"

—"হ্যাঁ সুলতানা। সুলতান পলায়ন করবেন বলেই স্থির করেছেন।"

তুলি ফেলে ছিটকে উঠে দাঁড়ান সুলতানা—"পলায়ন করবেন সুলতান! এমন বাজে গুজব রটাবার স্পর্ধা কে করেছে মামুদা!"

ভীত কুণ্ঠিতমুখে মামুদা উত্তর দেয়—"গুজব নয় সুলতানা।"

—"গুজব নয়! বাঙলার ব্যাঘ্র সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ মরতে হলে যুদ্ধক্ষেত্রেই মরবেন। ভীরু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করে পলে পলে মৃত্যুবরণ করবেন না। যে এমন সংবাদ রটনায় প্রবৃত্ত হয়েছে আর যে তা রটনা করতে সাহায্যকারিণী হয়ে···ছে···।" দাঁতে দাঁত রেখে ক্রুদ্ধ আক্রোশে মামুদার দিকে এগিয়ে আসেন সুলতানা। ভয়ে কুঁকড়ে দু'পা পিছিয়ে যায় মামুদা।

ভীতকণ্ঠে মামুদা উচ্চারণ করে—"সুলতানই অন্দরে খবর পাঠিয়েছেন সুলতানা—"

—"সুলতানই খবর পাঠিয়েছেন! কি খবর!"

—"আজই লখ্‌নৌতি ত্যাগ করবেন সুলতান। যে যে সুলতানা ইচ্ছে করেন সুলতানের সঙ্গে যেতে পারেন।"

থমকে দাঁড়িয়ে অস্ফুটকণ্ঠে সুলতানা বলেন—"সত্যি বলছিস?"

—"এমন খবর কি কেউ মিথ্যা বলবার সাহস রাখে সুলতানা? গর্দানের ভয় নেই? সুলতান স্বয়ং খবর পাঠিয়েছেন। সুলতানাদের মধ্যে যাঁরা প্রাসাদের আরাম ত্যাগে প্রস্তুত—খুশিমনে সুলতানের দুঃখে সমান দুঃখভোগে ইচ্ছুক, তাঁদেরই বিশেষ করে যেতে বলেছেন।"

মুহূর্তে রক্তহীন পাংশু হয়ে যায় সুলতানার মুখ। ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যমনে অস্ফুটকণ্ঠে বলেন—'যে যে ইচ্ছে করেন! বিশেষ করে কাউকেই তা হলে ডাকেননি! এই বিপদে বিশেষ কারো হাত ধরতে চাননি!' নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবেন সুলতানা—কতদিন! হ্যাঁ, অনেকদিন আর মনে পড়েনি অন্দরের কথা। মনে জাগেনি একখানি মুখ! শুনতে অভিলাষ হয়নি তার কণ্ঠের ঝঙ্কার! একটি সঙ্গীত! আসেনি সামান্য একটি বার্তা এই নিত্য-প্রতীক্ষিতা অন্দরবাসিনীর নিকটে! একান্ত হয়ে কেবল পুজা করছেন অবন্তীমালাকে! কে কাকে হত্যা করছে! আর্জিনা আজ বেঁচে থেকেও নেই! অবন্তীমালা—তুমিই অমরত্ব পেয়েছ! মৃতা আর্জিনাকে ক্ষমা করো!

এতদিন সুলতানার পাথর-মনের সঙ্গেই শুধু মামুদার পরিচয় ছিল। কিন্তু আজকের সুলতানার এ-প্রাণহীন প্রস্তরমূর্তি মামুদার চোখে একেবারেই নতুন! তবু সাহস সঞ্চয় করে সুলতানার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে বলে—"আমি বলি কি, তুমি প্রাসাদেই থাকো সুলতানা। কোথায় বন বাঁদাড়ে গিয়ে দুঃখ পাবে, বিপদে পড়ে প্রাণ হারাবে? তুমি প্রাসাদে থেকে যদি দিল্লীশ্বরকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাও—চাই কি—হয়তো দিল্লীর তক্‌ত্‌ থেকে তোমার সম্মানের ডাক আসবে।"

ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে অগ্নিদৃষ্টিতে ফিরে দেখেন সুলতানা। ভীতমুখে সরে দাঁড়ায় মামুদা।

—"সুলতান মুঘীষ-উদ্‌-দীন্‌কে বিদায় দিয়ে প্রাসাদ সাজিয়ে অভ্যর্থনা জানাবো বৃদ্ধ বন্য শৃগাল—বলবনকে! তোর মগজে এত আক্কল! আগে তা জানতাম না। তোর জাহান্নম নিকটে!" বলেই উত্তেজনায় আরক্তমুখে দর্পিত পায়ে মামুদার দিকে এগিয়ে আসেন সুলতানা।

ভীতমুখে আভূমি কর্ণিশ দিতে দিতে পিছু হটে পালিয়ে বাঁচে মামুদা।

উত্তেজনায় কম্পিতদেহ শেরপোষে এলিয়ে দিয়ে ওড়নায় চোখ ঢাকেন সুলতানা। পাথরে চিড় খেয়ে লুক্কায়িত স্রোতস্বিনীর কয়েকটি বিন্দু ঝরে

পড়ে। যুদ্ধ-বিলাসী তঘ্রোল আজ প্রাণের মায়ায় ভীত হয়ে পলায়ন করবেন! কার পাপে তঘ্রোলকে আজ এ দুর্বলতা আশ্রয় করলে?

অবিন্যস্তবেশে আলুলায়িতকেশে ঘরে ঢোকে অশ্রুমুখী রোশেনা। অপ্রকৃতিস্থভাবে এসে সুলতানার পায়ের কাছে বসে পড়ে।

—"একি হলো সুলতানা?"

সংযত হয়ে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসে রোশেনার মাথায় সস্নেহে হাত রাখেন সুলতানা—"ভুল, সব ভুল হয়ে গেল বোন।"

সজলচোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি সুলতানার মুখের ওপরে তুলে ধরে বাকরুদ্ধ রোশেনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুলতানা বলেন—"যে উজীর-ওমরাহরা তঘ্রোল-এর বাহুবলে বিশ্বাস রেখে তঘ্রোল-এর প্রসাদ বেশি মূল্যবান মনে করে বলবন-এর বিরুদ্ধে একদিন তাঁকে উত্তেজিত করেছিল, আজ তঘ্রোল-এর মন দুর্বল দেখে সেই স্বার্থান্বেষী পারিষদরাই জীর্ণকুলার মতো তঘ্রোলকে পরিত্যাগ করে বলবন-এর প্রসাদ-প্রয়াসী হয়ে উঠেছে।"

—"কিন্তু কেন? কেমন করে সুলতানের বলিষ্ঠতর বাহু এমন দুর্বল ও ক্ষীণ হলো সুলতানা?"

স্থির চোখ দেয়ালের দিকে রেখে ব্যথিত গম্ভীরকণ্ঠে বলেন সুলতানা—"ভুল হয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল আজিনা," ক্ষণেক থেমে আবার বলেন—"যে পাথরের বুকে চিড় খেলে একেবারে ধ্বসে পড়বার সম্ভাবনাও থাকে।"

আকুলতায় সুলতানার জানুতে মুখ গুঁজে রুদ্ধকণ্ঠে রোশেনা বলে—"কিন্তু শুনেছি তোমার বুদ্ধিতে সুলতানের অসীম আস্থা—তুমি একবার সুলতানকে বুঝিয়ে বল। তুমি সুলতানের মনে বল দাও আর···আর ওই অলক্ষুণে অবন্তীমালাকে তুমি যেমন করেই হোক ভাগীরথীর স্রোতে ভাসিয়ে দাও সুলতানা। আমি বলছি ও আর বেঁচে উঠবে না—ওর আরোগ্য লাভের কোনও আশাই নেই—সুলতানের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে—।" আরো দৃঢ়ভাবে দু'হাতে সুলতানার কটি বেষ্টন করে বলে—"তা·· হলেই···তাহলেই সব আবার সহজ হয়ে ফিরে আসবে।" একটু থেমে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বলে—"হিঁদুর মেয়ে, নিষ্পাপ অবন্তীমালার বিক্ষুব্ধ নিশ্বাসেই বুঝি এমন সব পুড়ে ছাই হয়ে যেতে বসেছে সুলতানা। অবন্তীমালার মোহ সুলতানের মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেই আবার সুলতানের সহজ বুদ্ধির বল ফিরে আসবে দেখো।"

সস্নেহে রোশেনার মাথায় হাত বুলিয়ে সহজভাবে মলিন হাসেন সুলতানা। বলেন—"না, সে সুলতানকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না বোন। অনেক ভেবেই তো ও-পথে আর মন দিইনি। প্রেম যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণই তার গতিও নিয়ত পরিবর্তন-প্রয়াসী! কিন্তু প্রেম যখন মনে প্রবেশ করে বাসা বাঁধে তখন সে স্থির, নিশ্চল, অপরিবর্তিত ও অমর! আজ সুলতানের প্রেম আর দেহের জ্বালা নয়, মনের প্রশান্তি। প্রেমিকের দৃষ্টি থেকে অবন্তীমালা

আর লগ্ন পাবার নয় বোন। যাও বোন, যার যতটুকু প্রাপ্য সে তাই পেয়ে থাকে। পরিপূর্ণ চাওয়া তো নেই জহান্‌-এ, কেউ তা পায়ও না। যাও প্রস্তুত হয়ে নাও গে। বিপথে, বিপদে সুলতানকে চোখে চোখে রেখো। চেয়ে না পেলেও, দিয়ে আনন্দ পাবে।”

বিবশা রোশেনার হাত ধরে সস্নেহে টেনে তুলে মহলদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে চোখের ধারা দৃঢ় হাতে মুছে শুষ্কমুখে দাঁড়িয়ে চিত্রখানির দিকে চেয়ে চেয়ে ছুরীর ফলা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খান খান করে কেটে ফেলেন ময়ূরীর সিক্ত আঁখি!

বিস্তৃত প্রাসাদের কোণে কোণে শঙ্কিত মৃদু গুঞ্জন! বহু চেষ্টা করেও যেন মানুষ আর চলতে পারছে না। প্রতি মুহূর্তেই থেমে যেতে চাইছে।

সন্ধ্যার আঁধার নামলেই আজ সুলতান শিকার-যাত্রা করবেন। শিকার-যাত্রা তো প্রতি বছরেই হয়ে থাকে—কিন্তু, অতীতের সে-যাত্রায় থাকতো সহস্র সম্ভবনার ইঙ্গিত ও আনন্দ। কিন্তু আজকের যাত্রায় যেন রয়েছে নিশ্চিত হারানোর বিষণ্ণতা!

অস্তগামী বিমর্ষ সূর্য প্রাসাদের স্বর্ণমিনার চুম্বন করে নেমে যায় ধীরে অতি সন্তর্পণে। শেষ রক্ততিলক এঁকে দেয় বিশ্রামকক্ষের গবাক্ষে উপবিষ্ট সুলতানের চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে। ক্রমে প্রাসাদের কোল ঢেকে দেয় নিরাশার আঁধার আঁচলে।

কুর্ণিশ করে বিষণ্ণমুখে এসে দাঁড়ায় হামেহাল-হাজিরা।

পদশব্দ হয়তো কানে যায় না সুলতানের! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চামরবাহিনীর প্রতি ইশারা জানায় হামেহাল-হাজিরা। ইশারা বুঝে কঙ্কনের ঝঙ্কার তুলে দ্রুততর চামর দোলায় চামর-বরদারণী! কিন্তু বাহ্য চৈতন্যহারা সুলতান তখনও যেন সূর্যের বিদায়-সম্ভাষণ শুনছেন।

তলোয়ারের ঝনৎকার করে ঢোকে দৌবারিক। চমকে উঠেন তন্দ্রোল। প্রশ্ন করেন—“কে! কি খবর!”

—“সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত জাহাঁপনা। নগরবাসী, পারিষদ, আমীর, সান্ত্রী সকলেই প্রস্তুত।”

—“নগরবাসী! সভাপরিষদ! কেন? তারা কিসের জন্য প্রস্তুত?”

—“অধিকাংশ নগরবাসীসহ উজীর ওমরাহরা জাহাঁপনার সঙ্গে যাওয়াই নিরাপদ বলে মনে করেছেন।”

—“কেন?”

বিনীত কুর্ণিশ করে দৌবারিক বলে—“গোলাম সঠিক জানে না, তবে মনে হয় এখানে থেকে দিল্লীশ্বরের জেরায় হাজির হওয়ার চেয়ে জাহাঁপনার আশ্রয়ে থাকাই তাঁরা শেষ পর্যন্ত শ্রেয় মনে করেছেন।”

হস্তীপৃষ্ঠের সোনার হাওদায় বসে কিংখাপের ঝালর-দেওয়া রেশমী মসলিনের মধ্য দিয়ে উদগ্রীব চোখ মেলে প্রতীক্ষা করছেন সুলতানারা। তাঁদের চোখ শাহীপিল্-এর ওপরে নিবদ্ধ। রুপার পিল্‌জিঞ্জিরী-শোভিত পায়ের অস্থির সঞ্চালন আর সোনার বিড়ন-শোভিত শুঁড়ের অধৈর্য আন্দোলনে শাহীপিল যেন তার প্রতীক্ষার যাতনা জানিয়ে দিচ্ছে। মাথায় মাঝে মাঝে রুপার দণ্ডে মৃদু আঘাত করে শাহীপিলকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছে জরির সাজে ঝল্‌মল-করা সুলতানের খাস মাহুত। সুলতান এলেই রওয়ানা হবে। অধৈর্য প্রতীক্ষায় নিয়ম লঙ্ঘন করে মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে স্থির সান্ত্রীর দল। ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে কটির তরবারি, অঙ্গের বর্মসাজ! কিন্তু হাবিলদারের অগ্নিকটাক্ষে আবার সন্ত্রস্ত হয়ে সব ঠিক হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ সমস্বরে হেঁকে ওঠে বাইশ হোঁশদার। সচকিত হয়ে মুখ মুচকে নানা মন্তব্য করছেন উজীর ওমরাহের দল। স্তব্ধতার গাম্ভীর্যে গম্ গম্ করছে মিলিত গুঞ্জন। সচকিত হয়ে যথাস্থানে হুঁশিয়ার হয়ে ওঠে সব।

বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন সুলতানারা। সুলতানের তান্‌জামের পিছু পিছু আসছে আর এক পর্দানসিনা তান্‌জাম্! মসলিনের পর্দার আড়ালে চোখের জ্যোতি যথাসম্ভব সতেজ করে তোলেন সুলতানারা। বড়-সুলতানার হাওদায় অবস্থিত রোশেনার আর সয় না। পর্দার ভাঁজ ফাঁক করে চোখ রাখে।

সুলতানার পায়ে একটু চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"ইনি কে দিদি?"

—"উনি শিশমহল-রূপসী অবন্তীমালা।" সজল গম্ভীরমুখে সুলতানা জবাব দেন।

—"কি করে জানলে?"

—"জানি। যেমন করে জানি চোখ বন্ধ করে অন্ধকারকে।"

শাহীপিল-এর পিঠ থেকে সুলতানের হাওদা নামিয়ে ওঠে পর্দানসিনা হাওদা। গায়ককে সঙ্গে নিয়ে সুলতান আর এক পিল-এর পৃষ্ঠে উঠে বসেন। দরিদ্র গায়কের এ সৌভাগ্য কল্পনাতীত! সকলেরই চোখ পড়ে তার ওপর।

এতক্ষণ আজিনার হাওদার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন আবদুল। এবার চোখ ফিরিয়ে বার বার তীক্ষ্ণচোখে অগ্নি ছড়িয়ে গায়কের মুখ লক্ষ্য করেন। লোকটাকে মনে হয় পরিচিত কিন্তু ঠিকমতো মনে করতে না পারলে তো আর সুলতানের প্রিয়পাত্রের সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না! মিন্‌হাজের পাশে পাশে ঘোড়া চালিয়ে চলেন কয়েদ কোতোয়াল।

রাত্রি একদণ্ড গত। প্রাসাদের মিনার-গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে ঘর্মাক্ত মামুদা। দাঁড়িয়ে দেখে দূরে ভাগীরথীর তীর ধরে অস্পষ্ট অন্ধকারে তখনো চলেছে সুলতানের সুদীর্ঘ কটক। ঝির ঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। কৃষ্ণ পর্বতের চূড়ার মতো সারি সারি চলেছে লখ্‌নৌতি রাজ্যের গৌরব—আঠারো কুড়ি

পিল্। কিন্তু শাহীপিল কোন্‌টি? কোন্ পিল্-এ বসেছে নয়া সুরৎ ওস্তাদ? মশালচীরা চামশে ঢেকে নিয়েছে মশাল। সহস্র মশালের ছায়া পড়ে ঝক্ ঝক্ করছে সেপাইদের সাজ আর ভাগীরথীর বুক!

মামুদার বুক নিংড়ে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে—এর পর? কে জানে, এ ভালো হলো কি মন্দ হলো! তবু মন বলে—এই ভালো, এই ভালো। সুলতানা উপেক্ষায় ত্যাগ করেছেন মামুদাকে—কিন্তু বলবন! এবার বলবন-এর আশ্রয় গ্রহণ করে হয়তো প্রতিশোধ নিতে পারবে। তঘ্রোল আর তাঁর নয়া দোস্তের উপেক্ষা—দুই উপেক্ষার প্রতিশোধ—! দু'হাতে বুক চেপে ধরে নেমে আসে মামুদা।

বড় খাসমহল-এ পা দিতেই চতুর্দিকের শূন্যতা যেন মামুদার কণ্ঠ চেপে ধরে। বাঁদী-মহল-এর দিকে ছুটে পালায় সে। বৃষ্টির বাধা আর রাতের আঁধার উপেক্ষা করে তখন নিজ নিজ ধন-সম্পত্তি ও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নগরবাসী। বলবন-এর ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কেউ-বা নগর ছেড়ে আস্তানা খুঁজতে চলেছে দূর গ্রামান্তরে।

দুই লক্ষাধিক সৈন্যের পদভরে মাটি ও আকাশ কম্পিত করে ছত্রপতাকা নিয়ে সগৌরবে উচ্চ বাদ্যরোলের সঙ্গে বিনাবাধায় লখ্‌নৌতি প্রবেশ করলেন বলবন। তোরণদ্বারে এগিয়ে এসে সুলতানকে অভ্যর্থনা করলেন ভীত-কম্পিত অবশিষ্ট নগরবাসী। সাহঙ্কারে পরম গাম্ভীর্যে দৃপ্তপদে প্রাসাদে প্রবেশ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বলবন। শূন্য প্রাসাদের বদ্ধবায়ু হা হা করে যেন তাঁকে উপহাস করছে! প্রাসাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি, হাতী, ঘোড়া, আত্মীয়স্বজন নিয়ে অতি সাবধানে পলায়ন করেছেন তঘ্রোল! ক্ষিপ্ত হয়ে বলবন আদেশ দিলেন—"সব নগরবাসীদের তলব কর! যেমন করে হোক তঘ্রোল-এর সন্ধান চাই। হয় সমস্ত নগরবাসী জান্ দেবে, নয় তঘ্রোল-এর পলায়ন-পথ বাতলাবে।"

নিরুপায় নগরবাসী নতশিরে এসে দরবারে দাঁড়ান বটে কিন্তু মুখ খুলে সত্য প্রকাশে সাহসী হলো না কেউ। কি করে মুখ খুলবে? আজ বলবন-এর ভরসায় যদি তাঁর মন রাখতে গিয়ে তঘ্রোল-এর নাম ভাঙে, কাল তঘ্রোল ফিরলে কি আর আজকের বলবন-এর দয়ায় পাওয়া মুণ্ড রক্ষা হবে? পিছনে মুঘল সৈন্য ও দিল্লীর তকৃত ফেলে বাঙলায় আর বলবন ক'দিন থাকবেন? বলবনকে দিল্লীমুখী দেখে যেদিন তঘ্রোল অজ্ঞাতবাস ছেড়ে এসে উদয় হবেন, সেদিন তো মুণ্ড থাকা-না-থাকা তঘ্রোল-এর দাক্ষিণ্যের ওপরেই নির্ভর করবে।

নগরবাসীদের ওপর যথেষ্ট উৎপীড়ন করেও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। শাস্তি কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। শেষ শাস্তি মৃত্যু—মুখ চিরতরে বন্ধ হলো তো আর সংবাদের সুরাহা হবে না।

চিন্তিত ক্রুদ্ধ বলবন বিশ্রামকক্ষে সন্ধ্যার আঁধারে স্তব্ধ হয়ে একা বসে ছিলেন।

হঠাৎ কক্ষে এসে দাঁড়াল একটি ঘন কালো-ছায়া! নারীর চরণাভরণের মৃদুশব্দে চমকে ওঠেন বলবন। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেন—"কে? কে তুমি?"

বোরখা ঈষৎ সরিয়ে আভূমি কুর্ণিশ করে কালো-ছায়া।

উঠে দাঁড়ান উত্তেজিত বলবন। কর্কশকণ্ঠে পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন—"কে? বল, কে তুমি?"

মৃদুকণ্ঠে বোরখাবৃত মূর্তি জবাব দেয়—"বাঙলার হুকুমত্-ই-আজম তঘ্রোল খাঁ'র হেরেমের বাঁদী—মামুদা।"

—"সন্ধ্যার অন্ধকারে বাঁদীর সুলতান-সাক্ষাতের স্পর্ধা কেন?"

—"গোস্তাগী মাপ করবেন জাহাঁপনা। কিছু গোপন খবর পেশ করতে চাই।"

—"খবর সাচ্চা হলে আচ্ছা কিস্মত পাবে।"

—"জাহাঁপনার নেক-নজরই বাঁদীর পক্ষে জওহর।"

—"চুপ কর বেয়াদপ। খবর সংক্ষেপে বল।"

—"তঘ্রোল খান জাজনগর জঙ্গলাভিমুখে শিকারের উদ্দেশ্য প্রচার করে জাহাঁপনার সৈন্যবলে ভীত হয়ে পলায়ন করেছেন।"

বৃদ্ধ বলবন-এর তীক্ষ্ণচোখে আগুন দেখে ভয়ে কুর্ণিশ করতে করতে পিছু হটে মামুদা। এত বড একটা খবর দিয়েও এতটুকু খুশি করা গেল না! মামুদার ভাগ্যই মন্দ! সর্বাঙ্গে যেন অশরীরী নিশ্বাসের হিমশীতল স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব করে মামুদা।

বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে বৃদ্ধ বলবন প্রশ্ন করেন—"এ খবর বহুপূর্বেই জানাবার জন্য অন্দরে সুলতানের আদেশ পাঠানো হয়েছে। তবু খবর পেশ করতে এত দেরী হলো কেন?"

ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে মামুদার—অতিকষ্টে অস্ফুট উচ্চারণ করে—"অন্দরের অপর বাঁদীদের ভয়েই বলতে পারিনি জাহাঁপনা।"

—"খবর যদি মিথ্যা হয়?"

—"জাহাঁপনা গর্দান নেবেন।"

—"আচ্ছা যাও, সত্য হলে ইনাম পাবে।"

পিছু হটে সুলতানের দৃষ্টির বাইরে এসে—উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচে মামুদা। মনে মনে বলে—বাবাঃ, এই বলবন। তঘ্রোল-এর যোগ্য প্রভুই বটে!

পরদিনই দরবারের পর মালেক বারবক্-বেক তরস্‌কে দশ সহস্র অশ্বারোহী নিয়ে জাজনগর যেতে আদেশ করলেন বলবন। কিন্তু···দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের বহুমুখী নদীশাখাগুলি অবরোধ না করলে যদি আবার সে-পথে পালায় ধূর্ত

তব্রোল! সে সময়ে দক্ষিণ-পুর্ববঙ্গের জলপথের অধীশ্বর মেঘনা তীরস্থ সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজরায়। তাঁর তেজ অনমনীয় এবং বল-বীর্যে তিনি মহা পরাক্রমশালী! বলবন জানে রাজা নৌজার এই বলদৃপ্ত অহঙ্কার একদিন তাঁর শাণিত তলোয়ারের আঘাতে নীরব হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও সে সময় উপস্থিত হয়নি। আজকের তেজ নিয়ে রাজা নৌজা হয়তো বলবন-এর দূতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। বিলম্বে কার্য নষ্ট। অতএব আর দ্বিধা না করে বলবন স্বয়ং রাজা নৌজার দরবারে অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হবেন স্থির করলেন।

দূতমুখে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে স্বয়ং সুলতান আসছেন জেনে খুবই কৃতার্থ বোধ করলেন রাজা এবং বলবনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মেঘনার দক্ষিণপার পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

মেঘনার তীরে দুই বীরবাহুর সাক্ষাৎ ঘটলো। উত্তাল তরঙ্গিনী মেঘনা আর এক স্বার্থান্ধ-মৈত্রীর কলঙ্কিত অধ্যায়ের মূক সাক্ষী হয়ে রইল।

দনুজরায়ের কাছ থেকে জলপথ অবরোধের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সসৈন্যে জাজনগর যাত্রা করলেন বলবন। কিন্তু মহানদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছেও তব্রোল-এর কোনো সংবাদ পেলেন না। তাই তো? সামান্য বাঁদীর কথায় এত আয়োজন করা উচিত হয়নি। কে জানে, বাঁদী তব্রোল-এর মঙ্গল-কামনায় হয়তো ছলনা করে ভুলপথে চালনা করেছে! কিন্তু না—লখ্‌নৌতির আরও দু'একজনও শেষ পর্যন্ত বাঁদীর কথার সত্যতা কবুল করেছে। নানা চিন্তা ও সন্দেহ প্রপীড়িত বলবন অবশেষে কুলিশ খানকে তলব করেন। প্রশ্ন করেন—"কি পথপ্রদর্শক? দিল্লী থেকে বাঙলায় এত আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হয়ে শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি?"

বিনীতকণ্ঠে কুলিশ জবাব দেন—"বাঙলার পথ বর্ষায় জলময় হয়ে বহু পথের সৃষ্টি করেছে। জাহাঁপনার আগমন-সংবাদ পেয়ে হয়তো ভিন্নপথ ধরেছে ধূর্ত তব্রোল। এই দুর্গম পথ অশ্বারোহীদের পক্ষে অতিক্রম করা বড়ই কঠিন। তব্রোল-এর হস্তীসংখ্যা প্রচুর। ' বাঙলার বনও এসময় ঘন পল্লবাচ্ছাদিত। এই ঘনবনে আত্মগোপন সহজ জেনেই তব্রোল পলায়নের সুযোগ গ্রহণ করতে সাহসী হয়েছেন জাহাঁপনা। গোধভূমির কঠিন কর্দমাক্ত পথ পার হয়ে আমাদের আসতে দেরী হওয়াতেই এই বিপদ ঘটেছে। তব্রোল জাজনগরে এসে থাকলেও জানিত-পথে আসেননি, সে কথা নিশ্চিত।"

গম্ভীরকণ্ঠে বলবন বলেন—"কিন্তু মুঘল শত্রু পিছনে রেখে বেশিদিন বাঙলায় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আরো অধিকসংখ্যক লোক-লস্কর নিযুক্ত কর।"

সুলতানের আদেশানুযায়ী লোক ও হস্তী সংগ্রহে নির্গত হলেন কুলিশ। হস্তী ভিন্ন বাঙলার খাল বিল দ্রুত উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

চারিদিকে উন্মত্তের মতো ঘুরছে সুলতান বলবন-এর অনুচর। তঘ্রোল-এর সন্ধান-লাভে বারবার ব্যর্থ হয়ে উন্মত্ত ক্রোধাগ্নিতে জ্বলছে বলবন।

ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে এসে সবুজপাতা চুম্বন করে নবীন সূর্যের আলো। নবগুঞ্জনে জেগে ওঠে পত্র-পুষ্পশোভিত ধরিত্রী। কিচ্‌মিচ্ করে জীবনের গান গেয়ে উড়ে যায় পাখীর দল। শিবির গুটিয়ে তোলে সান্ত্রীরা। কটিবন্ধে তলোয়ারখানি গুঁজে হস্তীপৃষ্ঠে উঠে বসেন তঘ্রোল।

হাসিমুখে এসে কুর্নিশ করে জানায় সালারে-ফৌজ—"আর সামান্য পথ জাহাঁপনা। আজ দিনমানেই মহানদী তীরে বহর থামানো যাবে বলে আশা করছি। নদীতীরে রাত্র কাটিয়ে আগামীকাল প্রভাতে নদী উত্তীর্ণ হলেই জাজনগর রাজ্য। তারপর আর বলবন-এর চর আমাদের খোঁজ পাবে না জাহাঁপনা।"

বিষণ্ণ হেসে ঘাড় নাড়েন তঘ্রোল।—"এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলে উপযুক্ত ইনাম অবশ্যই পাবে, এখনকার মতো এই নাও।" বলে গলার মোতির মালা খুলে দেন।

মোতির হার হাতে নিয়ে আভূমি কুর্নিশ করেন সালারে-ফৌজ।—"বান্দা ধন্য জাহাঁপনা। বিপদ এক রকম উত্তীর্ণ হয়েছে বলেই ধরে নেয়া যায়। এই গুপ্তপথের সন্ধান লখ্‌নৌতির রাজ্যবাসীরও জানা নেই। বলবন কোনো মতেই সন্ধান পাবেন না। তবুও বলবন-এর গতিবিধি নজরে রাখবার জন্য সর্বদিকে উপযুক্ত জাসুস্ নিযুক্ত আছে। আজ দ্বিপ্রহরের মধ্যেই খবর আশা করছি।"

মড় মড় শব্দে গাছের ডাল ভেঙে ঘনবনের পথ করে পিছল কর্দম ভেঙে আগে আগে চলেছে হস্তীবহর। পেছনে আসছে অশ্বারোহী, পদাতিক।

শাহীপিল্-এর শুঁড়ের টানে একটি গাছের প্রকাণ্ড ডাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকুল হয়ে উড়ে আসে শ্বেত-কুররের দল। গভীর বেদনার্তকণ্ঠে হাঁকেন তঘ্রোল—"পালোয়ান!"

প্রভুর-কণ্ঠস্বরে মুহূর্তে শুঁড় নামিয়ে কুণ্ডলি করে সামনের একখানি পা তুলে বিনীতভাবে দাঁড়ায় সুলতানের প্রিয় হস্তী পালোয়ান।

হস্তীপৃষ্ঠ থেকে ক্ষিপ্রগতিতে নেমে আসেন তঘ্রোল! সকলে বিস্ময়ে দেখে বিক্ষিপ্ত পক্ষীশাবকগুলি একে একে কুড়িয়ে একটি গাছের তলায় এনে রাখেন তঘ্রোল। ব্যথিত দৃষ্টিতে শাবকগুলির প্রতি চেয়ে কিছু জুরাত ও আলাক-ই-খুসক্ ফেলে রেখে যেতে আদেশ করেন।"

অশ্বারোহীদের সামনেই হস্তীপৃষ্ঠে চলেছে মোটা মখমলের পর্দার ওপরে রেশমী মসলিনের পর্দায়-ঢাকা সুলতানাদের হাওদা। হস্তীর পদক্ষেপের দোলনে ক্ষণে ক্ষণে বেজে ওঠে অলঙ্কারের রিণিঝিণি আর মৃদু গুঞ্জন! শ্লথ হয়ে আসে

অশ্বারোহীদের হাতের বল্গা,—ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন কোনো আমীর ওমরাহ। ছন্দ গেঁথে গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে ওঠে হয়তো কোনো সভা-কবি।

গরম অসহ্য হলে ভেতরের মোটা মখমলের পর্দা তুলে মসলিনের হালকা পর্দাটি টেনে সরিয়ে ক্ষণেকের জন্য মৃদু বাতাসের স্পর্শ-সুখ অনুভব করতে চান কোনো সুলতানা—। নির্লজ্জ বাতাসের আবেগ-স্পর্শে হঠাৎ সরে যায় যত্ন-কুঞ্চিত মসলিনের হালকা আবরণ—সেই ফাঁকে হয়তো দেখা যায় একটুকরো জড়ির আঁচল বা সুকৃষ্ণ কেশের লম্বিত বেণীর দোলন! কিংবা আবরণ টেনে রাখার চেষ্টায়—লজ্জা-কম্পিত চম্পক-অঙ্গুলির অলক্ত-রঞ্জিত নখের কোণ! সূক্ষ্ম আবরণের আড়ালে স্বপ্ন-ছায়ার মতো চোখে পড়ে ব্রীড়ানত আয়ত-আঁখির ভ্রমর-পল্লব! দ্বিগুণ উৎসাহে অশ্বারোহীরা এগিয়ে চলে একে অপরকে পরাস্ত করে। পিছিয়ে-পড়া প্রধানরা তরবারির ঝলকে অধীনদের সরিয়ে পথ করে দ্রুত অগ্রসর হন এবং বিশেষ কোনো হাওদার দিকে চেয়ে অনুভব করেন আনন্দ-তপ্ত শিহরণ!

বহু-হাওদা পরিবৃত সুলতানা আর্জিনার হাওদা চোখে দেখবার সুযোগ কারও নেই। সাহসও কেউ করে না। সেজন্য মখমলের পর্দা তুলে মসলিনের পর্দা অর্ধেক সরিয়ে মুক্ত আকাশের হাওয়ায় বুকভরে নিয়ে বনের শোভা মুগ্ধচোখে দেখতে দেখতে আরামে চলেছিলেন সুলতানা আর্জিনা। হঠাৎ সুলতানার হাত চেপে ধরে রোশেনা বলে ওঠে—"ভাগ্যে তোমার হাওদায় স্থান দিয়েছিলে দিদি, তাই এমন প্রাণভরে উন্মুক্ত বাতাসের নিশ্বাস নিতে পেলাম!" বনের দিকে চোখ রেখেই স্নেহভরা হাতখানি নীরবে রোশেনার মাথায় রাখেন সুলতানা। সমস্ত পথ সুলতানার এমন নীরব-গাম্ভীর্যে রোশেনা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু থেমে আবার বলে—"আহা দেখো না ওদের দশা! গরমে সবাই পচে মরছে! একটু যদি পর্দা তুলে মুক্ত বাতাস নিতে চায় অমনি কুকুরের মতো সান্ত্রী-সেপাই, এমনকি আমীর ওমরাহরা পর্যন্ত ছুটে আসে।"

অন্যমনে সুলতানা জবাব দেয়—"হুঁ!"

হঠাৎ সচকিত হয়ে নিচুকণ্ঠে রোশেনা বলে—"দেখ, কে এক অশ্বারোহী তোমার হাওদার নিচে পর্যন্ত এসে পড়েছে! কার এমন অসম সাহস! চাপরাস দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে কোনো বিশেষ ব্যক্তিই হবেন!"

তেরছা নয়নে দেখে মলিন হেসে মখমলের পর্দাটি টেনে নামিয়ে সুলতানা বলেন—"সুলতানের খাসনবীশ আবদুল মিনহাজ। সাহসী বৈ কি! যেমন সাহসী তেমন কৌশলী।"

তীর্যক হাসির আভাস ফুটে ওঠে রোশেনার ঠোঁটে—"ও, উনিই? তা থাক না দিদি, হাওদা বন্ধ করলে কেন?"

একটু উঁচুকণ্ঠেই সুলতানা বলেন—"প্রবৃত্তি যাদের অবাধ্য, তাদের বে-আবরু চোখের সামনে নিজের আবরু খুলে রাখতে নেই।"

বহু কৌশলে হাওদার ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়েছিলেন আবদুল। সুলতানার তীক্ষ্ণ গম্ভীরকণ্ঠের সুস্পষ্ট কথা কয়টির ধাক্কা খেয়ে নতমুখে অশ্ব চালিয়ে আবার বেরিয়ে যান।

সুলতানার গম্ভীরমুখের দিকে একবার চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে রোশেনা প্রথম দিনের দেখা সুরামত্ত সুলতানার মুখের সঙ্গে আজকের শিল্পী-সুলতানার মুখ বারবার মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে—ভেবে পায় না এ সুলতানী-খেয়াল, না সত্যিকারের দুঃখের বিকাশ!

বেলা তৃতীয়প্রহর উত্তীর্ণ। পরিশ্রান্ত হস্তী, অশ্ব, সিপাহী, সান্ত্রীরা তবু প্রাণপণ এগিয়ে চলেছে।

হস্তীপৃষ্ঠে বসে বুঁটিদার নয়ানসুখের জোব্বার নিচে রেশমী পিরহান-এর জেব থেকে একখণ্ড তালপত্র বার করে নিরীক্ষণ করেন তভ্রোল; 'ভাদ্রপদ শুক্লাদ্বাদশী, মিথুনের তিন পাদ।' তালপত্রের কৃষ্ণ-রেখাগুলির ওপর বার বার আগ্রহ-দৃষ্টি বুলিয়ে আবার পুর্ব-আকাশ পানে চেয়ে দেখেন। পশ্চিমের যাত্রী ম্লান সূর্যের বিদায়ের অপেক্ষায় থেকে পুবের চাঁদ অতি সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছে! তবে কি মিথুনের সিতারাই উদীয়মান? কিন্তু কোথায়? পাশে উপবিষ্ট ইশাককে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি তো হিন্দু? বলতে পার আজই হিন্দুর ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশী তারিখ কি না?"

হিন্দু! চমকে ওঠেন গায়ক। তাহলে কি সুলতান আমাকে চিনেছেন? তাহলে···! একটু থেমে সংযতকণ্ঠেই ইশাক বলেন—"একসময়ে ছিলাম বটে, জাহাঁপনা, কিন্তু আজ আর হিন্দুদের তারিখের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।"

অন্যমনা তভ্রোল শুনেও হয়তো শুনতে পান না গায়কের কণ্ঠ, দেখেও দেখেন না তাঁর বিশুষ্ক হাসি। আবার আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন—"বলতে পারো? মিথুনের সিতারা কয়পাদ উত্তীর্ণ হয়েছে?"

কুণ্ঠিতকণ্ঠে গায়ক জবাব দেন—"ম্যা মেহর নিয়ে মগজ চালাবার সুযোগ পাইনি জাহাঁপনা। দারিদ্র্য আর সঙ্গীতই মগজ পঙ্গু করেছে।" আবার বিকৃতহেসে সভয়ে তভ্রোল-এর মুখের 'পরে চেয়ে দেখেন।

গায়কের মুখের পানে গভীরদৃষ্টিতে চেয়ে তভ্রোল বলেন—"ধর্ম ত্যাগ করে ভালো করনি ওস্তাদ! পিতৃধর্ম পরিত্যাগীর আত্মবিশ্বাসও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার জীবনে কোনো বিশ্বাসই কায়েম হয় না। অবিশ্বাসীর জীবন একান্ত দুর্বিসহ।"

শিবির স্থাপিত হয়েছে। হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নেমে নিরাশ অবসন্নদেহ টেনে

নিয়ে চলেন তভ্রোল। নিকটে অশ্বপদধ্বনি শুনে আবার থমকে দাঁড়ান। খুশিমুখে দৌড়ে আসেন সালারে-ফৌজ। কুর্ণিশ করে বলেন—"জাসুস্ সংবাদ এনেছে জাহাঁপনা। অঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ গৌড় পুণ্ড্র সর্বত্র দিল্লীশ্বরের লোক ছুটেছে। তবু আমাদের সন্ধান করতে পারেনি। বলবন স্বয়ং জাজনগর সীমা পর্যন্ত এসে খোঁজ না পেয়ে জাহাঁপনার সর্-এর জন্য লক্ষ স্বর্ণদিনার কবুল করে আবার লখ্নৌতির পথে ফিরে চলেছেন। মালেক বারবক বনের অদূরে থানা করেছেন শুনছি। যোগ্য লোক রেখে যাব, আমরা নদী উত্তীর্ণ হলেই—বারবক-এর থানায় আগুন দেবে।"

সালারে-ফৌজের মুখের 'পরে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তভ্রোল। কোনো কথা তার কানে গিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। খানিক পরে আকাশের পুব থেকে পশ্চিম একবার বিষণ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে গম্ভীরপায়ে খাস ডেরায় প্রবেশ করলেন তভ্রোল।

খাস ডেরার সামান্য গবাক্ষ দিয়ে সন্ধ্যার রক্তিম আভা অবন্তীমালার আননে পড়ে এক অদ্ভুত রঙ ধরেছে। ঝলমল করছে নাকের নথ ও বেশরের মণি।

বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন চোখে বসে থাকবার পর স্থির সজলচোখে অঞ্জলি পেতে উঠে দাঁড়ান তভ্রোল। অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করেন—"আর মাত্র একটি রাত্রি! এটুকু সময় তোমার প্রভাব দিয়ে রক্ষা কর প্রেয়সী! তোমার মঙ্গল-দৃষ্টি এত দূর পথ নির্বিঘ্নে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। আর শুধু এই নদী পার হওয়াটুকু বাকী! এই মহানদী উত্তীর্ণ করে দাও সিতারায়ে মশরিক!'

অস্তগামী সূর্যের রশ্মি আড়াল করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এক অস্পষ্ট ছায়া। গবাক্ষের বাইরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ভিতরে দৃষ্টিপাত করেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বর্মাবৃত মূর্তি। স্থির দৃষ্টি মেলে দেখেন খস্ খস্ আত্তরে-সিক্ত পলিতায় আগুন জ্বেলে শায়িতা রমণীর পায়ের কাছে রাখেন তভ্রোল। কর্পূরের মালা তুলে নিয়ে চোখের জল মুছে বলেন—"এই আমার শেষ কর্পূরের মালা প্রেয়সী।"

গবাক্ষপথে নির্নিমেষে শায়িতার দিকে চেয়ে আগন্তুক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। এ সে কি দেখছে! কাকে দেখছে। এ যে তাঁরই আকাঙ্ক্ষিতা—'অবন্তীমালা!'

অবন্তীমালার আরো নিকটস্থ হয়ে নতজানু তভ্রোল করুণকণ্ঠে বলেন—'সুলতান মুঘীষ আজ বনবাসী ভিক্ষুক। এখন আর সামান্য কর্পূরের মালা সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার যদি তক্ত্ ফিরিয়ে দাও প্রেয়সী, গড়বো তোমার সোনালী মহল। পরিয়ে দেব মোতির মালা! প্রেয়সী! অবন্তীমা……'

হঠাৎ বস্ত্রাবাসের অপরদিকের আচ্ছাদন তুলে দ্রুত প্রবেশ করে কৃষ্ণ বোরখাবৃতা হামিদা। তঘ্রোল-এর নিকটস্থ হয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলে—"জাহাঁপনা! শীঘ্র পলায়ন করুন! থানায় শত্রু প্রবেশ করেছে!"

চমকে ওঠেন তঘ্রোল। অঙ্গুলিচ্যুত হয়ে ভূমিতে লোটায় মালা। সন্ত্রস্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন—"শত্রু! কোথায়?"

নিঃশব্দে আঙুল তুলে গবাক্ষের দিকে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হামিদা ভয়ে দ্রুত ছুটে পালায়।

গবাক্ষপথে চেয়ে দেখেন তঘ্রোল। কানে আসে বস্ত্রাবাসের অতি নিকটে একাধিক অশ্বের দ্রুত পদধ্বনি।

নিরস্ত্র, বর্ম-শিরস্ত্রাণহীন তঘ্রোল-এর বুঝি ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে। কিন্তু তন্মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে অস্ত্র বর্মে সজ্জিত হবার উদ্দেশ্যে পাশের বস্ত্রাবাসের দিকে চলতে গিয়েই থেমে যান। দেখেন বস্ত্রাবাসের সম্মুখ দুয়ার দিয়ে ভেতর প্রবেশ করছে বর্মাবৃত এক মূর্তি। অবন্তীমালার শয্যার নিকট গিয়ে মূর্তিটি একবার দাঁড়ায়। তঘ্রোল-এর যেন আর নড়বারও ক্ষমতা নেই। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে চিৎকার করে ওঠেন—"কে?"

কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর নেই।

তঘ্রোল হয়তো জানতেন না যে, ইতিহাস বড নির্মম। বড় হৃদয়হীন! তার কাছে ফকিরের মযাদা আমীরের মর্যাদার চেয়ে কিছু কম নয়! সম্মান অসম্মানের তুল্যমূল্য বিচারে সে বড় নিষ্ঠুর। যে বিজয়ী, সে জয় করেও হয়তো পরাস্ত হয়। আবার পরাস্ত হয়েও কেমন ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। তিনি জানতেন না যে, সুদূর দিল্লীর দৃষ্টিতে যে তঘ্রোল বিশ্বাসঘাতক, সেই দিল্লীর বাদশাকেও একদিন আবার বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়। তিনি জানতেন না যে, যে-অবন্তীমালার রূপের মদিরায় তিনি উন্মাদ, সেই অবন্তীমালাই হয়তো একদিন ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। যখন তিনি থাকবেন না, তখনও সে থাকবে। তখনও ওই প্রশান্ত নিঃশঙ্ক দৃষ্টি দিয়ে সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুত্থানের মূক সাক্ষী হয়ে থাকবে।

হঠাৎ যেন কিসের শব্দে তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। কি হলো? কি হলো? সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ তীর এসে লাগলো তাঁর শরীরে। মুখ দিয়ে কথা বলতে গেলেন। কথা বেরুলো না। শুধু বললেন—'অবন্তীমালা—'

অবন্তীমালা নিরুত্তর। সমস্তই নিরুত্তর।

আর তঘ্রোল? তঘ্রোল-এর কণ্ঠ চিরদিনের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

চন্দ্রাতপ-তলে তঘ্রোল-এর স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে উজ্জ্বল খুশিমুখে সেনাপতি মুগহুরের প্রতি চেয়ে বলবন বলেন—"আজ থেকে তোমার নাম—তঘ্রোল-ই-কুশ।"

সিংহাসন থেকে নেমে নিজ কণ্ঠের মোতির মালা খুলে পরিয়ে দেন মুগহুরের কণ্ঠে—।

অনেকের ঈর্ষা জাগিয়ে সমুজ্জলমুখে সাহঙ্কারে নত হয়ে কুর্ণিশ করেন মুগহুর। বলেন—"বান্দা ও বান্দার বাহুবল আজ ধন্য হলো জাহাঁপনা।"

তারপর নিজের আর একজন সুযোগ্য সেনাপতি বারবক-এর প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি তুলে বলবন বলেন—"তোমার ইনাম অবহোদের কোতোয়ালী। যাও প্রকাশ্য রাজপথে বাজা-বহর নিয়ে শয়তান তঘ্রোল-এর তকসির ইস্তাহার দাও। গত তিন সাল দিল্লীর তকৃত উত্যক্ত রেখেছে শয়তান। তিন বছর পরে বাঙলা শান্ত হলো। বাঙলার গরম জোয়ানরা দেখুক বলবন-এর ইনসাফ! বলবন-এর রাজ্যে আসামীর সাজা ও ইমানদার-এর ইনাম দুই-ই বরাবর।"

অবশেষে নিজের পুত্র বগড়া খান-এর প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে আদেশ করেন—"তঘ্রোল-এর তামাম দোস্ত, রিস্তাদার, ওয়ালেদ, সেপাহী, আমীর—বাজারের পথে কোতল হবে। ইন্তেজম কর। আমার সময় অল্প। বাঙলার মসনদ নিরঙ্কুশ করে জল্‌দি দিল্লী ফিরে যেতে চাই। দেখো তঘ্রোল-এর শুভাকাঙ্ক্ষী একটি জানও যেন না পালাতে পারে। এই কোতলের বার্তা যুগ-যুগান্ত ধরে যেন বলবন-এর ইনসাফ স্মরণ করিয়ে দেয়। আর জেনে রেখো—এর পর দিল্লীর সিংহাসনের বিরুদ্ধে মাথা তোলবার সাহস যেন বাঙলার আর না হয়! এবার বাঙলার মসনদ তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। বাঙালার শস্য-শ্যামল ভূমির আয়েস কায়েম করে মগজ যেন অশান্ত না হয়, দেখো। বলবন-এর ইনসাফ-এ পুত্র, প্রতিবেশী দুশমন প্রত্যেকেরই সাজা অভিন্ন। তঘ্রোল-এর পরিণাম স্মরণ রেখো। আর স্মরণ রেখো—রাজার পক্ষে বিলাস রাত্রিকালের নক্ষত্রের শোভার মতো। যার মধ্যে কেবল সুষপ্তির বীজ নিহিত। রাজার বিলাস প্রজার মনোরঞ্জনে—মগজ লুপ্তির জন্য নয়।"

বগড়া খান নতশিরে কুর্ণিশ করেন। উত্তর দেন—"সম্রাটের সমস্ত উপদেশ পালনে বান্দার ত্রুটি হবে না।"

বারবক-এর প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বলবন আবার জিজ্ঞাসা করেন—"তঘ্রোল-এর থানা থেকে সব জীবন্তদের ধরে এনেছো তো?"

নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে বারবক।

উত্তেজিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেন বলবন—"কেউ কি পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে বলে সন্দেহ কর?"

ভীত নতমুখে বারবক বলেন—"হ্যাঁ জাহাঁপনা। একটি মুসলমান-বেশী হিন্দু গায়ক পলায়ন করেছে।"

—"মুসলমান-বেশী হিন্দু !"

—"হ্যাঁ জাহাঁপনা ! আর পলায়ন করেছেন তব্রোল-এর পুরাতন অনুচর, জাহাঁপনার পথ-প্রদর্শক কুলিশ খান।"

—"কুলিশ খান ? পলায়ন করেছে ? কেন ?"

—"সেই দুশ্চিন্তাই তো অধিক পীড়া দিচ্ছে জাহাঁপনা। কুলিশ খান তব্রোল সন্ধানে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তব্রোল-এর থানায় উপস্থিত হয়ে আমরা যখন সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত সেই অবকাশে তিনি একটি প্রকাণ্ড পেটিকা বস্ত্রাবৃত করে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে পলায়ন করেন এবং তাঁর পিছু পিছু অপর এক অশ্বপৃষ্ঠে সেই হিন্দু গায়ক তাঁকে অনুসরণ করে। কুলিশকে ও সেই হিন্দুকে পলায়ন-রত দেখে আমাদের হাবিলদার উজবক আটজন সিপাহীসহ তাদের পিছু নেয়, কিন্তু তাদের অশ্ব অধিক বেগবান থাকায় তাদের ধরতে পারেনি। সাতজন এখনও তাদের অনুসরণ করছে। একজন খবর নিয়ে এই মাত্র ফিরে এসেছে।"

—"ফিরে এসেছে কেন ! মরতে পারেনি ! কিন্তু সে ব্যক্তি যে মুসলমান-বেশী হিন্দু সে কথা জানলে কি করে ?"

—"থানার অপর লোকেরাও সে কথা কবুল করেছে। এই গায়ক তব্রোল-এর দরবারে নতুন এসেছিলেন। তিনি কখনও নমাজে আসতেন না, তাই লোকে সন্দেহ করে তিনি হিন্দু ছিলেন।"

—"হুঁ।" গম্ভীরমুখে ক্ষণেক চিন্তা করে জানতে চান বলবন—"কোনদিকে পলায়ন করেছে কুলিশ ?"

—"দক্ষিণদিকে জাহাঁপনা। কিন্তু এইমাত্র যে ফিরে এসেছে সে খবর দিচ্ছে—বনের পথে অশ্ব ছেড়ে দিয়ে মহানদীতে নৌকো নিয়ে দক্ষিণের পথ ধরেছেন কুলিশ। আরও বিচক্ষণ লোক পাঠিয়েছি জাহাঁপনা। চতুর কুলিশের সর্ অথবা কুলিশ শীঘ্রই জাহাঁপনার পয়জরে উপস্থিত হবে।"

চিন্তিতমুখে বলবন বলেন—"আরও অধিক সৈন্য নিয়োগ কর। পর্বত ও নদীবহুল দাক্ষিণাত্যের পথ উত্তীর্ণ হওয়া যদিও কঠিন, তবু বিশ্বাস রাখা যায় না অবিশ্বাসী ধূর্তের কার্য-কৌশলে।" বলবন খুবই ভাবিত হয়ে পড়েন—তব্রোল-এর প্রতি বিদ্বেষের কারণ কুলিশ বলেনি। কোনো গূঢ়-সম্পত্তি হয়তো সঞ্চিত ছিল তব্রোল-এর তোশাখানায়। তাই-ই গায়েব করে পালিয়েছে শয়তান !

হঠাৎ বগড়া খানের প্রতি চেয়ে বলেন—"বাঙলার মসনদে তোমায় কায়েম করে আগামী পরশুই আমি দিল্লী রওয়ানা দেব। তুমি বাঙলার শৃঙ্খলা সুবিন্যস্ত করে আমাকে যথাসময়ে জানাবে। কুলিশের এবং সেই পলাতক হিন্দুর সর্ যে করেই হোক সংগ্রহ করে অবিলম্বে দিল্লীর দরবারে পাঠাবে। কুলিশ অত্যন্ত ধূর্ত। আপন রাজ্যের ধূর্ত শৃগাল স্বরাজ্যে থাকার চেয়ে

পররাজ্যে স্থান পেলে অধিক বিপজ্জনক। জীবিত কুর্নিশ অথবা মৃত সব্ যে কোনো কিস্মত-এ সংগ্রহ্ করবে।"

তারপর বারবক-এর দিকে চেয়ে আদেশ করেন—"যাও, এখন তোমার প্রথম কর্তব্য তত্রোল-এর ওয়ালেদ বিনাশ। বাজারের দুইধারে দেড় ক্রোশ পরিমাণ কোতলখানা তৈয়ার কর। এক্সঙ্গে হাজার লোক কোতল হবে। তাদের আর্ত চিৎকার যেন বহু সাল পর্যন্ত বঙ্গবাসীর হৃদয় থেকে মুছে যেতে না পারে। দিল্লী দূর, দিল্লীর সুলতান বৃদ্ধ, এমন আশ্বাস যেন তাদের মনে আর উচ্ছৃঙ্খলতা না জাগাতে পারে। যাও।"

কুর্ণিশ করে বারবক চলে যান।

বগড়া খান-এর প্রতি চেয়ে বলবন আবার বলেন—"তুমিও স্মরণ রেখো দিল্লীর সুলতানের পক্ষে ভারতের কোনো অংশই দূর নয়। আরও স্মরণ রেখো পিতা বলবন-এর পুত্রস্নেহ প্রবল থাকলেও সুলতান বলবন-এর ইন্সাফে বিদ্রোহী পুত্রের শাস্তি বিদ্রোহী ক্রীতদাসের চেয়ে এক তিলও কম নয়।"

ডুম্ ডুম্ গুরু গুরু ঝাঁই ঝাঁই ঝম্! নগর কাঁপিয়ে কোতলের দামামা করতাল বেজে ওঠে। আর্তরবে পথে পথে ছুটে ফেরে নগরবাসী। আমীর-প্রাসাদে ওঠে ভীত ক্রন্দন-রোল!

তত্রোল-এর অন্দরমহল-এর কোণে কোণে সন্ধান করে সান্ত্রী-কোতোয়াল কে আছে আর তত্রোল-এর শুভাকাঙ্খিনী? খোজা-সান্ত্রীরা সবলে টেনে আনে ভীত ক্রন্দনরতা বিবশা অন্দরবাসিনীদের। এক পাল্কিতে পাঁচ-সাতজন করে ঢুকিয়ে পাল্কির দ্বার বন্ধ করে দেন সান্ত্রী-কোতোয়াল। গুনে গুনে ছাড়েন পাল্কি।

তারপর সুরু হলো সে এক বীভৎস নারীমেধ-অধ্যায়। এক একটি সুন্দরী এসে বধ্যভূমিতে দাঁড়ায়, আর উচ্চ বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র জনপদ। একদিন সর্বগ সূর্যও যাদের নাগাল পায়নি, সেদিন তারাই এসে দাঁড়াল উন্মুক্ত আকাশের তলায়। বিজয়ী সৈন্যদলের লুব্ধ-দৃষ্টির আগুনে তারা বুঝি হত্যার পূর্বেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একদিকে ক্রন্দন—ক্রন্দনের আর্তরোলে বাতাস পঙ্কিল হয়ে উঠলো প্রতি মুহূর্তে, অন্যদিকে আনন্দের বীভৎস উল্লাস! সে-কলরোলে বাঙালীর ইতিহাস লজ্জায় বুঝি অধোবদন হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উল্লসিত দামামার শব্দে সে-ইতিহাস সম্বিত হারিয়ে ফেললো কয়েক শতাব্দীর জন্যে। জীবন, মৃত্যু, জয়, পরাজয়, প্রতিহিংসা, প্রতিরোধ সমস্ত একাকার হয়ে গেল। আর জীবনের চরম উত্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষও তার পরম জিজ্ঞাসার খেই হারিয়ে ফেললে।

সকলের শেষে অন্দরের চোরকুঠুরি থেকে চোখ মুছে শান্ত মুখের 'পরে

বোরখা ঢেকে ধীরপায়ে এসে কোতোয়ালের পেছনে দাঁড়ালো মামুদা। জীবনে তার বিতৃষ্ণা এসেছে। আর সে বাঁচতে চায় না।

পায়ের শব্দে চমকে ফিরে কোতোয়াল জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি ?"

—"সুলতান মুঘীষ-উদ্-দীন্ তগ্রোল-এর···।" আর বলা হয় না। কাজ কি মুখ খুলে ? বাঁদী বললে যদি আবার উপেক্ষায় ফেলে যায়। বধ্যভূমির সামনে পাল্কি থেকে নেমে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো মামুদা।

দিনের শেষে তগ্রোল-এর অন্দরে রঙমহল-এ বসে হুকুম দেন বলবন—"অন্দরের মামুদা বাঁদীকে তলব দাও।"

অন্দর-বাহির খুঁজে বহুক্ষণ পর ভীতমুখে প্রহরী এসে জানায়—"তিনি আজ স্ব-ইচ্ছায় কোতল হয়েছেন জাহাঁপনা।"

—"কোতল হয়েছেন! কেন ? তাঁকে তো ইনাম দেব বলেই হুকুম দিয়েছিলাম !"

—"তা তো কারো জানা ছিল না জাহাঁপনা! নিজ ইচ্ছায় তিনি অপর অন্দরবাসিনীদের সঙ্গে কোতলখানায় উপস্থিত হয়ে নিজের গর্দান রেখেছেন। জমাদারের খাতায় লেখা রয়েছে—"মুসম্মৎ মামুদা, মুঘীষ-উদ্-দীন্ তগ্রোল-এর সুলতানা।"

—"হুঁ। আচ্ছা যাও।"

স্তব্ধ হয়ে বসে বৃদ্ধ বলবন ভাবেন।—আশ্চর্য! নারীর মন—শত্রু-দুর্গের মতোই দুর্ভেদ্য !—প্রবেশ করা যেমন কষ্টকর, আবার বেরিয়ে আসা ততোধিক দুঃসাধ্য !

প্রাণপণে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চলেছেন কুলিশ।

পিছনে ছুটে আসছে একাধিক অশ্বের পদধ্বনি! নিকটে! আরও নিকটে! নদীতীর দিয়ে শিক্ষিত অশ্ব ছুটিয়ে চলেছেন সুপটু অশ্বারোহী। শ্রান্ত অশ্বের লালার সঙ্গে যেন ধূম নির্গত হচ্ছে! এইবার হয়তো শুয়ে পড়বে তিন রাত্রি তিন দিনের শ্রান্তি নিয়ে! কিন্তু···নিষ্ঠুর মুগদুরের সৈন্য তার চেয়েও নিষ্ঠুর! পশ্চাৎধাবনে বিরত হচ্ছে না।

ঐ দেখা যায় ঘন কৃষ্ণ রেখা! হয়তো বন! হে খোদা—! তোমার করুণা অপার! কিন্তু···পিছনে দেখা যায় ঘন অশ্বপৃষ্ঠে অনুসরণ করে ধেয়ে আসছে একজন! অত বেগে কে আর আসবে মুগদুরের অনুচর ভিন্ন! তবে বনের আবরণ ভিন্ন তো আত্মগোপনের আর কোনো উপায় নেই !

বনে প্রবেশ করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামা মাত্রই শুয়ে পড়ে শ্রান্ত অশ্ব। কিন্তু

কুলিশের শ্রান্তি নেই। প্রাণ রাখতে হলে দেহের শ্রান্তিকে যে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। অশ্বপৃষ্ঠে বসে মুহূর্তের জন্য ভাবেন—ফেলে যাব? কিন্তু না—অবন্তীমালাকে এতপথ সঙ্গে নিয়ে এসে আর তো ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে কুলিশ?

দূর থেকে অশ্বারোহীকে বনে প্রবেশ করতে দেখে অশ্বের বেগ দ্রুততম করে বনে প্রবেশ করেন অনুসরণকারী অশ্বারোহী মহম্মদ ইশাক। একবার পিছন ফিরে কান উঁচিয়ে শোনেন পিছনে আগত একাধিক অশ্বের পদধ্বনি। কে মরবে? অপহরণকারী? না তার অনুসরণকারী? হয়তো উভয়েই! কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের মরণের ভয়? হ্যাঁ, ভয় আছে বৈ কি? নইলে হরিশ্চন্দ্র কেন মহম্মদ ইশাকের আবরণে লুকিয়ে থাকতে চায়? মরে গেলে তো আর কার্য সিদ্ধি হবে না! অল্প পথ উত্তীর্ণ হলেই চোখে পড়ে আসন্ন-মৃত্যু অশ্বের যন্ত্রণাকাতর ছট্‌ফটানি! সেদৃশ্য বৈদ্য হরিশ্চন্দ্রের সহ্য না। কিন্তু সময় নেই। দেরী করলে হয়তো সব পণ্ড হয়ে যাবে। অপহরণকারী অশ্বারোহী এগিয়ে চলেছে—এর পর আর ধরা যাবে না। অশ্ব ছেড়ে দিয়ে ঘন বনের দিকে পদব্রজে অগ্রসর হন হরিশ্চন্দ্র। কিছুক্ষণ চলার পরই শোনা যায়—ভারী পায়ের চাপে শুকনো পাতার কাতরধ্বনি! ঠিক পথেই তাহলে চলেছেন হরিশ্চন্দ্র!

কিন্তু খানিকদূর চলবার পর যেন দিকভুল করলেন। সব যেন গোলমাল হয়ে গেল তাঁর। কোনও দিকে নিশানা খুঁজে পান না তিনি। কোথায় অশ্বারোহী! কোথায় কোনদিকে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তিনি টের পেলেন না। অবশেষে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে জ্ঞান ছিল না তাঁর। হঠাৎ যেন আবার পথের নির্দেশ পেলেন। পরিশ্রান্ত হয়ে একটা বড় গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন! সেখান থেকে অদূরে অপর এক বৃক্ষের নিচে সৈনিককে দেখতে পেলেন। তাঁর সামনে উন্মুক্ত কাষ্ঠপেটিকার মধ্যে শায়িতা অবন্তীমালা। অবন্তীমালা যেন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। দেহ পুষ্পাচ্ছাদিত।

মালার কর্পূর সব নিঃশেষ হয়েছে, শুকিয়ে গিয়ে ঝরে পড়ছে ফুলদল। খালি সুতায় শুধু ঝুলছে সল্‌মা গুচ্ছ। সূর্যের আলোয় নির্লজ্জ সলমার চমক সহ্য করতে না পেরেই বুঝি নিষ্ঠুর হাতের টানে সে-সুতা ছিঁড়ে ফেলছে সৈনিক।

হরিশ্চন্দ্র অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন সৈনিক বলছে—'এইযে তভ্রোল এর মালা—এতো সুলতানের ঐশ্বর্যের চমক! এ কি প্রেম! না সুলতানী বিলাস! সুলতানের সুলতানী অহঙ্কারকে ইস্তমুরার করবার জন্যই তোমার এ-দশা করেছেন তভ্রোল। কিম্বা হয়তো দেখাতে চেয়েছেন জহান্-এর মানুষকে—অসম্ভবকে সম্ভব করার গৌরব!'

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে আরও নিকটে এসে আড়ালে দাঁড়ালেন হরিশ্চন্দ্র। কি করছে সৈনিক! সুলতানের হেরেমে এসে, কত পতঙ্গই না জানি এ-ভাবে দগ্ধ করেছে অবন্তীমালা। হরিশ্চন্দ্র শুনতে পাচ্ছেন অস্ফুটকণ্ঠে তখনো সৈনিক আপন মনেই বলে চলেছে—'আমার ভালোবাসাকে অবহেলায় ফিরিয়ে দিয়ে সিংহাসনের মোহে রক্ষা করতে পেরেছ কি পরম প্রেমিক সুলতানকে? আমি ফিরে এসেছি। ভুলিনি আমার প্রতিজ্ঞা। ফিরেছি, কিন্তু প্রণয়ীরূপে নয়, শত্রুরূপে! আমার বুকের জ্বালা কি তোমার ওই হরিণ চোখ দেখতে পাচ্ছে? আজও কি তেমনি উপেক্ষায় ঐ পেলব ওষ্ঠে হাসির স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে অলক্ষ্যে হাসছো?' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে অবন্তীমালার ওড়নার প্রান্ত চেপে ধরেন—'তোমার সে অপমানের জ্বালা আজও জলন্ত প্রস্তরের মতো পেশীর নিচে ধক্ ধক্ করে তুর্কী কুলিশের বুকে জ্বলছে! আর আমি! আমার এই বুকের আগুনের মতোই তিলে তিলে তোমার ঐ সলমা-ঢাকা বুক পাতার আগুনে আজ পুড়িয়ে ছাই করে তবে ফিরে যাব।'

হরিশ্চন্দ্র চমকে উঠলেন।

আরো সন্তর্পণে একটু এগিয়ে গিয়ে চেয়ে দেখলেন সৈনিকটির মুখের দিকে। মনে হলো সে যেন ক্লান্ত। ভাবলেন—এই তো সুযোগ। ক্লান্তির অবসাদে সৈনিক নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেই তিনি অবন্তীমালাকে নিয়ে পলায়ন করবেন। অদূরস্থিত অবন্তীমালাকে লক্ষ্য করে স্বগতোক্তি করেন—তোমায় আমি সারিয়ে তুলবো অবন্তীমালা! আজকের চেতনাহীন ওষ্ঠাধর চুম্বনের স্পর্শে উষ্ণ করে তোমাকে বুকে ধরবো! এ হতভাগার ওপরে তোমার অসীম করুণা।

খানিক পরে সৈনিকটি পেটিকা তুলে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। হরিশ্চন্দ্র ধীর পায়ে তার অনুগমন করলেন।

চলতে চলতে তারা আরও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। বনের ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি আদৌ প্রবেশ করতে পারছে না। চতুর্দিক পাতলা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দৃষ্টি পদে পদে ব্যাহত হতে থাকে। পথ-চলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

বনের অস্পষ্ট আলোকে সৈনিকটির দিকে চেয়ে মনে মনে প্রশ্ন করেন হরিশ্চন্দ্র, এ-ব্যক্তি কিভাবে অন্তঃপুরবাসিনী অবন্তীমালার সাক্ষাৎ পেল! হয়তো বা তত্রোল-প্রাসাদেরই কেউ। কিন্তু অঙ্গে রয়েছে বলবন-এর হাবিলদারের বেশ! নাকি সেও ছদ্মবেশ! কিন্তু তত্রোল-প্রাসাদে তো সাক্ষাৎ মেলেনি! হয়তো বা তত্রোল-এর ভয়ে তারই মতো সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সুযোগ পেয়েই অবন্তীমালাকে নিয়ে পলায়ন করেছে ধূর্ত! কিন্তু ওকে নিয়ে সৈনিক কি করবে?—তবে…কি…হেকিম! হরিশ্চন্দ্রের বিদ্যা…না না, হরিশ্চন্দ্র

তা হতে দেবে না। আর ছাড়া যায় না—ছাড়তে পারবে না হরিশ্চন্দ্র। পালাবে, অবন্তীমালাকে নিয়ে পালাতেই হবে। এ পাপিষ্ঠকে হত্যা করে পালাতে হবে। বেদনায় ভারী হয়ে আসে হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন।

বনপথ ক্রমেই বন্ধুর হয়ে ওঠে।

দিন রাত যেন তাদের দু'জনের চোখে একাকার হয়ে গিয়েছে। কখন সূর্য ওঠে কখন অস্ত যায় ঠিকানা রাখে না কেউ। একজন বোঝার ভারে ক্লান্ত অবসন্ন আর একজন অনুসরণ করে করে পরিশ্রান্ত।

এক স্থানে এসে হরিশ্চন্দ্র দেখলেন সামনের সৈনিকটি পেটিকা নামিয়ে রাখলে। তারপর হয়তো বিশ্রামের আশায় পাশেই শয়ন করলে। এই তো সুযোগ, এই তো উপযুক্ত সময়। সন্তর্পণে হরিশ্চন্দ্র সেদিকে অগ্রসর হলেন। তারপর একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ শুনলো সৈনিকটি বলছে—যেন অবন্তীমালাকেই উদ্দেশ করে কিছু বলছে :

—'জানে না অবন্তীমালা, কেউ জানে না। এ বেদনা বুকে বয়ে না বেড়ালে কেউ বুঝবে না। জানবে না কী সে-ব্যথা। মানুষ জানবে না এ-ব্যথার ইতিহাস। বিরহীর দীর্ঘশ্বাসই একমাত্র কুলিশ খান-এর এ বেদনার্ত ইতিহাসের ভাষা দিতে পারে।'

কুলিশ খান! তড়িৎ-প্রবাহের মতো হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চারিত হয়। সেই শয়তান! যার জন্য আজ প্রাণ হারিয়েছে কুশীগ্রাম! মুছে গিয়েছে কুশীভট্টের নাম! জীবন দিয়েছে রুদ্রতাপ! মরে বেঁচে আছে হরিশ্চন্দ্র! সেই কুলিশ খান! সমস্ত শরীর বার বার উত্তপ্ত রক্তের উত্তেজনায় কম্পিত হতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর আবার ভেসে আসে কুলিশের কণ্ঠস্বর—'কিন্তু···কেন যে তোমাকে বয়ে নিয়ে এলাম অবন্তীমালা, ভেবে দেখলে আজ আমিও যেন ঠিক বুঝি না। তম্রোল-এর থানায় যখন অলক্ষ্যে চোরের মতো উপস্থিত হলাম তখন কিন্তু তোমাকে এইভাবে দেখতে পাব আর এমন করে চুরি করবো সে-সম্ভাবনা কল্পনায়ও ছিল না। তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তম্রোল-এর সর্-এর পরিবর্তে লক্ষ মুদ্রা উপার্জন। তাম্বুর খিড়কি দিয়ে তম্রোল-এর সর্ তাক্ করে তীর ছুঁড়তে গিয়ে পুজারী তম্রোল-এর বিহ্বল বিবশকণ্ঠে শুনলাম—'অবন্তীমালা!' শুনে নেমে এল হাত। দেখলাম তোমাকে—মুখে ঠিক তেমনি বিদ্যুৎঝলকানো হাসি! তারপর কি হলো জানি না—অস্ত্রের ঝন্ঝনি হৈ হৈ শব্দের মধ্যে কে যেন আমায় ঠেলে দিল তাম্বুর মধ্যে—গিয়ে দাঁড়ালাম তোমার পায়ের কাছে। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তাম্বুতে ঢুকছে সিপাহীরা। উন্মত্ত সান্ত্রীরা ছিঁড়ে নিতে চায় নাকের মণির বেশর, মোতির নথ! সইলো না। তোমার অঙ্গে সামান্য সিপাহীর অস্ত্রাঘাত

সইতে পারলাম না। কোনো মতে তলোয়ারের আবরণে রক্ষা করে নিয়ে এলাম। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল এতদিনে বোধ হয় ফিরে পেলাম দীর্ঘদিনের কামনার ধন। অশ্বপৃষ্ঠে নিয়ে ছুটলাম। ভাববার তখন আর অবকাশ ছিল না। পিছনে ছুটে আসছে বলবন-এর সিপাহী। কিন্তু এখন তোমাকে ফেলে যেতে বুকে বাজে অবন্তীমালা, বয়ে চলতে পিঠে লাগে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুলিশ নিস্তব্ধ হয়ে যান।

অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার আর নিস্তব্ধতায় একমাত্র অবিশ্রান্ত ঝিল্লির কলরবে আর মিটমিটে জোনাকীর আলোতে প্রাণের সাড়া মেলে।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন হরিশ্চন্দ্র।

হঠাৎ শুকনো পাতার সর সর শব্দে সচকিত হয়ে ওঠেন, দেখতে পান তর্‌তর্ করে এগিয়ে আসছে দু'জোড়া অগ্নিবিন্দু! নাগ-দম্পতি! নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নাসিকা গর্জন করছে ক্লান্ত কুলিশ। কুলিশের ঘুম ভাঙাবার জন্য চীৎকার করতে উদ্যত হয়েই আবার থেমে যান হরিশ্চন্দ্র। না, আর একবার ভাগ্যের পরীক্ষা হোক। অদূরে রক্ষিত কাষ্ঠপেটিকার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন। একবার চেয়ে দেখেন কুলিশের দিকে। মানুষের আভাস পেয়ে থমকে থেমেছে নাগ-দম্পতি। অনাকাঙ্ক্ষিত বাধায় ফোঁস ফোঁস করে জানাচ্ছে রুদ্ধ আক্রোশ। কোমরের বিষারী মূলটি খুলে হরিশ্চন্দ্র একবার ঘষে নেন। ওষুধের গন্ধে উদ্যত ফণা নত করে নাগ-দম্পতি। আবার তেমনি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে পেটিকাসুদ্ধ অবন্তীমালাকে দুইহাতে বুকে তুলে নেন। যাবার সময় বিষারী মূলের খানিকটা কুলিশের পাশে রেখে যান।

সন্তর্পণে আঁধার-পথ অতিক্রম করে চলেছেন হরিশ্চন্দ্র। পিছনে ফিরে দেখার আর সাহস নেই। চার পাশে ঝক্ ঝক্ করছে অসংখ্য অগ্নিবিন্দু!

অবশেষে গোদাবরী উত্তীর্ণ হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন হরিশ্চন্দ্র। না, আর ভয় নেই! নদীতীর উত্তীর্ণ হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেন। এই সেই দেবগিরির পথ! যেখানে প্রদীপ্ত সূর্যের কিরণের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল জ্ঞান-গরিমা, কলা শিল্প ভাস্কর্য। রাজার অনুগ্রহে আর প্রাচুর্যের শান্ত আশ্রয়ে বসে প্রতিদিন নতুন বার্তা শুনিয়েছেন, হিমাদ্রী, বোপদেব, জ্ঞানেশ্বর। পাথরের বুক কেটে গড়ে উঠেছে অপূর্ব শিল্প ইতিহাস! পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় পথের কিনারায় আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে চৌলক্য বংশের বিশ্রুত শাসক প্রথম কৃষ্ণের ভাস্কর্য লিপ্সার! তাঁর সৌন্দর্য পিপাসার! নির্মম পর্বতের দেহে কে দেখেছে এই সুনিপুণ সৌন্দর্য-রেখা! কে গড়তে পেরেছে পর্বত কেটে এমন ইন্দ্ররথ! কী সুদূর প্রসারী কল্পনা! কত ধৈর্য, কত তিতিক্ষা সে কল্পনার রূপ সম্পাদনে!

বহু দূরে দেখা যায় রাজধানীর সৌধমালার স্বর্ণচূড়া! প্রখর সূর্যের আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে!

ছল্ ছল্ করে বয়ে চলেছে তপতী নদী, এই নদী উত্তীর্ণ হলেই জীর্ণনগর।

জীর্ণনগর পাশে রেখে পর্বতের বুকে ঘন অরণ্যের আড়ালে একটি গুহামুখে এসে পিঠের বোঝা নামালেন হরিশ্চন্দ্র। চারদিকে চেয়ে দেখে মুগ্ধ হলেন। এই তো বাস করবার যোগ্যস্থান।

গুহামুখের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণ ঝরনা ধারা। ঝরনায় স্নান সেরে এসে পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধতায় গুহাপ্রস্তরে পিঠ রেখে বসেন হরিশ্চন্দ্র। চোখ বুজে শুনতে পান ঝরনার ছল্ছল্ হাসি! হ্যাঁ, অমনি করেই হেসে বেড়াবে অবন্তীমালা—অন্তী! তার সারা অঙ্গের রূপ আবার উদ্দাম হয়ে নেচে বেড়াবে এই সবুজ বনের ছায়ায় ছায়ায় পর্বতের কোলে কোলে! আর…আর তার পিছু পিছু সেদিনের মতোই হেসে ছুটে বেড়াবেন তিনি! এমনি করেই কল্পনার চিত্রে রং বুলিয়ে চলেন হরিশ্চন্দ্র!

সমস্ত দিন খুঁজে, নিত্য নানা ওষুধের গাছপালার মূলের বোঝা বয়ে আনেন বৈদ্য। প্রতিদিন বসেন মূলরস নিয়ে, বার বার কম্পিত হাত বুলিয়ে আনেন অবন্তীমালার শুষ্ক গণ্ডে। কিন্তু ইরাণী দাওয়াতে রক্ষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো পরিবর্তনই ঘটে না! থর থর করে কেঁপে ওঠে হাত, বিভ্রান্ত হয় মন। বহু কষ্টে আহরিত মূলরস ঢেলে ফেলে দিয়ে আবার উঠে পড়েন বৈদ্য।

পরদিন আবার মূল সঞ্চয় করেন সমান আগ্রহে। না, এবার পরীক্ষা হোক হাতের অঙ্গুলি কয়টি। কিন্তু মূলরস প্রস্তুত হলে আর সাহস থাকে না তাঁর। যদি বিফল হয়! তাহলে কি করে সহ্য করবেন? দিনের পর দিন এভাবেই চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বনফুলের মালা গেঁথে এনে পরান অবন্তীমালার গলায়। সজলচোখে বার বার অস্ফুট উচ্চারণ করেন—'আমি রুদ্রতাপ নই অবন্তীমালা—শ্বেতপদ্মের মালা দেবার সৌভাগ্য আমার হলো না। আমি সুলতান নই, তাই দিতে পারলাম না মোতি আর কর্পূরের মালা। আমি কুলিশ নই তাই দিতে পারলাম না নাগের চুম্বন। কিন্তু…যদি আজও দেখতে পাও, দেখো, আমার হৃদয়ের ভালোবাসার আগুন কারো চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

বনপথে চলমান কাঠুরিয়া ও শবর এক নতুন সন্ন্যাসীর অপূর্ব সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায়। নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে দিয়ে যায় দক্ষিণা ফল মূল।

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর কথা ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আশ্চর্য সাধনা! যাঁর দেবী এক অবিকৃত মানবী! হরিশ্চন্দ্র প্রতিবাদ করেন কিন্তু ভক্তিমার্গের দেশে এমন প্রতিবাদ নিষ্ফল। ক্রমে গুহার ওপরে পাথর কেটে গড়ে ওঠে মন্দিরের রূপ। সংগ্রহ হয় পুজার উপচার।

অবোধ ভক্তের মনরাখা পুজা করতে করতে সন্ন্যাসীর মনোপটে অবন্তীমালার শুষ্ক বিবর্ণ মুখ বুঝি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল দেবীরূপে প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

না, অবন্তীমালা আর নেই। তার জীবনদানের চেষ্টা বৃথা। কোনোও ওষুধের সাহায্যেই আর তার জীবনদান সম্ভব নয়। তদ্রোল-এর ইরাণী বৈদ্যের ইলমে অবন্তীমালা আর অবন্তীমালা নেই—সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতময়ী হয়ে উঠেছে।

ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হলো দেবী মূর্তি। অদৃশ্য হলেন মানবী। বৈষ্ণব ভক্তেরা শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারণ করলেন—'ইনিই রাধারাণী।'

গল্প শুনতে শুনতে মনে হলো সুদূর বাঙলার লখ্‌নৌতি থেকে যুগ যুগ পথ চলে হঠাৎ যেন থামলাম এসে সেই সিংহগড়ের পাদমূলে! আর মনে হলো: না, এ যবন মমি নয়, এমুখ সত্যিই রাধারাণীর—বড় অভিমানিনী, সোহাগিনী মেয়ে এ।

যুগ থেকে যুগান্তরে এই 'রাধারাণীই' যেন অন্তরের মর্মমূলে বসে অলক্ষ্য ইতিহাসের উত্থান পতন দেখে আসছেন আর প্রশান্ত দৃষ্টিতে বরাভয় দিচ্ছেন আমাদের!

আমরা আবার প্রণাম করলাম দেবীকে।

শব্দার্থ নির্ঘণ্ট

লখ্‌নৌতি — রাজমহলের পঁচিশ মাইল দূরে, রামাবতীর অদূরে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী তুরস্ক কবলিত হয়ে লখ্‌নৌতি নাম ধারণ করে।

খুৎবা — মঙ্গল কামনায় সম্মিলিত নামাজ।

বট — একখানি বস্ত্র ও একখানি উত্তরীয় প্রস্তুত উপযোগী সুতা।

বালাখানা — দ্বিতল অট্টালিকা।

পঁয়জর — পারস্য ভাষায় বিশিষ্ট লোকের বিশেষ পাদুকাকে বলে পঁয়জর কিন্তু এখন সাধারণ পাদুকা হিসাবেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

গুর্জরী পঞ্চম — গুর্জরী পঞ্চম রাগের তাল তুলনা করেই হয়তো নারীর চরণাভরণের এই নামকরণ হয়েছিল।

মসলন্দপোষ — জরিখচিত মখমল-মোড়া উপবেশন চৌকি।

চশমাশাহী — চশমা অর্থে নির্মল ফোয়ারা—কিন্তু চলিত ভাষায় স্বচ্ছতা বোধার্থে চশমা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

খিদ্‌মদ্‌গার — পরিচারক।

কপর্দকপুরাণ — কারো মতে রৌপ্যমুদ্রা। কারো মতে, ষোল গণ্ডা কৌড়ি।

"বাল কুমার ছঅ মুণ্ডধারী, উবাঅহীণা মুই এক নারী
অহং নিসং খাই বিসং ভিখারী গঈ ভবিত্তী কিলকা হামারী।" — ছয় মুণ্ডধারী বালক ছেলে আমার ছয় মুণ্ডে খায়, আর আমি একা উপায়হীনা নারী। আমার ভিখিরী স্বামী অহর্নিশ কেবল বিষ খায়। আমার কী গতি হবে।

"ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ণ থাহী॥" — ভবনদী গভীর, গম্ভীব বেগে বয়ে চলে, দুই তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নেই।

কারাবা — সুগন্ধি জলপাত্র।

দেমাক-ই-সুরৎ — জাফরাণ মিশ্রিত একপ্রকার চূর্ণ।

সিতারায়ে মশরিক — পুবের তারা।

মহ্‌তাব — জ্যোৎস্না।

পুশ্‌ত ইক্তদার — সীমান্ত শাসনকর্তা।

কুরসি-বরদারণী — আলবলা বাহিকা।

ধম্মিল্লস্তিলপল্লবস্তিষবর্ণস্নিগ্ধ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যনাগরবধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ॥" — কপালে কাজলের টিপ, হাতে জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দর শাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধ কেশ কবরীতে তিলপল্লব—পল্লী বধূদের এমন বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মন্থর করে আনে।

কাসিদা — স্বর্গদূতী।

উজিরে-আজম — প্রধানমন্ত্রী।

ভিভার-ই-শাহ — দুর্গ বা শহরের প্রাকার।

মুস্তাফিজ — রক্ষী।

সলিতা পাটী — সলিতা বা অপর কোন ছোটখাট জিনিস রাখবার জন্য এক রকম পকেটযুক্ত চিক। দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আজও পূর্ববঙ্গের অনেক গ্রামে সলিতা পাটীর ব্যবহার দেখা যায়।

মুসম্মৎ — স্ত্রীলোকের নামের আগে বসে; শ্রীমতীর অনুরূপ।

নকীব — যে সভায় সুলতানের নাম হাঁকে (Herald)
ফিরিস্তাদা — দূত।
বরখেলাপী — অবিশ্বাসের কাজ।
আন্জম্ — তারা।
পয়দায়ীস্ — জন্ম।
মর্গ — মৃত্যু।
মণিকীট — কাঁচপোকা।
রইস্ — অভিজাত।
বেলোয়ারি — পল্তোলা কাঁচ।
পিল্শাহী — রাজহস্তী।
জন্নাথ্ — ডাইনী।
নূর — সৌন্দর্য।
শেরপোষ — যে কোন জন্তুর মুণ্ডের পায়াদার উপবেশন চৌকি।
সরাব-ই-সোরাহী — সুরাপাত্র।
মদ্দই — শত্রু।
খাসগেলাশ — অভ্রদীপ।
নিকা-জিগির — মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহের ধর্ম সংগীত।
দেনমোহর কবুল — মুসলমানের বিবাহে পাত্রীকে দেয় অর্থের প্রতিশ্রুতি।

"তরুণ অরুণি তবই ধরনি পবন বহুখরা
লগ নহি জল বড় মরুথল জনজীবন হরা।
দিনই বলই হিঅঅ ভুলই হমি একলি বহু
ঘর নহি পিঅ সনহি পথিহ মন ইচ্ছই কহু॥" — তরুণ সূর্য কিরণে ধরণী তপ্ত, বাতাস বইছে খরবেগে, নিকটে নেই জল, জলশূন্য জীবন-নাশা বিস্তৃত মরুস্থল। ঘরে নেই আমার প্রিয়, আমি একলা বঁধু। শোনো গো পথিক, আমার মন কি চায়।

জামদানী শাড়ি — জংলা কাজ করা শাড়ি।
বরক্লহর — পুরনো যুগে মাথার পেছন দিকে পরবার ফার্সী গহনা। এ দেশের মেয়েদের খোঁপায় এই গহনা ব্যবহৃত হতো।
খাসবরদার — আশসোটাধারী।
কটাসিন — মহানদী তীরের কটাসিংহ (কণ্টাই ?) বলে অনুমান করেন ঐতিহাসিকরা।
খাসজুলুম — বিশেষ আদেশ।
খুবরু — সুন্দর মুখ।
মুর্দা-ফরাস — শবসৎকারক।
নাখোদা — জাহাজের কর্তা।
গাস্তিদার — দেশবিদেশ থেকে সস্তায় মাল কেনবার দালাল।
মুর্দা — শব।
ইস্তমুরার — চিরস্থায়ী।
নজরানা — সাক্ষাতের জন্য মূল্য।

"চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।
গণ্ডুপদার্থি মণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।" — কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে, কেঁচোর সন্ধানে ব্যাঙ ঘর ছেয়েছে, এই তো আমার ঘরের অবস্থা।

বল্গক্পুর — তভ্রোল-এর বিদ্রোহের পর থেকে লখ্নৌতি 'বল্গক্পুর' অর্থাৎ 'বিদ্রোহপুরী' নাম ধারণ করে।
খাশনবীশ — প্রাইভেট সেক্রেটারী।

ইলম — বিদ্যা।

এখ্‌তেলাক্ — নিয়ম লঙ্ঘন।

তহ্‌খানা — মাটির নিচের ঘর।

সর্ — মাথা।

পিন্দারে হাসীন্ — সুন্দর দেহ।

বাইচ পান্‌সি — প্রতিযোগিতার পানসি।

বাফ্‌তা — কার্পাস ও রেশম মিশ্রিত বস্ত্র। তুর্কীর আমলে প্রথম প্রচলন হয়।

আমিনা তরিন্ — নিকৃষ্টতম।

মাক্‌তাল — বধ্যভূমি।

জাসুস্ — গুপ্তচর।

আস্‌প — ঘোড়া।

মম্-ই — আরবী ভাষায় 'মোম্' অর্থে ঔষধ। ঔষধ লেপন করে যে-দেহ রাখা হয়, তার নামকরণ হয়—মম-ই।

সালারে ফৌজ — প্রধান সেনাপতি।

কাসিদে-সওয়ার — সংবাদবাহী অশ্বারোহী।

অব্‌হোদ — তুরস্কদের মুখে অযোধ্যা ভেঙে হয় অব্‌হোদ। ইংরেজের মুখে হয় আউধ।

ম্যা-মেহর — চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র।

আল্‌তাম্‌মা — চিরকালের জন্য নিষ্কর ভূমি।

বরক — বিদ্যুৎ।

জহান্ — জগৎ।

খবিশ্‌ — ভূত।

"সাবাসে হীর্‌জান দরাজ চুন্ — বিরহের রাত্রি, তোমার কৃষ্ণ কেশের মতোই দীর্ঘ।
জুলফ্‌ ভা ওবা রোজে ভাস্‌লাৎ মিলনের ক্ষণ এ জীবনের মতোই ক্ষণস্থায়ী, কি করে
চু উমর কোটা এ নিবিড় রাত্রি কাটাই আমার প্রিয়া বিনা?
সাথী পিয়াকো জো ম্যায়
না দেখো তো কৈয়সে
কাটাউঁ আঁধেরি রাতিয়া।"

"আশিক না সুদী তো গমে হিজরা না কাশিদী, —যে জন কখনো ভালবাসেনি, বিরহের
কস্ পেশে তো নাঘমায়ে হিজরা চে গুর আয়েদ?" মধুর সঙ্গীতের আস্বাদ সে কি করে জানবে

পট্টপাটি — পাটের মোটা বস্ত্র। তাঁবু বা চিত্র অঙ্কন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হতো।

চামশ — চামড়ার ঢাকনার তলায় লোহার পাত মোড়া।

সহি — ঠিক, ভাই, বেশ।

বেতর — ভালো।

তহ্‌সুর — দেহ।

তান্‌জাম্‌ — পাল্কি বিশেষ।

বখৎ — ক্ষণ।

বিড়ন — হস্তী শুঁড়ের গহনা।

জুরাত — শস্ত।

আলাক-ই-খুসক্ — খড়।

রিস্তাদার — আত্মীয় কুটুম্ব।

তস্রোল-ই-কুশ — তস্রোল হত্যাকারী।

তক্‌সির — অপরাধ।

ইনসাফ্‌ — বিচার।

ওয়ালেদ — সন্তান-সন্ততি।

জর্ — স্বর্ণ।

জীর্ণনগর — অধুনা পুণা।